Boighar.com

বিএবিডি ও বইঘর নিবেদন

রাজনন্দিনী

শফীউদ্দীন সরদার

রোকন

বইঘর

রাজনন্দিনী

www.boighar.com

শফীউদ্দীন সরদার

www.boighar.com

বইঘর
www.boighar.com
[অভিজাত বইয়ের ঠিকানা]
৪৩ ইসলামী টাওয়ার, ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০
দূরালাপনী ০১৭১১৭১১৪০৯, ০১৭২১১২২৫৬৪

বই ঘর

রাজনন্দিনী

শফীউদ্দীন সরদার
www.boighar.com
প্রকাশক
ব ই ঘ র -এর পক্ষে
এস এম আমিনুল ইসলাম

© সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ
অক্টোবর ২০১১
www.boighar.com
তৃতীয় মুদ্রণ
ফেব্রুয়ারি ২০১৪

প্রচ্ছদ
নাজমুল হায়দার

কম্পোজ
ব ই ঘ র বর্ণসাজ
বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০
০১৭১১৭১১৪০৯
www.boighar.com
মুদ্রণ মাসুম আর্ট প্রেস
২৬/২ প্যারিদাস রোড, ঢাকা-১১০০

মূল্য ১৮০ টাকা মাত্র

ISBN 984-70168-0023-8
www.boighar.com

RAJNANDINI : By ShafiUddin Sarder, **Published by :** S M Aminul Islam **BhoiGhor :** 43 Islami Tower, 11/1 Banglabazar, Dhaka-1100 **First Edition :** October 2011, **3rd Print :** February 2014 © by the publisher

Price : 180 Taka only

BOIGHAR.COM
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don’t Remove This Page!
EXCLUSIVE
বই
SCAN
EDIT
ঘর
Visit Us at boighar.com
If You Don’t Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

আমাদের কথা

www.boighar.com

বাংলা-সাহিত্যে শেকড়সন্ধানী ঔপন্যাসিক হিসেবে পরিচিত, তুমুল জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক শফীউদ্দীন সরদার। ইতিহাস-আশ্রিত উপন্যাস লিখে তিনি বাংলা-সাহিত্যে এক ভিন্নমাত্রা সংযোজন করেছেন। তাঁর সৃষ্টিকর্ম আমাদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি বর্তমান প্রজন্মকে ইতিহাস শেখানোর নতুন টনিক হিসেবে কাজ করছে। ঐতিহাসিক কারবালার ঘটনাকে কেন্দ্র করে সফল সাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেন বিষাদ-সিন্ধু রচনা করলেও গল্পে চমৎকারিত্ব সৃষ্টির মানসে কল্পিতজগতে বিচরণ করতে গিয়ে তাতে প্রকৃত ইতিহাস-বিচ্যুতি ঘটে। ফলে অনেকেই এটাকে আর ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসেবে স্বীকৃতি দিতে চান না। সাম্প্রদায়িক লেখক হিসেবে পরিচিত বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশ-নন্দিনীর বিপরীতে ঐতিহাসিক ঘটনাকে উপজীব্য করে সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী রচনা করেন রায়নন্দিনী। কেবল শিল্পগুণ বিচারে নয়; বরং ইতিহাসের খুব নিকটে থেকে রচনা করার ফলে এটি বাংলা-সাহিত্যে প্রথম স্বার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসেবে প্রায় সর্বমহলে স্বীকৃতি পায়। কিন্তু দীর্ঘ বিরতিতে এ ধারায় আর কেউ তেমন অগ্রসর হননি। ফলে মুসলমানদের শৌর্য-বীর্য, তাঁদের কুরবানী, ত্যাগ, দেশপ্রেম, জনহিতৈষণা, বিজয়গাঁথা– এসব থেকে যায় সাধারণের অগোচরে। রসহীন খসখসে কাঠখোট্টা ভাষায় তার কিছুটা ঠাঁই মিলে ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে। আর এ সুযোগে বিদ্বেষী ঐতিহাসিকদের চরম অবিচারের শিকারে পরিণত হয় পাক-ভারত উপমহাদেশের মুসলিম শাসকগণ। তাদের অবিবেচনাপ্রসূত কলমের খোচায় বীর্যবান অনেক মুসলিম শাসক হিরো থেকে জিরো– এমনকি কলঙ্কিত কলমের কালো কালি লেপনের ফলে অনেক নির্মল চরিত্র কাপুরুষ ও বেঈমানে পরিণত হয়েছে।

বর্তমান দুনিয়ায় বেদীনদের ষড়যন্ত্র-জালে আটকে পড়ে চরমভাবে নিগৃহীত মুসলমানদের গৌরবময় ইতিহাস অবলম্বন করে উর্দু ভাষায় ভিন্ন ধারার ঐতিহাসিক কথা-সাহিত্য নির্মাণে এগিয়ে আসেন ক্ষণজন্মা এক সাহিত্যিক নসীম হিজাযী। পাকিস্তানে জন্ম নেয়া নসীম হিজাযীর অসাধারণ কিছু ঐতিহাসিক উপন্যাস বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়ে ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করে। এরই মধ্যে হঠাৎ করেই বাংলা-সাহিত্যের মহাসড়কে বখতিয়ারের তলোয়ার নিয়ে হাজির হন চিরকাল সাহিত্য-সংস্কৃতি অঙ্গনে বিচরণশীল এক শক্তিমান কলমসৈনিক শফীউদ্দীন সরদার। একে একে রচনা করে চলেন বেশ কতগুলো ঐতিহাসিক উপন্যাস। তিনি বাংলা ভাষায় ইতিহাসঅন্বেষী পাঠকদের চাহিদা পূরণ করেছেন গল্পের ছলে। মানবিক প্রেম-ভালোবাসা তাঁর উপন্যাসের মূল উপজীব্য না হলেও পাঠক উপন্যাসের সবটুকু রস আস্বাদনের পাশাপাশি অবচেতনভাবেই জেনে যাবেন ইতিহাসের একটি খ-িত অধ্যায়। এক্ষেত্রে শফীউদ্দীন সরদার একমাত্র সফল লেখক হিসেবে আমাদের মাঝে এখনও বর্তমান। মহান আল্লাহ তাঁকে পূর্ণ সুস্থতার সাথে নেক হায়াত দান করুন।

www.boighar.com

২

কিংবদন্তীতুল্য বর্ষীয়ান কথাসাহিত্যিক শফীউদ্দীন সরদারের বক্ষ্যমাণ উপন্যাসটি পরিপূর্ণভাবে ঐতিহাসিক উপন্যাস না হলেও এতে দেশ বিভাগপূর্ব বাংলার ভূ-রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকা-ের খ-িত চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। বিগত শতকের প্রথমার্ধটা ছিল পাক-ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদের পুরো একটি সহস্রাব্দের জন্য সবচে' গুরুত্বপূর্ণ সময়। এটি ছিল কার্যত প্রায় দুইশ' বছর আগে রাজ্যহারা মুসলমানদের ভাগ্যনির্ধারণের কাল। বিদেশী প্রভুর পাশাপাশি জমিদার, তালুকদার শ্রেণীর অনৈতিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে সদ্য সচেতন হয়ে ওঠা একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উন্মেষ এ সময়ই হয়েছিল। তেমনই কিছু চরিত্র নিয়ে রাজনন্দিনী রচিত। মানবিক

মূল্যবোধ, প্রেম-ভালোবাসা ও কল্যাণকামী মানসিকতার পাশাপাশি তৎকালীন আর্থ-সামাজিক সংস্কৃতিও প্রকাশিত হয়েছে এতে। সাহিত্য মাসিক বাঙলাকথা'র ঈদসংখ্যা ২০১১-এ উপন্যাসটি প্রকাশিত হলেও শফীউদ্দীন সরদারের বিপুল পাঠকশ্রেণীর কথা মাথায় রেখেই আমরা এটি বই আকারে প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি। বইটি নির্ভুল এবং সর্বাঙ্গ সুন্দর করে উপস্থাপন করতে আমাদের যত্নের ত্রুটি ছিল না। আমাদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার সীমাবদ্ধতার পাশাপাশি অবচেতনভাবে কোনো ভুল থেকে থাকলে আশা করি বিজ্ঞ পাঠক আমাদের গোচরে আনবেন। শফীউদ্দীন সরদারের অন্যান্য বইয়ের মতো এটিও যদি পাঠকের হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারে– তাহলেই আমাদের শ্রম ও বিনিয়োগ স্বার্থক বিবেচিত হবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের তাওফিক দিন।

তারিখ
১৩ সেপ্টেম্বর ২০১১ ঈ.

সমর ইসলাম
পরিচালক, **বইঘর**
নিউজরুম এডিটর
একুশে টেলিভিশন

রাজনন্দিনী

শফীউদ্দীন সরদার

কৃতজ্ঞতা

ROKON

SCAN &EDITEDBY:

BOIGHAR

WEBSITE:

WWW.BOIGHAR.COM

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Boighar-বইঘর

WE ALWAYS ENCOURAGE BUYING
THE ORIGINAL BOOK.

আমাদের প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বই

- খুতুবাতে হাকীমুল ইসলাম/ কারী মুহাম্মদ তৈয়ব (রহ.) [১-১০ খণ্ড]
- ফতোয়ায়ে উসমানী / জাস্টিস মাওলামা তকী উসমানী [১-২ খণ্ড]
- ইসলাম ও বিজ্ঞান/ হাকীমুল ইসলাম কারী মুহাম্মদ তৈয়ব (রহ.)
- নামাযের কিতাব/ হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী (রহ.)
- ইলমী বয়ান/ মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী
- ক্ষণস্থায়ী রঙিন দুনিয়া/ জাস্টিস মাওলানা তকী উসমানী
- কুরআন আপনাকে কী বলে/ প্রফেসর আহমদ উদ্দিন মাহবারবী
- দীনী দাওয়াত ও আল্লাহর মদদ/ মাওলানা তারিক জামীল
- কালের আয়নায় মুসলিমবিশ্ব/ শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া (রহ.)
- বাংলার শত আলেমের জীবনকথা/ মাওলানা এস এম আমিনুল ইসলাম
- দাস্তানে মুজাহিদ/ নসিম হিজাযী
- ওগো বনহংসিনী আমার/ আল মাহমুদ
- নিশাপুর কা শাহীন/ আসলাম রাহী
- আওয়ারা/ শফীউদ্দীন সরদার
- বখতিয়ারের তিন ইয়ার/ শফীউদ্দীন সরদার
- দ্বীপান্তরের বৃত্তান্ত/ শফীউদ্দীন সরদার
- রাজনন্দিনী/ শফীউদ্দীন সরদার
- সাহসের গল্প/ মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন
- কাশ্মীরের কান্না/ সমর ইসলাম
- তুমি আছো হৃদয়ের গভীরে/ সমর ইসলাম
- নোলক/ সমর ইসলাম
- স্বপ্নের উপাদান/ সমর ইসলাম
- আদর্শ এক গৃহবধূ/ আবদুল খালেক জোয়ারদার
- আকাশঝরা বৃষ্টি/ এম এ মোতালিব
- বাংলা ভাষা ও বানানরীতি/ এম এ মোতালিব
- আধ্যাত্মিক জগত ও আত্মশুদ্ধির পথ/ মুফতী মুহাম্মদ বিলাল হুসাইন বিক্রমপুরী
- ইসলামে পারিবারিক-সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য/ ড. মাজহার ইউ কাজী
- মোবাইল ফোনের শরয়ী আহকাম/ মুফতী আবদুল আহাদ
- ছোটদের ইমাম আযম আবু হানীফা (রহ.)/ সমর ইসলাম
- ছোটদের ইমাম বুখারী (রহ.)/ সমর ইসলাম
- রহস্যময় মজার বিজ্ঞান/ সমর ইসলাম
- ইতিহাসের গল্প-১ ভারত শাসন করলো যারা/ মো. জেহাদ উদ্দিন
- বিজয়ের গল্প-১ স্পেন বিজয়ী তারেক বিন জিয়াদ/ সমর ইসলাম
- গল্পের ফুলদানী/ হাফেয মাওলানা সাখাওয়াত হুসাইন
- কালিলা দিমনার গল্প/ হাফেয মাওলানা সাখাওয়াত হুসাইন

মোজাফফর আহমদ খান বাহাদুর সাহেব অনেকটা অস্থিরভাবেই বসার ঘরে প্রবেশ করলেন। বসতে বসতেই আপনমনে বললেন– নাহ্ঃ, মেয়েটাকে নিয়ে আর পারলাম না। দিন দিন সে আয়ত্বের বাইরে চলে যাচ্ছে।

শুনে খান সাহেবের ম্যানেজার কোরবান আলী মিয়া উৎসুককণ্ঠে বললেন– কার কথা বলছেন হুজুর?

মোজাফফর আহমদ খান বাহাদুর সাহেব বিষণ্নকণ্ঠে বললেন– কার কথা আবার! আমার মেয়ে শবনম সাদিকার কথা বলছি। দিন দিন সে এতটা জেদী হয়ে উঠছে যে, তাকে আর কিছুতেই বাগে আনা যাচ্ছে না। কথায় কথায় যা পাচ্ছে তাই ভাংচুর করছে। কোন যুক্তি তর্কের ধারে কাছে যাচ্ছে না।

কোরবান আলী মিয়া দুঃখ করে বললেন– আহারে! এত ভাল মেয়ে– এত চমৎকার যার আদব আক্কেল আর এত মিষ্টি যার স্বভাব, সে দিন দিন বিগড়ে যাবে– এটা কেমন কথা? এমনটি তো হওয়ার কথা ছিল না।

ম্যানেজার কোরবান আলী মিয়া ঈমানদার ও এলেমদার মানুষ। বিষয়টি নিয়ে তিনি ভাবতে লাগলেন। মোজাফফর আহমদ খান বাহাদুর সাহেব হতাশকণ্ঠে বললেন– আর ছিল না। এখন ভাবছি, ইস্কুলে গিয়ে ইদানীং সে মেয়েদের সাথে কেমন আচরণ করছে? বন্য আচরণ করছে না তো? ছাত্রীদের জানপ্রাণ ঝালাপালা করে তুলছে না তো?

হুজুর!

ওদিকের খবর কিছু জানো কি?

জি হুজুর, জানি। মেয়েদের জান ঝালাপালা করে তুলবে কি, মেয়েরা তো শবনম ম্যাডাম বলতে অজ্ঞান। যতক্ষণ ম্যাডাম ক্লাসে না যায় ততক্ষণ মেয়েরা পথ চেয়ে থাকে। ম্যাডাম ক্লাসে গেলে তাদের খুশি দেখে কে?

সে কি কথা! শবনমকে তারা এখন সহ্য করতে পারে তো?

পারে মানে কি হুজুর! তাকে তো মেয়েরা ভাতে মাছে পায়। ছাত্রীরা তাদের ম্যাডামকে যেমন ভালোবাসে, ম্যাডামও ছাত্রীদেরকে তেমনই প্রাণ ঢেলে ভালোবাসে। একদিন কোন কারণে আমাদের শবনম আম্মা স্কুলে না গেলে স্কুল সেদিন মরা। এক বিন্দু হাসি থাকে না মেয়েদের কারো মুখে।

বলো কি! তাহলে শবনম আম্মা বাড়িতে এমন আচরণ করে কেন? আর বাড়িতেই বা বলি কেন, বাড়ির বাইরেও সে ইদানিং কারো সাথে ভাল আচরণ করছে না। সব সময় দম্ভ আর দাপট দেখায় সবাইকে।

আমি বলি কি হুজুর, আম্মাজানকে এ যাবত তো কেবলই আধুনিক শিক্ষা দেয়া হয়েছে, এবার কিছুটা দীনি এলেম দেয়া হোক। এটা তার বিশেষ দরকার আছে।

খান বাহাদুর সাহেব নারাজকণ্ঠে বললেন– দরকার আছে মানে? আরো তাকে লেখাপড়া শিক্ষা দেয়ার কথা বলছো?

জি হুজুর। ইসলামী শিক্ষা।

আরে রাখো তোমার ইসলামী শিক্ষা! ঢের হয়েছে। আর কোন শিক্ষাই দরকার নেই।

হুজুর!

গত বছরই সে বিএ পাশ করেছে। অনেকখানি বয়স হয়েছে তার। এখন যত শিগ্‌গির সম্ভব তার বিয়ে-শাদিটা দিয়ে দেবো বলেই তাকে আর পড়ার জন্যে ভার্সিটিতে পাঠাইনি। এবার তোমরা সবাই মিলে ওর শাদির চেষ্টাটা করো একটু। দেখেশুনে একটা সৎ পাত্র আনো।

সেটা তো দেখছিই হুজুর। আপনি বলার পর থেকেই সব সময় দেখছি। কিন্তু আমরা চাইলেই তো হবে না। সব কিছুই আল্লাহ তায়ালার হাতে। আল্লাহর যেদিন ইচ্ছে হবে, সেদিন ঠিকই সৎ পাত্র জুটে যাবে। তার আগে হাত পা ছুড়ে তো লাভ নেই।

ব্যস্। তাহলে মেয়েটা এখন ঐভাবেই পড়ে থাকবে? তার গতি কিছু হবে না?

হবে হুজুর। ঐ যে বললাম, আল্লাহর যেদিন মর্জি হবে, সেদিন ঠিকই হবে।

খান বাহাদুর সাহেব অধৈর্যকণ্ঠে বললেন– তাহলে এখন মেয়েটাকে নিয়ে করি কি?

ম্যানেজার কোরবান আলী মিয়া বিনীতকণ্ঠে বললেন– এই ফাঁকে ওকে কিছুটা

দীনি এলেম দিন হুজুর। কিছুটা দীনি এলেম পেলেই মেয়েটা আপছে আপ্ শান্তশিষ্ট আর সুবোধ মেয়ে হয়ে যাবে। বিয়ে-শাদি দিলেই তো হবে না। শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে যদি এই আচরণই করে, আচরণ না বদলায় তাহলে সেটা কি সইবে তারা, না টিকবে তার সেই শাদি!

খান বাহাদুর সাহেব একজন মস্ত বড় জমিদার। রাশভারী মানুষ। শাদি দিলেও সে শাদি টিকবে না তার মেয়ের– এ কথায় জমিদার খান বাহাদুর সাহেব চিন্তায় পড়ে গেলেন। তিনি চিন্তিতকণ্ঠে বললেন– সে কি! এ আবার তুমি কি বলছো ম্যানেজার?

ম্যানেজার সাহেব শক্তকণ্ঠে বললেন– ঠিকই বলছি হুজুর। যেটা প্রয়োজনীয় কথা, সেইটেই বলছি।

ম্যানেজার!

আল্লাহ রাসূলের সাথে পরকালের জ্ঞান কিছুটা দিন ওকে। পরকালের চিন্তাভাবনা ওর মাথায় কিছুটা ঢুকুক। একবার তা ঢুকলে, আম্মাজান আপছে আপ্ পাল্টে যাবে। সুবোধ সুধীর হয়ে যাবে। তখন সে বুঝতে শিখবে– এ দুনিয়াটা দু'দিনের। এটা কিছুই নয়। পরকালটাই আসল। অনন্তকাল তার ব্যাপ্তি। অনন্তকাল তাকে সেখানেই থাকতে হবে। পুণ্য কিছু অর্জন করতে না পারলে, তাকে অশেষ আজাব ভোগ করতে হবে সেখানে।

কোরবান মিয়া!

মানুষকে ভালবাসতে শেখাই হলো সেই পুণ্য অর্জন করা। ধনী-গরীব, কালো-ধলো নির্বিশেষে সবার সাথে সদাচারণ করে সবাইকে ভালবাসতে পারলে তবেই আল্লাহর তুষ্টি অর্জন করা যায়। আর পরকালের পাথেয় হাসিল হয়।

তার মানে–

শুধু ঐ আধুনিক মানে খেষ্টানী এলেম শিক্ষা করে সে জ্ঞান অর্জন করা যায় না। ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করলে তবেই এ জ্ঞান পাওয়া যায়। আল্লাহ-রাসূলের কিছু ধারণা ওকে দিন হুজুর। সময় থাকতে ওর পরকালটা মজবুত করার চিন্তা করুন।

বেশ, তাহলে তুমি বলো, কিভাবে তা করবো আমি!

কিছু দিনের জন্যে হলেও শবনম আম্মাকে মেয়েদের মাদরাসায় ভর্তি করে দিন। অন্তত কিছুদিন সে ওখানে দীনি এলেম শিখুক।

বইঘর.কম ও রোকন

ঠিক আছে। কিন্তু তেমন মাদরাসা এখন পাচ্ছি কোথায়?

ঐ রসূলপুরের মাদরাসার কথা বলছি হুজুর। সেখানে শুধু মেয়েরাই ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করে। বড় বড় মেয়েরা ওখানে পড়ে আর ওখান থেকে আলেম, ফাজেল, কামেল– এসব ডিগ্রী লাভ করে।

কিন্তু সে কি! রসূলপুর তো অনেক দূর। এখান থেকে প্রায় তিন সাড়ে তিন মাইল পথ। আমার শবনম সাদিকা আম্মা সেখানে পড়তে যাবে কি করে?

হুজুর!

সে এই পাশের মহিলা কলেজ থেকে বিএ পাশ করেছে। বৃদ্ধ ড্রাইভার মমতাজ শেখ একাই তাকে নিয়ে গেছে একাই তাকে এনেছে। কিন্তু ঐ রসূলপুরের ব্যাপারটা তো তেমনটি হবে না।

কেন হবে না হুজুর?

কি করে হবে? রসূলপুরের মাদরাসাতে দেয়া নেয়া করতে আর একজন এক্সট্রা লোক লাগবে দৈনিক। মমতাজ শেখ তো গাড়িটা ঐ মাদরাসার বাউ-ারির মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে পারবে না। গাড়ি তাকে বাইরে রাখতে হবে আর গাড়ির পাহারায় তাকে গাড়িতেই থাকতে হবে। অন্য আর একজনের দৈনিক শবনম আম্মাকে গাড়ি থেকে নিয়ে মাদরাসার ক্লাস রুমে পৌঁছে দিতে হবে আর ক্লাস শেষে ফের তাকে গাড়িতে নিয়ে আসতে হবে। অর্থাৎ দৈনিক বাঁধা আর বিশ্বস্ত একজন লোক দরকার। দৈনিক সে লোক পাবো কোথায়?

আছে তো হুজুর। একদম বসে আছে। আপনি হুকুম করলেই পুরোপুরি সে এই কাজে লেগে যাবে।

www.boighar.com

শুধু লেগে গেলেই তো হবে না। বিশ্বস্ত লোক হওয়া চাই। এমন লোক অবসর আছে কে কোথায়?

আছে হুজুর আছে। যেমনই বিশ্বস্ত তেমনই এই কাজের উপযুক্ত লোক। লোকটা ফালতু বসে আছে।

বলো কি! কে সে?

ঐ মৌলভী নূরু মিয়া হুজুর। এসে অবধি সে প্রায় ফালতুই বসে আছে।

কে, ঐ নূরু মিয়া?

জি। ঐ নূরু মিয়া। ঐ যে কেতাব আলীকে খামার বাড়ির পাইট্-কিষাণদের নামায-কালাম শেখানোর জন্যে একজন মৌলভী আনতে বলেছিলেন, সেই মৌলভী সাহেব।

ও, কেতাব আলীর আনা ঐ মৌলভী? সে তো শুনেছি একেবারেই এক ছেলে মানুষ। নামাযটা নাকি সে শেখাতে পারে, এই মাত্র। ঐ ছেলে মানুষ কোন কাজে আসবে?

আসবে হুজুর, আসবে। ছেলে মানুষ হলে কি হবে, ছেলেটা একদম এক মাটির মানুষ। খুবই ভাল মানুষ বলেই তো কেতাব আলী ওকে পছন্দ করে এনেছে।

তাই বলে ঐ নূরু মৌলভী আমার সোমত্ব মেয়ের সাথে মাদরাসায় যাবে?

দোষ নেই হুজুর। ঐ যে বললাম, নূরু মৌলভী একেবারেই এক মাটির মানুষ। সাত চড়ে একটা রা শব্দ করে না। নজরটা সব সময় মাটির দিকে রাখে। এদিক ওদিক চায় না। কোন মেয়ে ছেলের মুখের দিকে জান গেলেও তাকায় না। হুশ বুদ্ধি কিছুটা কম কি না তাই অন্য কোন চিন্তাই তার মাথা মগজে নেই।

হুঁশ বুদ্ধি কম?

অনেকখানি কম। একেবারেই আলাভোলা মানুষ। ওকে নিয়ে কোন সমস্যাই নেই। আর তাছাড়া, আম্মাজানকে তো বোরকা দিয়ে মুখ ঢেকে মাদরাসায় যেতে হবে। খোলা মাথা এ্যালাও করা হয় না। কাজেই সমস্যা কোথায়?

ঠিক বলছো?

জি জি। কেতাব আলীর কাছে সব কিছু জেনে নিয়ে তবে বলছি।

কেতাব আলীই বা তাকে যোগাড় করলো কোথা থেকে আর কিভাবে?

পথে হুজুর পথে। পথেই আলাপ। আলাপ করে কেতাব আলী বুঝতে পেরেছে লোকটা খুবই লাজুক আর খুবই ভাল মানুষ। হুশে খানিকটা কম বলে কোন সাতে পাঁচে সে থাকে না। ওদিকে আবার ইসলামী জ্ঞানটা তার টনটনে। সব সময় সে দোয়া কালাম আওড়ায় আর মাঝে মাঝে আনমনে ইসলামী গজল গায়।

কিন্তু রাস্তায় একবার দেখেই কেতাব আলী এত সব জানলো আর বুঝলো কি করে?

ও পাড়ার চেরাগ আলী তাকে সব বলে দিয়েছে যে! আগে ঐ চেরাগ আলীর মুনিবের বাড়িতেই সে ছিল। চেরাগ আলীর মুনিব অনেক দিনের জন্যে অন্যত্র চলে গেলেন বলে নূরু মিয়াকে আর রাখতে পারলেন না। একটা ভাল বাড়ি

বইঘর.কম ও রেকীন

দেখে নূরু মিয়াকে রাখার কথা বলে গেছেন। মানে, চেরাগ আলীকে সে ব্যবস্থা করে দেয়ার কথা বলে গেছেন।

তাই নাকি?

তার পরই তো আমাদের কেতাব আলী তাকে আমাদের এখানে নিয়ে এসেছে।

বলো কি!

সেই থেকেই নূরু মিয়া আমাদের খামারবাড়ির পাইট-কিষাণদের নামাজে ইমামতি করে।

ইমামতি করে নাকি? এখনও করে? আমি তো সেসব খবর রাখার সময়ই পাই না।

জি হুজুর। সেই জন্যেই তো সবদিক জানার পর আম্মার সাথে ঐ নূরু মিয়াকে দেয়ার কথা বলছি। আমিও না হয় মাঝে মধ্যে সাথে যাবো আম্মার। যেভাবেই হোক, আম্মা ঐ দীনি এলেমটা একটু নিক। তাতে আম্মার মেজাজ মর্জি ইনশাআল্লাহ মোলায়েম হয়ে যাবে। হাজার হোক, আসমানী প্রভাব বলে একটা প্রভাব আছে না।

ম্যানেজার!

তাছাড়া আর একটা দিক আছে হুজুর। নূরু মৌলভীর চেহারাটাও নূরানী চেহারা। বড়ই হ্যান্ডসাম ছেলে। কোন খাটাশ বা বাঁদর মার্কা চেহারা নয়। তেমন চেহারা হলে তো আম্মাজান ঘেন্নায় ওর দিকে তাকাবেও না। ওর সাথে যাবেও না।

ম্যানেজার কোরবান আলী মিয়ার কথাতেই শেষ পর্যন্ত খান সাহেব রাজি হয়ে গেলেন। একটা ভাল দিন দেখে শবনম সাদিকা তথা শবনম ম্যাডামকে রসূলপুর মহিলা মাদরাসায় ভর্তি করে দেয়া হলো। আর ঐ নূরু মিয়া মৌলভীকেই ম্যাডামকে মাদরাসায় নিয়ে যাওয়ার, নিয়ে আসার দায়িত্ব দেয়া হলো।

কিন্তু ফ্যাসাদ একটা বেধে গেল প্রথমেই। শবনম সাদিকাকে রসূলপুরের মহিলা মাদরাসায় ভর্তি করাটা মৌলভী নূরু মিয়াকে ছাড়াই হয়েছিল। এ পর্যায়ে তাকে সঙ্গে নিতে হয়নি। কিন্তু মাদরাসায় যাতায়াত শুরু করার সময় তাকে সঙ্গে নিতে গিয়েই বেধে গেল ফ্যাসাদটা। ড্রাইভার মমতাজ আলী শেখ গাড়ি নিয়ে প্রস্তুতই হয়েছিল। প্রথম দুই একদিন ম্যানেজার কোরবান আলী

মিয়াও নূরু মিয়ার সাথে যাওয়ার জন্যে শবনম সাদিকাকে নিয়ে গাড়ির কাছে চলে এলেন। মৌলভী নূরু মিয়া আগেই এসে গাড়ির কিঞ্চিৎ দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। নূরু মিয়ার উপর নজর পড়তেই শবনম সাদিকা চমকে গেল। তার চোখ দুটি আটকে গেল নূরু মিয়ার উপর। আনন্দে ও বিস্ময়ে সে ম্যানেজার কোরবান আলীকে বললো– ওম্মা! কি চমৎকার চেহারা চাচা! একদম সিনেমার নায়ক। এত সুন্দর চেহারার সিনেমার নায়কও আজকাল দেখা যায় না বড় একটা। অনেকে অন্য পথে নায়ক হয়ে যায়। ঠিক বলিনি চাচা?

ম্যানেজার কোরবান আলী মিয়া থতমত করে বললেন– সেকি! তুমি কার কথা বলছো আম্মিজান?

শবনম সাদিকা সবিস্ময়ে বললো– ঐ যে ঐ লোকটার কথা। ঐ যে সামনে দাঁড়িয়ে আছে, দেখতে পাচ্ছেন না।

নূরু মিয়ার দিকে ইঙ্গিত করলো শবনম। ম্যানেজার সাহেব বললেন– কে, ঐ মৌলভী নূরু মিয়ার কথা বলছো?

আরে না-না, আমি কোন মৌলভী মুনসীর কথা বলছিনে। ঐ যে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে, ঐ হ্যান্ডসাম ছেলেটার কথা বলছি।

গলায় জোর দিয়ে ম্যানেজার সাহেব বললেন– হ্যাঁ হ্যাঁ, আমিও তো তার কথাই বলছি। ওই তো মৌলভী নূরু মিয়া।

মাই গড! সে কি চাচা! ঐ লোকটা মৌলভী? কোন মোল্লা-মৌলভীর চেহারা এতটা জৌলুশদার হয়? আপনি যে তাজ্জব করলেন আমাকে!

তাজ্জব হওয়ার কিছু নেই আম্মিজান। ঐ তো আমাদের মৌলভী নূরু মিয়া।

আপনাদের নূরু মিয়া মানে? ও তো অন্য কেউ আর অন্য কোথাও যাচ্ছে।

আরে না আম্মিজান। অন্য কোথাও যাচ্ছে না। আমাদের কাছেই আসছে।

শবনম সাদিকা হকচকিয়ে গেল। বললো– আমাদের কাছেই আসছে মানে? কেন আসছে?

আমাদের সাথে যাবে।

আমাদের সাথে যাবে! হোয়াট ডু ইউ মিন?

কোরবান আলী মিয়া ঈষৎ হেসে বললেন– মমতাজ শেখের সাথে এখন থেকে ও-ই তোমাকে মাদরাসায় নিয়ে যাওয়া-আসা করবে। আমি দুই-এক দিনের জন্যে তোমাদের সঙ্গ দিতে এসেছি।

ক্রোধে ফেটে পড়লো শবনম সাদিকা। ইউ শাট্ আপ্ চাচা! ও-ই আমাকে নিয়ে যাওয়া নিয়ে আসা করবে মানে?

মমতাজ মিয়া গাড়ি নিয়ে মাদরাসার গেটের বাইরে থাকবে। গেট থেকে মাদরাসার ক্লাসরুম পর্যন্ত ঐ নূরু মিয়াই তোমাকে আনা-নেয়া করবে।

ও-ই আমাকে আনা-নেয়া করবে? আপনার মাথাটা কি খারাপ হয়ে গেছে চাচা? ও-ই আমাকে আনা-নেয়া করবে– এ কথার অর্থ?

অর্থটা হচ্ছে, এ সময়টা দৈনিক ও-ই সাথে থাকবে তোমার।

হাউ স্ট্রেঞ্জ! আমার সাথে থাকবে! ঐ একটা তরতাজা ইয়ংম্যান!

জি জি। তা তুমি এ কথা বলছো কেন আম্মিজান?

কেন বলছি তা বুঝতে পারছেন না! একা কাছে পেলে ওতো গিলে খেতে চাইবে আমাকে। অনেকবারই এমনটি ঘটেছে। এদের আপনি চেনেন না।

ম্যানেজার সাহেব প্রতিবাদ করে বললেন– ছিঃ ছিঃ! তুমি এ কথা বলছো কেন? নূরু মিয়া সে মানুষ নয়।

শবনম সাদিকা বললো– নয়? ও নজর দেবে না আমার উপর? হা করে সব সময় চেয়ে থাকবে না আমার দিকে?

কস্মিনকালেও নয়।

নয়?

না, নয়। সাত চড়ে যে 'রা' শব্দটি কাড়ে না সে নজর দেবে তার উপর। কি যে সব ধারণা!

চাচা!

ফেরেশতা, ফেরেশতা! বিলকুলই আসমানী মানুষ। অমনি কি তোমার সাথে দেয়ার জন্যে ওকে সিলেক্ট করেছি আমি? চোখ দুটো ওর মাটির দিকে ছাড়া কখনো তোমার দিকে উঠবে না।

অর্থাৎ?

মাটির মানুষ। আলাভোলা মাটির মানুষ। হুঁশ বুদ্ধিও কিছুটা কম। সব সময় আপনার মধ্যে মগ্ন থাকে সে। দুনিয়ার কোন কিছুর মধ্যে সে কখনো থাকে না।

নীরব হয়ে গেল শবনম সাদিকা। কিছুক্ষণ পরে সে ধীরকণ্ঠে বললো– সে কি! অন্য সময় তাহলে করে কি এ লোক?

বইঘর.কম ও রোকন

ম্যানেজার সাহেব বললেন– ইমামতি করে। নামাযে ইমামতি করে। সে একজন ইমাম।

ইমাম!

হাতে কোন কাজ না থাকলে একা একা চুপ করে বসে থাকে আর মাঝে মধ্যে দুই একখানা ইসলামী গীত গায়।

একা একাই!

হ্যাঁ, একা একাই। কারো সামনে সে কি মুখ খোলে কখনো!

চাচা।

দুই চারদিন যাক, মানে দুই চার দিন দেখো তাকে। তাহলে তোমার আর কোনই সংশয় থাকবে না। না চেনে না বুঝে আগেই ক্ষ্যাপাক্ষেপি করলে চলে? সবদিক নিশ্চিন্ত হয়ে তবেই ওকে সাথে দিচ্ছি তোমার।

ঠিক আছে চাচা! তাহলে আর আমি কিছু বলবো না।

না, বলবে না। তোমার ভাব দেখে ও লোকটা দেখো, আগেই ঘাবড়ে গেছে।

চাচা!

সময় চলে যাচ্ছে। ডাক দেবো ওকে?

দিন।

ম্যানেজার সাহেবের ডাকে জড়োসড়ো হয়ে নূরু মৌলভী গাড়িতে এসে উঠলো। ছেড়ে দিলো গাড়ি।

কয়েকদিন এভাবেই গেল। দুই তিন দিন পরে ম্যানেজার সাহেবও আসা বাদ দিলেন। নূরু মৌলভী ড্রাইভারের পাশে একাই বসে থাকতে লাগলো আর গাড়ি থেকে নেমে একাই নতমস্তকে শবনম সাদিকাকে মাদরাসার ক্লাস রুমে পৌঁছে দেয়া আর নিয়ে আসা করতে লাগলো।

একদিন গাড়িটা গড়বড় করায় ড্রাইভার গাড়ি ওয়ার্কশপে নিয়ে গিয়েছিল। যাওয়ার সময় গেটের দারোয়ানকে তা বলে গেল। নূরু মিয়ার সাথে শবনম সাদিকা এসে গাড়ির জন্যে এদিক ওদিক চাইতেই দারোয়ানটা এগিয়ে এসে বললো– আপনাদের গাড়ি নিয়ে ড্রাইভার সাহেব ওয়ার্কশপে গেছেন। ফিরে আসতে তার একটু দেরি হবে। আপনাদের এখানে অপেক্ষা করতে বলে গেছেন।

দারোয়ান চলে গেল। দাঁড়িয়ে রইলো শবনম সাদিকা আর নূরু মিয়া। শবনম

সাদিকার পাশে এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে নূরু মিয়া লজ্জাবোধ করছিল। সে বসে পড়লো। তার মাথাটা লজ্জায় ঝুঁকে পড়লো মাটির দিকে। তা দেখে শবনম সাদিকা ঈষৎ হেসে বললো– কি ব্যাপার! তুমি এত নুয়ে পড়লে কেন?
নূরু মিয়া অস্ফুটকণ্ঠে বললো– জি?
শবনম সাদিকা ফের প্রশ্ন করলো– তোমার নাম কি?
মৌলভী নূরু মিয়া মৃদুকণ্ঠে বললো– নূরু মিয়া।
সেরেফ নূরু মিয়া, না নামের সাথে আর কিছু আছে?
আগে ছিল না। এখন সবাই বলে মৌলভী নূরু মিয়া।
এখন কেন বলে? তুমি নামায পড়াও বলে?
জি জি।
ইমামতি করো?
জি জি।
কোন মসজিদের ইমাম তুমি?
জি না, কোন মসজিদের নয়।
মসজিদের নও? সে কি! তাহলে কোথায় ইমামতি করো?
খামারবাড়ির বারান্দায়।
একটু শব্দ করেই হেসে ফেললো শবনম সাদিকা। বললো– সে কি! তুমি বারান্দার ইমাম? কোনো মসজিদের নও?
জি না। বারান্দায় আমি সবাইকে নামায পড়াই।
: তাই তুমি ইমাম? মানে বারান্দার ইমাম?
: জি জি।
বারান্দার ইমাম আবার একটা ইমাম নাকি? ছিঃ! নিজেকে ইমাম বলতে শরম লাগে না তোমার? বারান্দার ইমামও ইমাম আর বাদুরও পাখি!
শবনম সাদিকা তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলো। শরমে নূরু মিয়ার মাথাটা ঝুঁকে পড়ে একদম মাটির সাথে মিশে গেল। তা দেখে শবনম সাদিকা ফের হেসে উঠে বললো– আরে আরে! করো কি করো কি! মাথাটা যে একদম মাটির মাধ্যে সেঁদিয়ে যাবে। তোলো! তোলো মাথা! শুনতে পাচ্ছো?
নূরু মিয়া ভয়ে ভয়ে বললো– জি পাচ্ছি!
: তাহলে মাথা তোলো। তোলো মাথা!
অল্প একটু তুলে নূরু মিয়া বললো– জি তুলেছি।

বইঘর.কম ও রোকন

আরো তোলো।

আর একটু তুলে বললো– তুলেছি।

আরো তোলো। একদম আমার মুখের দিকে তাকাও।

নূরু মিয়া থতমত করে বললো– আপনার মুখের দিকে তাকাবো?

হ্যাঁ, তাকাবে।

তা সেটা কি ঠিক হবে?

হবে। তাকাও। তাকাও আমার মুখের দিকে।

মুখ তুলে চেয়ে নূরু মিয়া বললো– তাকিয়েছি।

শবনম সাদিকা বললো– আমার মুখের দিকে তাকিয়েছো?

জি তাকিয়েছি।

চিনতে পারছো আমাকে?

না।

পারছো না?

জি না! আপনার মুখ তো বোরকা দিয়ে ঢাকা। চিনতে পারবো কি করে!

আমি কে, তাও কি জানো না?

জি না।

জি না মানে? আমি কে তাও জানো না? কোথায় বাড়ি কার মেয়ে?

জি না, সঠিক জানি না। তবে মনে হয় ঐ জমিদার বাড়িরই আপনি বোধ হয় কেউ!

বোধ হয় কেউ? তাজ্জব! আমার নাম কি?

সেটাও ঠিক জানিনে।

শোনোনি কারো মুখে?

জি। লোককে বলতে শুনেছি। শুনে বুঝেছি, আপনার নাম শবনম ম্যাডাম।

: শবনম ম্যাডাম?

জি, শবনম সাদিকা ম্যাডাম।

শবনম সাদিকা রোষভরে বললো– তাহলে তুমি আমাকে কি বলবে?

শবনম ম্যাডাম বলবো।

শবনম সাদিকা গর্জে উঠে বললো– নো। শবনম ম্যাডাম নয়। আমার নাম ধরার সাহস তোমার হয় কি করে?

নূরু মিয়া চমকে উঠে বললো– তাহলে?

শুধু ম্যাডাম বলবে।

শুধু ম্যাডাম?

আজ্ঞে হ্যাঁ, শুনতে পাও না?

জি, তাহলে তাই বলবো।

হ্যাঁ, তাই বলবে।

ইতোমধ্যে ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে চলে এলো। আর কোন কথা না বলে শবনম ও নূরু মিয়া নীরবে গাড়িতে গিয়ে উঠলো।

সেদিন ছিল ছুটির দিন। শবনম সাদিকার মাদরাসা সেদিন ছিল না। নূরু মিয়া মৌলভীর কোন কাজও ছিল না। খামার বাড়ির পাইট-কিষাণেরা সবাই ক্ষেতের কাজে মাঠে নেমে গেছে। নূরু মিয়া একা একা খামার বাড়ির বারান্দায় দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে থেকে আকাশ পাতাল ভাবছে। ভাবতে ভাবতে হঠাৎই সে আনমনে গেয়ে উঠলো অন্তরভেদী ও হৃদয়বিদারক সুরে লম্বা টানের একটি গান–

'(আমি) ভুলে গেছি তব পরিচয়–
তবু তোমারে তো আজও ভুলি নাই–
আজো জেগে আছে ভালোবাসা,
অতীতের পানে যবে চাই–
তবু তোমারে তো আজও ভুলি নাই–'

নিবিষ্টচিত্তে ও বেদনাসিক্ত হৃদয়ে গেয়ে যাচ্ছে নূরু মিয়া। দশদিক ঝুরে ঝুরে পড়ছে। গানের সাথে নূরু মিয়ার চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা পানি।

নূরু মিয়া গান শুরু করার আগেই কোথা থেকে গাড়ি চালিয়ে খামার বাড়ির দিকে ছুটে এলো শবনম সাদিকা। খামার বাড়ির আঙ্গিনার কাছে আসতেই তার কানে পড়লো নূরু মিয়ার হৃদয় বিগলিত সঙ্গীতের সুর। সঙ্গে সঙ্গে আকৃষ্ট হলো শবনম সাদিকা। খামার বাড়ির প্রবেশ মুখেই গাড়ি থামিয়ে দিয়ে সে মুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগলো নূরু মিয়ার ঐ বেদনাবিদূর গান। (উল্লেখ্য যে, শবনম সাদিকা ভালই চালাতে পারে গাড়ি। সব সময় তার ড্রাইভার লাগে না।)

বইঘর.কম ও রোকন

যতক্ষণ নূরু মিয়া গাইলো, গাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো ততক্ষণই সে গান শুনে গেল শবনম। ভুলে গেল তার নিজের আর এ দুনিয়ার অস্তিত্ব। তার মনপ্রাণ সবই ডুবে রইলো নূরু মিয়ার সুরের অথৈ তলে।

অবশেষে শেষ হলো নূরু মিয়ার গান। নূরু মিয়া থামলে আস্তে আস্তে হুশে এলো শবনম সাদিকা। হুশে এসেই সে গাড়ি ওখানে রেখে ছুটে এলো নূরু মিয়ার কাছে। শবনমকে ছুটে আসতে দেখে নূরু মিয়াও ক্ষিপ্রহস্তে মুছে ফেললো দুই চোখের পানি। শবনম সাদিকা কাছে এসেই উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলে উঠলো– কি তাজ্জব! কি অসম্ভব! একি মনোমুগ্ধকর কণ্ঠ তোমার। এ কি মনোহারী সুর! এত ভাল গান জানো তুমি! www.boighar.com

হড়মড় করে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে নূরু মিয়া বললো– না না, কৈ আর গান জানি! এমনি মনের খেয়ালে গেয়ে গেলাম একটু। মানে, যাকে বলে বাথরুম সিঙ্গার।

একই রকম বিহ্বলকণ্ঠে শবনম সাদিকা বললো– বাথরুম সিঙ্গার মানে? আর একটুখানি গেয়ে গেলে কেমন? দশদিক বিমোহিত করে প্রাণ ঢেলে গেয়ে গেলে বেলাভর, আর বলছো একটুখানি গেয়ে গেলে?

মৃদু হেসে নূরু মিয়া বললো– তাই কি? কি জানি কতক্ষণ গাইলাম। আমি ঠিক খেয়াল করতে পারিনি।

এত করুণ গান এমন বিহ্বল হয়ে গাইলে সেটা কি আর খেয়াল থাকে? শুনতে গিয়ে আমি নিজেই ঠাহর করতে পারলাম না, কতক্ষণ শুনলাম। চেতনা লুপ্ত গায়ক সেটা খেয়াল করবে কি করে?

গানটা কি তাহলে সত্যিই ভাল লাগলো আপনার?

শুধুই ভাল লাগা! আমি বিমোহিত হয়ে গেছি। আমাকে পাগল করে ফেলেছে।

ম্যাডাম!

গানটা এত মিষ্টি আর এত হৃদয়গ্রাহী যে, শুনতে গিয়ে আমি আমার অস্তিত্বটাই হারিয়ে ফেলেছিলাম।

নূরু মিয়া নির্লিপ্তকণ্ঠে বললো– তা হতেই পারে। ঐ যে কথায় বলে– 'আওয়ার সুইটেস্ট সংগ্স্ আর দোজ্, দ্যাট টেল অফ স্যাডেস্ট থট্'।

দেখারও অধিক চমকে উঠলো শবনম সাদিকা। কাঁপতে কাঁপতে বললো– কি বললে, কি বললে!

নূরু মিয়া নিঃসংকোচে বললো– না- না, কিছু নয়, কিছু নয়। আমার উস্তাদের

বইঘর.কম ও রোকন
কাছে শোনা কথাটা বললাম আর কি। তিনি বলতেন– সেই সব গানই আমাদের কাছে খুব বেশি মিষ্টি লাগে, যে গান করুণতম আর সর্বাধিক হৃদয়বিদারক অনুভূতি প্রকাশ করে।

বিস্ফারিত নেত্রে শবনম সাদিকা বললো– কি তাজ্জব! এত বড় পণ্ডিত মানুষও তুমি!

এবার থমকে গিয়ে নূরু মিয়া বললো– সে কি! আপনি এসব কথা বলছেন কেন? আমি পণ্ডিত মানুষ হলাম কি করে?

হলে না? ঐ রকম কঠিন ইংরেজি আর তার এমন অনবদ্য বাংলা তরজমা যে জানে, সে পণ্ডিত মানুষ নয় মানে? মহাপণ্ডিত মানুষ। এটা তুমি আমার কাছে চেপে গেছো কোন উদ্দেশ্যে?

ম্যাডাম!

এটা চেপে গিয়ে তুমি এই ছোট কাজ করতে এসেছো এখানে, উদ্দেশ্য কি তোমার?

নূরু মিয়া ব্যস্তকণ্ঠে বললো– আরে না না। ভুল ভুল। বুঝতে আপনি ভুল করেছেন। আমার নিজের কোন বিদ্যা ওটা নয়। ওটা আমার শুনে শেখা বিদ্যা। আমার উস্তাদ বলেছিলেন, আমি তাই শুনে শিখেছি। আমার নিজের কোন জ্ঞান বিদ্যা নেই।

নেই। তুমি লেখাপড়া জানো না?

ঐ করঠ একটু। নিজের নামটা ভালোভাবে লিখতে পারি, এই যা।

কি আশ্চর্য! তুমি ঠিক কথা বলছো? এমন একটা ইংরেজি...

জি জি। ঠিক বলছি। আমার ব্যাপারটা ঠিক জাহাজ ঘাটের কুলিদের ব্যাপার। অহরহ সাহেবদের সংস্পর্শে থাকায় শুনে শুনে কুলিরাও অনেক বড় বড় আর শক্ত শক্ত ইংরেজি শিখে ফেলে। আমিও তাই ঐ রকম দুই একটা শিখে ফেলেছি।

কিছুক্ষণ চিন্তা করে শবনম সাদিকা বললো– হতেও পারে হয়তো। তবে আজ তিন তিনটে বিষয় আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। এক নম্বর– তুমি যে একজন অতিশয় দর্শনধারী যুবক, এ নিয়ে কারো কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। দুই নম্বর– তুমি যে একজন অসাধারণ ও অতিমাত্রায় উচ্চমানের শিল্পী, সেটা দিন বরাবর স্পষ্ট হয়ে গেল। তিন নম্বর– তুমি একজন অনেকখানি জ্ঞান-বুদ্ধিওয়ালা মানুষ। একেবারেই হাবাগোবা আর কাঠমূর্খ মানুষ তুমি নও।

সেটা আপনার একটা ধারণা ম্যাডাম। আসল ব্যাপারটা ঠিক এতটা নয়। তা যাক, হঠাৎ এদিকে কোথায় যাচ্ছেন ম্যাডাম?

প্রসঙ্গ পাল্টে যাওয়ায় শবনম সাদিকা থতমত করে বললো– তা যাচ্ছিলাম মানে তোমার কাছেই আসছিলাম। একটা কাজ ছিল।

কাজ ছিল? বলুন ম্যাডাম কি করতে হবে!

করতে হবে মানে, আমার এই স্যান্ডেলটা কালি করে আনতে হবে আর কিছু কেনাকাটা করতে হবে। তুমি পারবে এখন?

জি ম্যাডাম, অবশ্যই পারবো। বলুন আর কি কি কিনতে হবে?

হবে মানে একটা কাঠ পেন্সিল একটা 'ইরেজার' মানে দাগ তোলা রাবার, একটা শিশ কলম, একটা নেইল কাটার, এক ডজন সেফ্‌টিপিন আর এক দিস্তা লাইন টানা কাগজ। পারবে এতসব আনতে?

খুব পারবো। একশ'বার পারবো। টাকা দিন, আমি এখনই যাচ্ছি।

তাহলে তাই যাও।

পার্স থেকে কয়েকটা টাকা বের করে নূরু মিয়ার হাতে দিতে দিতে শবনম বললো– ওহো, এ স্যান্ডেল খুলে দিলে আমি পায়ে দিবো কি? দাঁড়াও, আমার গাড়িতে পাশের সিটে আর এক জোড়া স্যান্ডেল আছে, ওটা আনি।

শুনেই নূরু মিয়া শশব্যস্তে বললো– আমি আনছি ম্যাডাম, আমি আনছি– বলেই গাড়ির দিকে দৌড় দিল মৌলভী নূরু মিয়া।

কয়েকদিন হলো গরম পড়েছে খুব বেশি। মাদরাসার ক্লাস শেষে গাড়ির কাছে এসে শবনম সাদিকা হাঁপাতে হাঁপাতে নূরু মিয়াকে বললো– উঃ! কি গরম! গরমে একদম ভিজে গেছি। এখানে মাথার বোরকা খুলে ফেললে তো কোন দোষ নেই, না কি বলো?

বুঝতে না পেরে নূরু মিয়া বললো– জি?

শবনম সাদিকা বললো– বলছি এখানে বোরকা খুললে মাদরাসার শিক্ষিকারা দেখতেও পাবেন না আর এখানে দোষ ধরতেও আসবেন না। বোরকাটা খুলে ফেলি।

নূরু মিয়া সসংকোচে বললো– খুলে ফেলবেন?

শবনম সাদিকা বললো– হ্যাঁ, ফেলবো। গরম আর সহ্য হচ্ছে না।

কিন্তু আমার সাক্ষাতে? তা তো কোনদিন খুলেন না?

বইঘর.কম ও রোকন

আজ খুলবো। তুমি তো আমার মুখের দিকে তাকাও না। অসুবিধা কি?

বলতে বলতে মাথার বোরকা খুলে ফেলে শবনম সাদিকা বললো– গায়ে বোরকা থাকলে সেটা আগেই খুলে ফেলতাম। এই যে, এবার নাও, বোরকাটা একটু ধরো।

আনমনে বোরকা হাতে নিতে গিয়ে নূরু মিয়ার চোখ পড়লো শবনম সাদিকার মুখে আর সঙ্গে সঙ্গে সে মুখে আটকে গেল নূরু মিয়ার চোখ। সে পুরোপুরি আত্মবিস্মৃত হয়ে গেল। বোরকা ধরার জন্যে বাড়ানো হাতটা কাছে নেয়ার হুশটা তার রইলো না। বোরকা হাতে হাতটা ঐভাবে বাড়িয়ে রেখেই সে এক ধেয়ানে চেয়ে রইলো শবনম সাদিকার মুখের দিকে।

নূরু মিয়ার দিকে তাকাতেই নূরু মিয়াকে ঐ অবস্থায় দেখে শবনম সাদিকা চমকে উঠলো। আক্রোশভরে বললো– এ্যাঁ! সেকি! তুমি নাকি আমার মুখের দিকে তাকাও না? হোয়াট্ ইজ্ দিস?

আত্মবিস্মৃত নূরু মিয়া বললো– জি?

শবনম সাদিকা সগর্জনে বললো– তুমি আমার মুখের দিকে এভাবে তাকিয়ে আছো কেন?

আত্মবিস্মৃত নূরু মিয়া বললো– দেখছি।

শাট্ আপ্। দেখছো মানে? কি দেখছো?

আপনার মুখ।

খুন করবো। আমার মুখ?

: জি জি। মনে হচ্ছে অবিকল সেই রকম!

সেই রকম!

ঐ মুখটার মতো। আমার ছোটবেলায় দেখা সেই মুখটার মতো।

থমকে গেল শবনম সাদিকা। কিছুটা আগ্রহীকণ্ঠে বললো– সেই মুখটার মতো?

না মানে, হুবহু সেই রকম নয়, অনেকটা সেই রকম!

অনেকটা?

হ্যাঁ– মানে, হুবহু সেই রকম মনে হচ্ছে আবার সেই রকম মনে হচ্ছে না। আপনার মুখটা কেমন যেন সেই মুখের সাথে মিলছে না। আবার মনে হচ্ছে মিলছে। এই মনে হচ্ছে সেই মুখ, আবার মনে হচ্ছে– না, সে মুখ নয়।

খোয়াব দেখছো?

বইঘর.কম ও রোকন

খোয়াব? না- না, ঠিক বলছি।

শবনম সাদিকাও অনেকখানি আনমনা হয়ে গেল। আনমনা হয়ে বললো, তাহলে ঐ যে গানটা আছে। ঐ গানের মতো, না কি বলো? মানে ঐ যে গানটা–

ওগো সুন্দরো–
মনের গহনে তোমার মূরতিখানি,
ভেঙ্গে যায় মুছে যায় বারে বারে...

কথা শেষ না হতেই নূরু মিয়া সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো– জি জি, ঠিক বলেছেন– ঠিক বলেছেন। ঠিক ঐ ব্যাপার। এই আছে, এই নেই।

কি এই নেই?

সেই মুখ। আপনার মুখে সেই মুখের প্রতিচ্ছবি।

তখনই আবার সজ্ঞানে ফিরে এলো শবনম সাদিকা। বললো– তোমাকে ভূতে ধরেছে।

ভূত!

এ রকম ভূতে এর আগে আর কখনো ধরেছে?

জি?

কণ্ঠে জোর দিয়ে শবনম সাদিকা বললো– এই রকম পাগলামী এর আগে আর কখনো করেছো?

পাগলামি?

শবনম সাদিকা ফের ক্ষিপ্তকণ্ঠে বললো– ডাণ্ডা খেয়েছো আগে কখনো? আমার বা অন্য কোন মুখে তোমার ঐ ছোটকালে দেখা মুখটা খুঁজতে গিয়ে ডাণ্ডা খেয়েছো কখনো?

নূরু মিয়ারও আস্তে আস্তে হুশ ফিরে এলো। বললো– জি- জি, খেয়েছি।

এ্যাঁ! খেয়েছো?

www.boighar.com

জি- জি। দুই বার। একবার চোখ বেঁধে আমাকে চাবুক মেরে একেবারে রক্তাক্ত করে দিয়েছে।

তাই? কে রক্তাক্ত করে দিয়েছে? মানে, কে চাবুক মেরেছে?

আমি দেখতে পাইনি। আমার দুই চোখ বাঁধা ছিল যে! লোকজন আমাকে ধরে দুই চোখ বড় কাপড় দিয়ে শক্ত করে বেঁধে কার কাছে যেন নিয়ে গেল আর কে যেন চাবুকের পর চাবুক মেরে আমার পিঠ আর হাত-পা রক্তাক্ত

বইঘর.কম ও রোকন

করে দিলো।

তবু দুই দুই বার এসেছো? একবারও লজ্জা হয়নি?

কি করে হবে! ঐ যে 'তবু তোমারে তো আজও ভুলি নাই!'

শেষের দিকে কিছুটা সুরই বেরিয়ে এলো নূরু মিয়ার কণ্ঠ দিয়ে। শবনম সাদিকা চমকে উঠে বললো– সেকি! সেদিন যে গানটা গাইছিলেন, তাহলে তা ঐ মেয়েটাকে উদ্দেশ্য করে? সেদিন তো তা স্বীকার করলে না?

কি করে করবো, শরম করে না?

চাবুক খেতে শরম করে না? এত যে চাবুক খেলে...

আপনি দেখেছেন? চাবুক খেতে আমাকে দেখেছেন?

হ্যাঁ, একবার তো দেখেছি।

দেখেছেন? কাকে মেরেছে, আমাকে?

তা বলতে পারবো না। চোখ বাঁধা এক ছেলেকে মারলো, আমি দূর থেকে দেখেছি। চিনবো কি করে?

শবনম সাদিকা আর নূরু মিয়ার মধ্যেই এই কথোপকথনে অনেক সময় কেটে গেল। তা দেখে ড্রাইভার মমতাজ শেখ গাড়ি থেকে নেমে এসে বললো– সেকি! আপনারা কি দিওয়ানা বনে গেলেন নাকি ছোট হুজুরাইন? গাড়িতে আসবেন না?

শবনম সাদিকা বললো– হ্যাঁ- হ্যাঁ, চলো যাই।

এরপর নূরু মিয়াকে বললো– এই, দাও আমার বোরকা।

নূরু মিয়া বললো– এ্যাঁ, বোরকা দেবো?

রাগ হলো মমতাজ শেখের। সে গরমকণ্ঠে বললো– দেবে না তো কি ওটা নিয়ে সঙ-এর মতো দাঁড়িয়ে ছোট হুজুরাইনের মুখের দিকে ঐভাবে তাকিয়ে থাকবে?

খেয়াল হতেই নূরু মিয়া তাড়াতাড়ি নামিয়ে নিলো চোখ। মমতাজ শেখ তাকে ফের বললো– এতক্ষণও যে ছোট হুজুরাইন তোমাকে চাব্‌কে শুইয়ে দেননি, এই তোমার ভাগ্নি। আজ যে কি হয়েছে তাঁর! এতটা তো উনি কখনো বরদাস্ত করেন না!

বলতে বলতে মমতাজ শেখ গাড়ির দিকে গেল। ইতোমধ্যে এখানে বেশ কিছু লোক জমে গিয়েছিল। একজন কম বয়সী পথচারী হিন্দু বিধবা শবনমের

কিছুটা চেনা। শবনমের পাশে নূরু মিয়াকে দেখে বিধবাটি একদম মোহিত হয়ে গিয়েছিল। ড্রাইভার চলে যেতেই সে শবনমের কাছে এসে বললো– ওমা, সেকি! আপনারও বিয়ে হয়ে গেছে! বাঃ বাঃ! খুব ভালো।

অতঃপর নূরু মিয়াকে দেখিয়ে দিয়ে বিধবাটি বললো– এইটে বুঝি বর? আহা, কি চোখ ধাঁধানো জুটি গো দিদি! একেবারে মণিকাঞ্চন যোগ। এমনটি কদাচিৎ দেখা যায়।

শবনম সাদিকা ভীষণ রুষ্টকণ্ঠে বললো– খবরদার ক্ষ্যান্তমণি! এসব তুমি কি বলছো? বর মানে? কাকে কি বলছো?

ভ্যাবাচেকা খেয়ে ক্ষ্যান্তমণি বললো– ওমা, সেকি! হায় ভগোবান! বর নয়? তবে কি?

শবনম সাদিকা একই কণ্ঠে বললো– তবে কি! তবে কি?

ক্ষ্যান্তমণি বললো– বলছিলাম, বর যখন নয়, তাহলে ওটা বুঝি আপনার বন্ধু, মানে ভালোবাসার মানুষ?

গর্জে ওঠে শবনম সাদিকা বললো– ক্ষ্যান্তি...!

ক্ষ্যান্তমণি ক্ষুণ্নকণ্ঠে বললো– ওমা! আমি কি দোষ করলাম দিদি? আমি জানতে চাইলাম শুধু। এত সুন্দর লোকটা আপনার কে, এইটুকু তো জানতে চাইলাম? আমার দোষটা হলো কি?

রাগে ফুঁসে উঠে শবনম সাদিকা বললো– ওটা আমার কাজের লোক।

এ্যাঁ! কাজের লোক?

হ্যাঁ- হ্যাঁ, আমার ফায়ফরমাশ খাটা লোক। আমার চাকর। আর কিছু জানতে চাও?

না গো দিদি, আর জানতে চাইনে। ভগবানের কি লীলা খেলা।!

তাহলে আর হা করে দাঁড়িয়ে আছো কেন? যেখানে যাচ্ছো, এবার যাও সেখানে।

হ্যাঁ যাচ্ছি। থাকতে কি এসেছি?

গজর গজর করতে করতে নাখোশ মনে ফের পথে নামলো শবনম সাদিকার এক কালের ও দু'দিনের পাঠশালার সহপাঠিনী ক্ষ্যান্তমণি গোস্বামী।

এখন বিকেলে প্রতিদিনই শবনম সাদিকা সেলাই আর আর্ট স্কুলে যায়। মহিলা টিচার সেলাই আর আর্ট শেখায় শবনমকে। শবনম সাদিকা এমব্রয়ডারী কাম ক্যালিওগ্রাফি শিখতে চায়। এ সখ তার দুর্বার। সেলাই কাম আর্ট স্কুলটাও অনেকখানি দূরে। গাড়ি নিয়ে যেতে হয়। মমতাজ শেখ সব দিনই দুই বেলা গাড়ি চালাতে পারে না। শরীরে তার কুলায় না। এছাড়া অন্যান্য নানা কাজে সংসারের প্রয়োজনে প্রায় দিনই মমতাজ শেখকে নানাদিকে যেতে হয়। তাই সে অবসরও পায় না। সে সব দিন শবনম সাদিকা নিজেই ভিন্ন গাড়ি চালিয়ে যায়। তার সঙ্গে যায় হুকুম-বরদার নূরু মিয়া। মৌলভী নূরু মিয়া।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ দিয়েই পথ। অনিন্দ্য সুন্দরী শবনম সাদিকা এখানে এলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বখাটে ছাত্রেরা প্রায়ই উঁকিঝুকি মারে। শিশ্ বাজায়। অপ্রীতিকর টিকা-টিপ্পনি কাটে। যেদিন ড্রাইভার মমতাজ শেখ আসে না, শবনম সাদিকা নিজেই গাড়ি চালিয়ে যায়। সেদিন বখাটেদের এই বাঁদরামী বেড়ে যায় মাত্রাধিক। শবনম সাদিকা ওদিকে চোখ কান না দিয়ে গায়ের রাগ গায়ে মেরে একটানা গাড়ি চালিয়ে যায়।

কিছু দিন এইভাবে যাওয়ার পর একদিন ক্ষেপে গেল শবনম সাদিকা। তবে ঐ বখাটেদের উপর নয়, ক্ষেপে গেল নূরু মিয়ার উপর। নূরু মিয়াকে লক্ষ করে শবনম সাদিকা বললো– তুমি একটা মানুষ, না আস্ত একটা ভূষির বস্তা? রাগ-পীত, উচিত-অনুচিত, দায়দায়িত্ব আর কর্তব্যবোধ কি কিছুই নেই তোমার? ছাগলের মতো বসে বসে শুধু ঘুমাও, হুশ বুদ্ধিও কি নেই তোমার কিছুই?

জবাবে নূরু মিয়া জড়িতকণ্ঠে বললো– কেন ম্যাডাম, কি করেছি আমি?

বইঘর.কম

শবনম সাদিকা বললো– কি করেছো? তোমাকে সঙ্গে নেয়াই আমার ভুল হয়ে গেছে। তোমাকে কি জন্যে আমার সঙ্গে নেয়া হয়েছে? বসে বসে ঘুমানোর জন্যে?

ম্যাডাম!

তুমি একটা জোয়ান মানুষ গাড়িতে বসে থাকতে ভার্সিটির বখাটে ছাত্রেরা আমার গাড়ির কাছে এসে ঐ রকম লাফালাফি আর ইতরামি করে আর তুমি চুপচাপ বসে থেকে তা দেখো? মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরোয় না তোমার?

কি বলবো ম্যাডাম?

কি বলবে? তুমি একজন পরিপূর্ণ মানুষ। ঐসব ছাত্রেরা বয়সে তোমার ছাত্রেরও ছোট। একটা ধমক দিতেও পারো না তুমি ওদের?

তা ম্যাডাম আমাকে তো সে কথা বলেননি? আপনার বিনে হুকুমে ধমক দিলে আমার কসুর নেন যদি!

সবকিছুতেই হুকুম দেয়ার অপেক্ষা লাগে? অপদার্থ কাঁহাকার!

আর কিছু না বলে শবনম সাদিকা গাড়ি চালিয়ে চলে গেল সেদিন।

পর দিন বখাটেরা আবার শবনম সাদিকার গাড়ি ঘিরে ঝামেলা করার চেষ্টা করতেই বাঘের মতো গর্জে উঠলো নূরু মিয়া। বললো– খবরদার বেয়াদবের দল! তোমাদের মা-বোন নেই! তাদের ইজ্জত নেই? মেয়ে ছেলে দেখলেই তার দিকে ছুটে আসো কোন আক্কেলে? এতটাই ইতর তোমরা?

এ কথায় কয়েকজন বখাটে এক সাথে বলে উঠলো– তবেরে! শাট আপ্ ব্যাটা খানকির পো!

প্রত্যুত্তরে নূরু মিয়া বজ্রকণ্ঠে বললো– ইউ শাট আপ্! বাস্টার্ড- ইডিয়েট- স্টুপিড- ননসেন্স!

কি! এত বড় কথা?

এত বড়ই কথা! স্ট্রিট ডগ্ কাঁহাকার! এরপরও না পালালে এক একজনের ঠ্যাং খোঁড়া করে দেবো!

নূরু মিয়ার চোখে আগুন জ্বলতে লাগলো। বখাটেরা থমকে গিয়ে বললো– এ্যাঁ!

নূরু মিয়া বললো– হ্যাঁ!

বলেই পাশে রাখা পাকা বাঁশের গিট্ওয়ালা লাঠিটা হাতে নিয়ে দরজা খুলে

গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়লো নূরু মিয়া। তার বলিষ্ঠ দেহ আর চোখে আগুন দেখে চমকে উঠলো বখাটেরা। ওদের দলপতি রুদ্ধশ্বাসে বললো– ওরে বাপরে! এ যে একদম যমদূত! পালা পালা, শিগগির পালা...

পড়িমরি দৌড় তিলো বখাটেরা এবং চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল। জঞ্জাল সাফ হয়ে গেলে, নূরু মিয়া ধীরে ধীরে এসে গাড়িতে উঠে বসলো।

এতক্ষণ দম বন্ধ করে বসেছিল শবনম সাদিকা। নূরু মিয়ার ঐ দস্যুর মতো মূর্তি দেখে সে নিজেও ঘাবড়ে গিয়েছিল! এর সাথে নূরু মিয়ার ঐ অনর্গল ইংরেজি বলা দেখেও তার দুই চোখ ফুটে উঠেছিল। খাস ইংরেজ ছাড়া এদেশের ইংরেজি ভাষার কম শিক্ষকই এমন ঝড়ের বেগে ইংরেজি বলতে পারে।

নূরু মিয়া গাড়িতে উঠে বসলে কিছুক্ষণ শবনম সাদিকা ভাষা হারিয়ে চেয়ে রইলো তার দিকে। এরপর বিপুল বিস্ময়ে বলে উঠলো– কি? ব্যাপার কি? ঘটনা কি? তুমি কে?

নূরু মিয়া মুখ তুলে বললো– কে মানে?

শবনম সাদিকা বললো– এমন ইংরেজি কোথায় শিখলে তুমি? তুমি কি ইংরেজিতে এমএ পাশ?

নূরু মিয়া লজ্জিতকণ্ঠে বললো– ছিঃ ছিঃ! আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন কেন ম্যাডাম? নাম সইটুকু করতে পারি– এইমাত্র। অথচ আপনি বলছেন আমি ইংরেজিতে এমএ পাশ কি না? একি আপনার পরিহাস ম্যাডাম!

পরিহাস! তাহলে এত শক্ত শক্ত ইংরেজি তুমি এত দ্রুতবেগে আওড়ে গেলে কি করে? শিখলে কোথায়?

শুনে শুনে ম্যাডাম।

: শুনে শুনে! কার কাছে শুনে শুনে?

এই ধরুন, খানিকটা আপনাদের কাছে আর অধিকটা আমার ঐ উস্তাদের কাছে শুনে শুনে শিখেছি।

: তাই কি সম্ভব?

কেন নয় ম্যাডাম! ঐ যে খালাসীদের কথা বললাম। বললাম জাহাজঘাটের কুলিদের কথা! ওরা তাবড়ো তাবড়ো ইংরেজি পণ্ডিতদের চেয়েও অনর্গল আর অসম্ভব অসম্ভব ইংরেজি শব্দ উচ্চারণ করে। ওরা তো শুনে শুনেই শেখে। আপনি দেখেননি বা শুনেননি কোন দিন ওদের ইংরেজি বলা?

শবনম সাদিকা থতমতো করে বললো– হ্যাঁ, মানে তা শুনেছি বৈকি। আব্বার সাথে কয়েকবার জাহাজঘাটে গিয়ে তা শুনেছি আর অবাক হয়ে গেছি। সত্যিই খুব শক্ত শক্ত ইংরেজি ওরা অনর্গল বলে যায়।

তবে?

তবে মানে তুমিও কি বাস্তবিকই ওদের দলে? ওদের মতোই শুনে শুনে শেখা তোমার?

জি ম্যাডাম, জি। ষোলআনাই তাই!

আর তোমার ঐ মূর্তি? ভেজা বেড়ালের মতো নেতিয়ে পড়ে থাকো তুমি, হঠাৎ ও মূর্তি তোমার এলো কোত্থেকে?

দায়ে পড়ে ম্যাডাম। দায়ে পড়ে ও মূর্তি আমার রপ্ত হয়ে গেছে।

দায়ে পড়ে?

জি। এককালে এক লাঠিয়ালদের দলে আমাকে থাকতে হতো আর তাদের সাথে চুরমার লাঠি খেলতে হতো। মার মার হুংকার ছাড়তে হতো।

আচ্ছা?

খাবার আর আশ্রয়ের জন্যেই ঐ দলে থাকতাম আর লাঠি খেলতাম।

বলো কি?

তার চেয়েও বড় কথা, পেটের দায়ে এক সময় গ্যারেজে, মানে গাড়ি মেরামত করা ওয়ার্কশপে এক মেকারের হেলপার ছিলাম। অনেক মেকার ভিন্ন ভিন্ন ওয়ার্কশপ খুলে ওখানে গাড়ি মেরামত করতো। সে সব ওয়ার্কশপে গাড়ি সারাতে অনেক লোক গাড়ি নিয়ে আসতো। হই হট্টগোল সব সময় লেগেই থাকতো। লেবারদের মধ্যে লেগেই থাকতো ঝগড়া-ফ্যাসাদ আর হাতাহাতি। তার চেয়েও বড় কথা, ঝাঁকে ঝাঁকে চাঁদাবাজের দল এসে চাঁদা আদায় করার জন্যে জব্বের তাফালিং আর মাস্তানি করতো প্রতিদিন। আমার মেকার সাহেবের হয়ে ওদের ঠেকাতে হামেশাই আমাকে লাঠি হাঁকাতে হতো। মানে লাঠিয়ালী করতে হতো। তাই ঐ স্বভাবটা খানিক রয়েই গেছে আমার মধ্যে।

শবনম সাদিকা স্তম্ভিত হয়ে বললো– তাজ্জব! এই রকম মানুষ তুমি? তোমার অতীতটা পুরোপুরি না জেনে তোমাকে আমাদের বাড়িতে তোলাটা তো মোটেই ঠিক হয়নি ম্যানেজার সাহেবের! অতীতে কোন খুন জখমও করে রেখেছো কিনা, কে জানে!

বইঘর.কম ও রোকন

জি না ম্যাডাম, আমি কসম করে বলছি, আর যা-ই করি, কোন হীন বা গর্হিত কাজ কিছু করিনি। ছোটকালে পিতামাতা আর আশ্রয়হারা হয়ে আশ্রয়ের প্রয়োজনে এবং পেটের দায়ে নানা কিছুই করতে হয়েছে ঠিক, কিন্তু তাই বলে কোন হীন বা নীচ কাজ করিনি আমি কোনোদিন। কাজেই আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তার কোনই কারণ নেই ম্যাডাম। আমি নেমকহারাম বা বেঈমান নই কখনো।

এরপর আর কোন কথা যোগালো না শবনম সাদিকার মুখে।

মৌলভী নূরু মিয়াকে সাথে নিয়ে শবনম সাদিকা গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে তার এক বান্ধবীর সাথে দেখা করতে। নিরিবিলি এলাকা দিয়ে পথ। পথটার মাঝামাঝি আসতেই শবনম সাদিকা দেখতে পেলো সুদৃশ্য এক পাখির বাচ্চা রাস্তার ঠিক মাঝখানে পড়ে থেকে ধুঁকছে। শবনম সাদিকা বার বার গাড়ির হর্ন বাজানো সত্ত্বেও পাখির ছানাটা রাস্তা থেকে সরছে না। একইভাবে গাড়ি চালিয়ে গেলে পাখির ছানাটা গাড়ির চাকার তলে নিশ্চিত পিষ্ট হয়ে যাবে বুঝতে পেরে শবনম সাদিকা গাড়ি থামিয়ে গাড়ি থেকে নামলো এবং ছানাটার কাছে গেল। গায়ে হাত দিতে গেলেই বাচ্চাটা নড়ে উঠে অল্প একটু দূরে গিয়ে আবার থামলো এবং ধুঁকতে লাগলো। বাচ্চাটা বড় মনোরম দেখতে। বাচ্চাটাকে ধরার খুব খাহেশ হলো শবনম সাদিকার। সেও তাই আবার ছানাটার কাছে গিয়ে হাত বাড়লো। ছানাটা আবার দ্রুত খানিকটা সরে গিয়ে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগলো। জিদ্ চেপে গেল শবনম সাদিকার। সে এবার দৌড়ের উপর ছানাটার কাছে গেল এবং হাত বাড়ালো। ছানাটা এবার অল্প অল্প উড়তে শুরু করলো। শবনম সাদিকাও তার পিছু নিলো। কিন্তু কিছুটা ঝোপঝাড়ের কাছে এসেই ছানাটা প্রাণপণে ঝাড়ের মধ্যে আসতেই তার পায়ে গাছের একটা লম্বা কাঁটা ঢুকে গেল আর 'ও-মাগো' বলে সে ওখানেই বসে পড়লো।

www.boighar.com

চমকে উঠলো নূরু মিয়া। সাপে-টাপে কামড় দিলো কি না ভেবে সে 'কি হলো– কি হলো' বলে ছুটে এলো শবনম সাদিকার কাছে। শবনম সাদিকা কাতরাতে কাতরাতে বললো– কাঁটা!

মস্ত একটা কাঁটা একদম পায়ের গোড়ালির মধ্যে বসে গেছে।

নূরু মিয়া দেখলো, ঘটনা সত্যি। একটা কাঁটা প্রায় পুরোটাই পায়ের মধ্যে ঢুকে ভেঙ্গে আছে। নূরু মিয়া বললো– মস্ত বড় মুসিবত। আপনি উঠে দাঁড়াতে পারবেন ম্যাডাম?

শবনম সাদিকা নাখোশকণ্ঠে বললো– কি করে দাঁড়াবো দেখতে পাচ্ছো না, কাঁটাটা গোটাই পায়ের মধ্যে পুঁতে গেছে!

দেখতে তো পাচ্ছি ম্যাডাম। কিন্তু গাড়িতে না গেলে এখানে ও কাঁটা তো তোলা যাবে না।

কেন যাবে না? এখানে পারবে না?

জি না ম্যাডাম। আপনাকে শুয়ে পড়তে হবে। এখানে শোবেন কোথায়? চারদিকে গিজ গিজ করছে কাঁটা। এখানে শুতে গেলে আরো কাঁটা ঢুকে যাবে আপনার গায়ে-পায়ে। গাড়িতে গিয়ে গাড়ির সিটে শুয়ে পড়তে হবে।

তাহলে ধরো। আমার তো এ পা পাতার উপায় নেই। তোমার কাঁধে ভর দিয়ে এক পায়ে হেঁটে গাড়ির কাছে যেতে হবে আর তোমাকেই আমাকে গাড়িতে তুলে নিতে হবে। আমার উঠার সাধ্য নেই।

তাই করা হলো। শবনম সাদিকাকে গাড়ির কাছে এনে চ্যাংদোলা করে তাকে গাড়িতে তুলে নিলো নূরু মিয়া। অতঃপর সিটে শুইয়ে দিয়ে নখ দিয়ে খুঁটরিয়ে তার পায়ের কাঁটা সে তোলার চেষ্টা করলো। কিছুক্ষণ চেষ্টা করার পর নূরু মিয়া বললো– নখ দিয়ে তো ধরা যাচ্ছে না ম্যাডাম। যতই ধরার চেষ্টা করছি ততই পিছলে পিছলে যাচ্ছে। কাঁটাটা মোটা নয়, চিকন কাঁটা। একটু সূঁচ হলে...

শবনম সাদিকা বললো– সূঁচ? এখানে সূঁচ...

নূরু মিয়া বললো– আপনি দাঁড়ান ম্যাডাম, আমি নেমে গিয়ে গাছ থেকে একটা শক্ত কাঁটা ভেঙ্গে আনি। ঐ কাঁটা দিয়েই এই কাঁটা তুলতে হবে।

ঐ কাঁটা দিয়ে? একটা কাজ করলে হয় না? আমার চুলের খোঁপায় অনেকগুলো কাঁটা আছে। চুলের কাঁটাগুলোর মুখও বেশ চোখা। তা দিয়ে হবে না?

হতে পারে ম্যাডাম, তা দিয়েও হতে পারে।

তাহলে তুলে নাও। আমার খোঁপা থেকে তুলে নাও একটা কাঁটা।

খোঁপার কাঁটা তুলে নিয়ে নূরু মিয়া এবার একটু চেষ্টা করতেই বেরিয়ে এলো কাঁটার মাথা আর নূরু মিয়া নখ দিয়ে সহজেই ধরে এক টানে বের করে

বইঘর.কম ও রোকন

ফেললো পায়ের কাঁটা। কাঁটাটা লম্বা কিন্তু মোটা নয়। তাই কাঁটাটা বেরিয়ে আসায় শবনম সাদিকার বেশি কষ্ট হলো না বা রক্তপাতও হলো না বিন্দু খানেকের বেশি। নূরু মিয়া ক্ষতস্থান নখ দিয়ে ডললে আর তার আহারের জন্যে রাখা লবণ ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিলে বিষ বেদনা অনেকটাই কমে গেল। শবনম সাদিকা হাসি মুখে উঠে বসলো এবার। চুলের কাঁটাটা নূরু মিয়ার হাতেই ছিল। শবনম সাদিকা বললো– চুলের কাঁটাটা এবার খোঁপায় লাগিয়ে দাও আবার। যেখান থেকে তুলেছো ঠিক সেখানে লাগিয়ে দাও।

নির্দেশ অনুযায়ী নূরু মিয়া এসে শবনম সাদিকার কোল ঘেঁষে বসলো এবং খোঁপাটা এক হাতে আলতোভাবে ধরে রেখে অন্য হাতে কাঁটাটা পুঁতে দিলো যথাস্থানে।

এতে করেই ঘটে গেল মস্ত বড় অঘটন। রাস্তা দিয়ে অবিরাম আসছে যাচ্ছে গাড়ি। এদের গাড়ির পাশে কখন যে আর একটা গাড়ি এসে থেমে গিয়েছিল, কাঁটা তোলা নিয়ে ব্যস্ত থাকায় সেটা খেয়াল করেনি তারা। খোঁপায় কাঁটা পরিয়ে দেয়ার কালেই হুংকার এলো পাশ থেকে– হোয়াট ইজ দিস? কে, কে তুমি?

সাথে সাথেই কে একজন হুংকার দাতার পাশ থেকে বলে উঠলো– সার্ভেন্ট হুজুর। চাকর। ঐ মেয়েটার চাকর। আমি চিনি।

হুংকারদাতা বললো– চাকর? চাকরের সাথে এই প্রেম আর ফষ্টিনষ্টি! তবেরে স্কাউন্ড্রেল...

লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে এলো হংকারদাতা। নূরু মিয়াকে লক্ষ করে বললো– আয়, গাড়ি থেকে নেমে আয় হারামজাদা। তোর হাড় আমি গুড়ো করে ছাড়বো। আমার হবু বউয়ের সাথে এই নষ্টামি!

হুংকার শোনে শক্ত হয়ে ওঠে বসলো নূরু মিয়া। শক্তকণ্ঠে বললো– কে? কে তুমি?

হুংকারদাতা ফের লাফিয়ে উঠে বললো– তবেরে! শক্ত ঠাপ কাকে বলে তা দেখিস্‌নি খানকির পো! আমাকে 'তুমি' বলার সাহস করিস তুই? মরদ চিনিস্‌ না?

নূরু মিয়া বললো– তাই তো চিনতে চাচ্ছি! মরদটা কে, তা চিনতে চাই।

হুংকারদাতা বললো– শাহজাদা- শাহজাদা! রাজপুত্র। শাহজাদা প্রিন্স বাহাদুর আলী শাহ।

বইঘর.কম ও রোকন

নূরু মিয়া বললো– কোনো শাহজাদার ভাষা তো এমন হয় না। এতো ঐ বাঁদুর খাটাশের ভাষা। এ আবার কেমন শাহজাদা!

বাহাদুর আলী শাহ বললো– শাহজাদা প্রিন্স বাহাদুর আলী শাহ। খোদ রাজপুত্র। তোর চৌদ্দগোষ্ঠীর মনিব। মনিবকে চিনিস না বেল্লিক?

কি করে চিনবো? কামড়িয়ে দেখলে তো বুঝবো আসলে তুমি মানুষ না পশু! মানে, চামড়াটা মানুষের না চতুষ্পদের।

আয় শালা নেড়িকুত্তা! গাড়ি থেকে নেমে এসে কামড় দে তো দেখি, কেমন মরদ তুই!

নেমে আসবো?

আসবি মানে? মুখের কথায় না এলে, কান ধরে নামিয়ে এনে তোকে তুলোধুনো না করেই ছেড়ে দেবো!

নামতেই হলো নূরু মিয়াকে। শবনম সাদিকা তাকে নিষেধ করলো কয়েকবার। সে কথায় কান না দিয়ে নূরু মিয়া নেমে এলো গাড়ি থেকে। নূরু মিয়া নেমে আসতেই হাতের চাবুক দিয়ে নূরু মিয়াকে মারতে শুরু করলো রাজপুত্র বাহাদুর আলী শাহ। দুই বাড়ি মারতেই বাহাদুর আলীর চাবুকটা এক টানে কেড়ে নিয়ে দূরে ফিঁকে দিলো নূরু মিয়া। আগুনের মতো জ্বলে উঠলো বাহাদুর আলী। চিৎকার করে উঠলো– তবে রে বেল্লির বাচ্চা...

লাফ দিয়ে গিয়ে গাড়ি থেকে তার রোলারটা নিয়ে এলো বাহাদুর আলী এবং এসেই সেই রোলার দিয়ে পর পর কয়েকটা ঘা মারলো নূরু মিয়ার পিঠে। ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল নূরু মিয়ার। বাহাদুর আলীর হাত থেকে রোলারটা কেড়ে নিয়ে সে সেই রোলারটা সমানে হাঁকাতে লাগলো বাহাদুর আলীর পিঠে। যেমন তেমন ঘা নয়, একদম আজরাইলের ঘা। রোলারের পর পর কয়েকটা ঘা মারতেই রাজপুত্র বাহাদুর আলী শাহ অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়লো মাটিতে। নষ্ট করে ফেললো তার পরনের কাপড় চোপড়।

'মারা গেল– হুজুর মারা গেল' বলে রাজপুত্র বাহাদুর শাহর তাবেদারটা তার সহায়তায় এলে তার পিঠেও রোলারের এক ঘা মারলো নূরু মিয়া। কঁকিয়ে উঠলো তাবেদারটা। সে চিৎকার করে তাদের ড্রাইভারটাকে ডাকতে লাগলো। অতি ভয়ে ভয়ে ড্রাইভারটা সেখানে এলে নূরু মিয়া রোলারটা ফিঁকে দিয়ে নিজের গাড়িতে এসে উঠলো। এই ফাঁকে তাবেদার ও ড্রাইভার দুইজনে ধরে বাহাদুর আলীকে গাড়িতে তুলে নিয়ে বিপুল গতিতে ছেড়ে

দিলো গাড়ি।

শবনম সাদিকারা বাড়িতে ফেরার কিছুক্ষণ পরই বজ্রপাত শুরু হলো জমিদার মোজাফফর আহমদ খান চৌধুরীর বাড়ির গেটে। অকস্মাৎ গর্জন শুনে ম্যানেজার কোরবান আলী মিয়া ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছুটে এলো সেখানে। এসে দেখলেন, গেটে তিন চার জন লোক হুংকার তুলছে সমানে। এদের ম্যানেজার সাহেব চেনেন। এদের একজন বড় লাটের উপদেষ্টা ডেভিড নিকোলসন সাহেবের চাটুকার গুরু গোবিন্দ ঠাকুর ভারিক্কি চালে বললো– এই যে লোক, আমি কে তা জানো?

ম্যানেজার সাহেব বললেন– হ্যাঁ, জানি তো।

গুরু গোবিন্দ ঠাকুর বললো– আমার নাম কি আছে?

আপনার নাম গুরু গোবিন্দ ঠাকুর।

হিজ এক্সসেলেন্সী স্যার ডেভিট নিকোলসন সাহেব আমাকে কোন নামে ডাকে, তা জানো?

হ্যাঁ, তাও জানি। আপনাকে গরু গাভীন ঠাকুর বলে ডাকে।

রাইট! ঠিক ধরেছো। উনি আমাকে এতনাই পেয়ার করে।

অতঃপর দীদার আলী শাহকে দেখিয়ে দিয়ে গরু গাভীন্ ঠাকুর বললো– আর এই লোক? এই ব্যক্তিকে চেনো?

ম্যানেজার সাহেব বললেন– চিনবো না কেন? ইনি ষষ্ঠীতলার জমিদার দীদার আলী শাহ।

: তাহলে? তাহলে এর অর্থ কি? আমাদের মতো নামকরা ভিআইপিদের গেটে দাঁড় করে রেখে বাৎচিৎ করে চলেছো? তোমার এটিকেট্ বোধটাও নেই? আমাদের বসতে দেয়া সর্বাগ্রে জরুরি– তারপরে চা-নাশতা সে সেন্সটাও হারিয়ে ফেলেছো?

এরা হীন চরিত্রের লোক জানা সত্ত্বেও ম্যানেজার সাহেব এদের খাতির করতে বাধ্য হলেন। কারণ, এরা ক্ষমতাধরদের তথা দণ্ডমুণ্ডের কর্তাদের চামচে। আর সেই সুবাদে এরাও ক্ষমতাধর লোক। ভাল করার কোন ক্ষমতা এদের না থাকলেও মন্দ করার প্রভূত ক্ষমতা রাখে এরা। তাই ম্যানেজার সাহেব বললেন– আসুন- আসুন, ড্রয়িংরুমে এসে বসুন।

এদের নিয়ে গিয়ে দহলিজে বসালে, গরু গাভীন্ ঠাকুর বললো– এবার তোমার মনিবকে বোলাও। কুইক্।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও ম্যানেজার সাহেব অন্দর মহলে গেলেন। খানিকপর জমিদার মোজাফফর আহমদ খান বাহাদুর সাহেব দহলিজে এলেন এবং এদের দেখে বিস্মিত হলেন। বললেন– সে কি! আপনারা হঠাৎ?

এবার কথা বললো ষষ্ঠীতলার জমিদার শ্রীযুক্ত দীদার আলী শাহ। সে বললো– কেন তা বুঝতে পারছেন না? জেগে ঘুমাচ্ছেন?

জমিদার খান বাহাদুর সাহেব বললেন– তার অর্থ?

দীদার আলী শাহ বললো– অর্থটা হলো আপনার পরম বাঞ্ছিত জামাই অর্থাৎ আমার ছেলে শাহজাদা বাহাদুর আলী শাহ এখন হাসপাতালে– তা জানেন?

আপনার ছেলে হাসপাতালে? কেন?

আপনার গুণবতী মেয়ের গুণে। সে তার চাকর দিয়ে আপনার জামাইকে মেরে হাড়হাড্ডি ভেঙ্গে দিয়েছে। তার জীবন মরণ অবস্থা।

কার জীবন মরণ অবস্থা?

আপনার জামাইয়ের?

আমার জামাইয়ের মানে?

মানে আমার ছেলের। তার জীবন এখন যাই যাই অবস্থা।

কথা ধরে গরু গাভীন ঠাকুর বললো– উহার একদম পাত্‌লা পায়খানা বাহির করিয়া দিয়াছে।

বলেন কি! জব্বোর কাজ করেছে তো!

দীদার আলী শাহ বললো– এটা কি কোন তারিফের কথা হলো? আপনার জামাইয়ের অবস্থা কাহিল করে দিলো আর আপনি বলছেন...

বাধা দিয়ে খান বাহাদুর সাহেব বললেন– আরে রাখেন রাখেন। এসে অবধি শুধু 'আপনার জামাই- আপনার জামাই' করছেন। আপনার ছেলে আমার জামাই হলো কি করে?

পুরোপুরি না হলেও হবু জামাই তো জরুর।

হবু জামাই! সেটাই বা হলো কি করে?

কি করে আবার। আপনিই তো আমার ছেলের সাথে আপনার মেয়ের বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন।

আমি বিয়ে দিতে চেয়েছিলাম?

চেয়েছিলেনই তো। ওদের ছোটকালে আমি বলেছিলাম, 'বড় হলে এদের

বইঘর.কম

দু'জনের বিয়ে হোক, এটা আমি চাই।' আপনি তাতে রাজি হয়েছিলেন।

আমি তাতে রাজি হয়েছিলাম? আপনার কথা এড়িয়ে যাওয়ার জন্যেই আমি বলেছিলাম– 'সে দেখা যাবে।' এটা কি রাজি হওয়া হলো?

হ্যাঁ, এইটাই রাজি হওয়া হলো। বিয়ে দেবেন না সে কথা তো আপনি বলেননি।

: তাতে কি হয়েছে?

তাতেই তো হয়েছে সব। সেই সুবাদেই আপনার জমিদারিটা কেড়ে নেয়া হয়নি। বিয়ে হলে আপনার জমিদারী আমার ছেলে শাহজাদা বাহাদুর আলীরই হবে, এই বিবেচনায় আপনার জমিদারিটা আজও অটুট আছে। নইলে কবে ওটার নাম চিহ্ন মুছে যেতো।

: বটে!

আজও যদি বিয়ে দিতে অস্বীকার করেন, তাহলে আজই ওটা হাওয়া হয়ে যাবে।

: হাওয়া হয়ে যাবে? কে করবে হাওয়া?

গরু গাভীনের প্রতি ইঙ্গিত করে দীদার আলী বললো– এই হুজুর করবে। এমনি কি হুজুরকে আজ সাথে নিয়ে এসেছি।

ও, আমার জমিদারিটা হাওয়া করে দেয়ার জন্যেই ওকে সাথে করে এনেছেন?

অবশ্যই। পেছনে শক্ত লাঠি না থাকলে আজকাল কি কেউ কাউকে ভয় করে?

এবার খান বাহাদুর সাহেব গরু গাভীন ঠাকুরকে লক্ষ করে বললেন– এই জন্যেই কি গরু গাভীন বাবু আজ এর সাথে এসেছেন?

গরু গাভীন বললো– আসতে হবেই। যে আমার ইংরেজ হুজুরদের এতটা অনুগত, তার পক্ষ তো নিতেই হবে আমাকে।

: তাই বলে অন্যায় করে পক্ষ নেবেন আপনি?

নেবো না! আপনিও আমার মহানুভব ইংরেজ হুজুরদের পক্ষে আসুন, তাঁদের তাবেদারী শুরু করুন, তাহলে আর আপনার বিপক্ষে যাবো না।

ও কাজটা তো আপনার। তাবেদারী করা, পায়ে তেল দেয়া– এসব কাজ তো আপনার কাজ। আমি ওগুলো শুরু করলে আপনি করবেন কি?

বইঘর.কম

তা যা করি করবো। আপনি ওগুলো শুরু করুন, আপনার জমিদারি হাওয়া হয়ে যাবে না।

আমি আপনার মতো বেহায়া নই যে, অন্যের পায়ে তেল দিয়ে বেড়াবো বা কারো তাবেদারী করবো।

তাহলে আপনার জমিদারী থাকবে না।

চেষ্টা করে দেখবো, থাকে কি না। না থাকলে যাবে। কারো পায়ে তেল দিয়ে বা পা চেটে জমিদারি রাখবো না।

গঠীতলার জমিদার দীদার আলী উতলা হয়ে উঠে বললো– সেকি সেকি! জমিদারি না রাখলে আমার ছেলে জমিদারি পাবে কি করে? জমিদারিটার লোভেই তো আমার ছেলে বিয়ে করবে আপনার মেয়েকে।

খান বাহাদুর সাহেব সক্রোধে বললেন– ডাণ্ডা মেরে তাড়াবো। বিয়ে দেয়া তো দূরের কথা, নেড়ী কুত্তার মতো মুগুর মেরে তাড়াবো। ঐ খাটাশ মার্কা ছেলের সাথে বিয়ে দেবো আমার মেয়ের?

অর্থাৎ?

অর্থাৎ আমার ত্রিসীমানা থেকে তাকে মুগুর মেরে তাড়াবো। আমার মেয়ের বা পায়ের কনিষ্ঠাঙ্গুলির যোগ্যতাও যার নেই, তার সাথে দেবো মেয়ের বিয়ে?

দীদার আলী শাহ ক্ষিপ্তকণ্ঠে বললো– তার মানে? আপনি কী বলতে চাচ্ছেন?

বলতে চাচ্ছি, আপনারা এবার পথ দেখুন। মানে মানে বিদায় হোন।

বিদায় না হলে?

পাইক পেয়াদা ডাকবো না। আমার মেয়ের চাকর ঐ নূরু মিয়াকে ডাকলেই সে ডাণ্ডা মেরে আপনাদের বিদায় করে দেবে।

মেয়ের চাকর?

জি হ্যাঁ। যেভাবে আপনার পুত্র বাদুর মিয়াকে ডাণ্ডা হাঁকিয়েছিল, ঐভাবে ডাণ্ডা হাঁকাবে।

গরু গাভীন্ ঠাকুর চমকে উঠে বললো– ও মাই গড! তাহলে তো ওর মতো আমাদেরও কাপড় চোপড় নষ্ট হয়ে যাবে! পালাও পালাও, শিগগির পালাও... বলেই গরু গাভীন ঠাকুর দহলিজ থেকে বেরিয়ে পড়িমরি রাস্তার দিকে দৌড় দিল। তা দেখে অন্যরাও আঁত্‌কে উঠে তার পেছনে ছুটলো।

আপদ বিদেয় হলে জমিদার খান বাহাদুর সাহেব তাঁর ম্যানেজার কোরবান

বইঘর.কম ও রোকন
আলী মিয়াকে বললেন– শবনম আর তার চাকরটাকে ডাকো তো! ঘটনাটা শুনি।
www.boighar.com

ম্যানেজার সাহেব গিয়ে তাদের ডেকে আনলেন। শবনম সাদিকা ও নূরু মিয়া এসে জমিদার খান বাহাদুরের সামনে সালাম দিয়ে দাঁড়ালো। সালামের জবাব দিয়ে খান বাহাদুর সাহেব নূরু মিয়াকে প্রশ্ন করলেন– তুমি নাকি ষষ্ঠীতলার জমিদার দীদার আলীর ছেলে বাহাদুর আলীকে মেরে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছো?

নূরু মিয়া তাজিমের সাথে বললো– হাসপাতালে গিয়েছে কি না জানিনে হুজুর। তবে তারই রোলারের দু'তিনটি বাড়ি মারতেই সে সেখানে শুয়ে পড়েছিল।

খান বাহাদুর সাহেব বললেন– সেরেফ শুয়ে পড়েছিল? অজ্ঞান হয়ে যায়নি?

নূরু মিয়া বললো– তা কিছুটা যেতেই পারে হুজুর! কাপড়-চোপড় যখন নষ্ট করে ফেলেছিল...

তা তুমি তাকে অতটা মারতে গেলে কেন?

বেশি মারিনি হুজুর! সেরেফ দুই তিনটে বাড়ি মারতেই...

তাই বা মারতে গেলে কেন?

কি করবো হুজুর, ম্যাডাম সম্বন্ধে ও নানা রকম খারাপ কথা বলতে লাগলে আর সহ্য করতে পারিনি!

: কি বলে?

বলে, ম্যাডাম নাকি ওর হবু বউ। আরো বলে, হবু বউ হয়ে চাকরকে নিয়ে ফুর্তি করে বেড়াচ্ছে বেয়াদব মেয়েটা! বিয়ের পর ওর হাড়হাড্ডি আমি ভেঙ্গে দেবো। মানে, ম্যাডামের হাড়-হাড্ডি ও ভেঙ্গে দেবে।

: আচ্ছা!

এরপর ওর সমস্ত রাগ এসে পড়লো আমার উপর। আমাকে সে অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজ করতে করতে বললো– গাড়ি থেকে নেমে আয় হারামজাদা! এক কথায় না এলে তোকে ঘাড় ধরে নামিয়ে আনবো। কান ধরে নামিয়ে আনবো গাড়িতে চড়ে।

: তারপর?

তারপর সে চাবুক হাতে গাড়ির দিকে এগুতে লাগলো দেখে বাধ্য হয়ে আমাকে নামতে হলো হুজুর! গাড়িতে ম্যাডাম আছেন। বেয়াদবটা গাড়িতে

বইঘর.কম ও রোকন
চড়ে ম্যাডামের সাথেও যদি খারাপ ব্যবহার করে– এই চিন্তা করে আমি খালি হাতেই তড়িঘড়ি নেমে এলাম গাড়ি থেকে।

নেমে এলে?

জি হুজুর!

তারপর?

নেমে আসার সাথে সাথে সে সপাং সপাং করে আমার পিঠে চাবুক মারতে লাগলো। অসহ্য হওয়ায় আমি তার হাত থেকে চাবুকটা একটানে কেড়ে নিয়ে দূরে ফেলে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠলো বাহাদুর মিয়া। গাড়ি থেকে তখনই একটা কাঠের রোলার নামিয়ে এনে আমার পিঠে দমাদম তা মারতে লাগলো। আর বরদাশ্‌ত করতে পারলাম না হুজুর। ঐ রোলারটা কেড়ে নিয়ে ওর পিঠে গোটা তিনেক বাড়ি মারতেই ও কঁকিয়ে উঠে পড়ে গেল আর কাপড়-চোপড় নষ্ট করে ফেললো।

পার্শ্বে দণ্ডায়মান কোরবান আলী মিয়া এ কথায় হাসি চাপতে না পেরে খানিকটা শব্দ করেই হেসে ফেললেন। তা দেখে খান বাহাদুর সাহেব বললেন– তুমি হাসছো ম্যানেজার! এর পরবর্তী পরিস্থিতিটা চিন্তা করে দেখছো না?

ম্যানেজার সাহেব বললেন– পরবর্তী পরিস্থিতি মানে?

মানে, মেয়েটা তো এখন স্বাভাবিকভাবে আর নিরাপদে চলাফেরা করতে পারবে না। ঐ বেয়াদব বাদুর আলী তো পথেঘাটে ওকে উত্যক্ত করে বেড়াবে।

জি না হুজুর! আম্মাজানের সাথে নূরু মিয়াকে দেখলে ঐ নাদানটা ওদের ধারে কাছে ঘেঁষার সাহস করবে না।

তাই কি?

জি হুজুর। যে শিক্ষা পেয়েছে এর পরে আর ঐ সাহস করবে না।

খান বাহাদুর সাহেব নূরু মিয়াকে প্রশ্ন করলেন– কি হে, তুমি কি বলো?

মাথা নীচু করে নূরু মিয়া স্মিতহাস্যে বললো– জি হুজুর! একা তো নয়ই, আরো লোক সঙ্গে না পেলে সে আমাদের দিকে এগুনোর সাহস করবে না।

আরো লোক সঙ্গে যদি পায়?

তাতেও পরোয়া নেই হুজুর! এক সাথে পনের-বিশজন এলেও আমার লাঠির মুখে সবগুলো খড়কুটোর মতো উড়ে যাবে।

তোমার লাঠির মুখে? তুমি একাই?

এবার ম্যানেজার সাহেব কথা ধরে বললেন– সন্দেহের কোন অবকাশ নেই হুজুর! জানতে পেরেছি এই নূরু মিয়া এককালে এক ডাক-সাইটে লাঠিয়াল ছিল। শ' লোককে সে একাই ঠেকিয়ে দিয়েছে।

: বলো কি ম্যানেজার!

এ নিয়ে চিন্তা করবেন না হুজুর! বদমায়েশরা আম্মাজানের আর নূরুমিয়ার কোন বিপত্তি ঘটাতে পারবে না। এদিকটা না ভেবে বরং অন্য দিকটা নিয়ে ভাবুন।

অন্য দিক!

পা চাটা ঐ ষষ্ঠীতলার জমিদারটা গুরু গোবিন্দ আর ইংরেজদের পা চেটে আপনার জমিদারি নিয়ে কোন সমস্যা সৃষ্টি করে কি না, সেদিকটা দেখুন।

: হ্যাঁ, সেটা তো দেখতেই হবে। বেহুদাটা চেষ্টার কম কিছু তো করবে না।

হুজুর!

ঘাবড়ানোর বেশি কারণ নেই ম্যানেজার! হক পথে থাকতে আল্লাহ নারাজ হবেন না। তা ছাড়া আমার জমিদারিটা অনেক সেফ্, মানে নিরাপদ জোনে আছে। দেশ বিভাগের যে জোর ঝড় তুলেছে মুসলিম লীগ তাতে দেশ ভাগ হলে আমার জমিদারিটা আল্লাহর রহমে পূর্ব-পাকিস্তানেই পড়বে। ওরা পড়বে হিন্দুস্থানে। তখন আর ওদের কোন জারিজুরি খাটবে না। ইংরেজরাও চলে যাবে। ওদের তামাম তাফালিং খতম।

কয়েকদিন পর জমিদার খান বাহাদুর মোজাফফর আহমদ সাহেবের দহলিজের গেটে হঠাৎ আবার হইচই শুরু হলো। হইচই শুরু করলো একদল জেলে। খবর পেয়ে বেরিয়ে এলেন খান বাহাদুর সাহেব। তাঁকে দেখেই সকলে এক সাথে কথা বলতে গেল। তাতে কিছুই স্পষ্ট না হওয়ায় খান বাহাদুর সাহেব বললেন– এভাবে সবাই কথা বললে তো হবে না। তোমাদের পক্ষে যে কোন একজন কথা বলো।

এবার একজন বেশি বয়সী জেলে অন্যদের থামিয়ে দিয়ে বললো– আমি বলছি হুজুর, আমি বলছি।

খান বাহাদুর সাহেব বললেন– তুমি? তোমার নাম?

ঐ বেশি বয়সী জেলেটি বললো– আমার নাম বংশীপদ হালদার কর্তা। আমি এদের প্রধান।

প্রধান? বেশ, বলো।

আমাদের মাছ ধরা বন্ধ হয়ে গেছে হুজুর।

মাছ ধরা! কোথায়?

আপনার পত্তন দেয়া জলাধারে।

তার মানে? পুঠিমারী বিলে?

আজ্ঞে হুজুর, আজ্ঞে- আজ্ঞে!

কেন, মাছ ধরা বন্ধ হলো কেন?

জমিদার দীদার আলী শাহ'র পক্ষের এক লোক এসে আমাদের বিলে নামতে নিষেধ করছে। বলছে, জমিদার দীদার আলী হুজুরের হুকুমে সে এসেছে। এ বিলের মাছ এবার তার জেলেরা ধরবে। দীদার আলী হুজুরের হুকুম অগ্রাহ্য করলে আমাদের সবাইকে নাকি হাজতে ঢোকাবে।

তার জেলেরা ধরবে মানে? আমার জমিদারির অন্তর্ভুক্ত বিল। দীদার আলীর জমিদারির অন্তর্ভুক্ত নয়। দীদার আলী হুকুম দেয়ার কে?

তবু ঐ জমিদারেরই দোহাই দিচ্ছে হুজুর।

সে দোহাই তোমরা শুনবে কেন? ঐ বিল তিন বছরের জন্যে আমি তোমাদের পত্তন দিয়েছি। লিখিত কাগজপত্র আছে। তোমাদের কাছেও আছে, আমার কাছেও আছে। সে লোক কোন লিখিত কাগজপত্র এনেছে কি?

আজ্ঞে না হুজুর! বলছে, কাগজপত্র লাগবে কেন? জমিদার দীদার আলী শাহ'র মুখের কথাই যথেষ্ট। তার মুখের হুকুমেই রাজা-বাদশাহ ফিরে।

বটে!

সে মাছ ধরার অপেক্ষায় বসে আছে হুজুর। বলছে, জেলে আর জাল-দড়ি এখনো এসে পৌঁছেনি। এলেই তারা মাছ ধরা শুরু করবে।

অসম্ভব! এটা হতে পারে না।

হুকুম দেন কত্তা। সংখ্যায় আমরা অনেক লোক আছি। সেই সাথে হুজুরের তরফ থেকে দুই একজন লোক পেলে আর কথাই নেই।

বুঝতে না পেরে খান বাহাদুর সাহেব বললেন– আমার তরফ থেকে লোক!

বেশি দরকার নেই হুজুর। শুধু আপনার মেয়ের কাজ করা লোকটা, মানে ঐ নূরু মিয়া মৌলভীটাকে যদি সাথে পাই তাহলে দীদার শাহ'র পাঠানো জেলেদের আমরা বিলের ধারেই পুঁতে ফেলতে পারবো।

পুঁতে ফেলতে পারবে?

আজ্ঞে হ্যাঁ কত্তা। ঐ নওজোয়ান মৌলভীটাকে না পেলেও আমরাই ওদের দুই চারজনকে যমের বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে পারবো। আপনি শুধু হুকুমটা দিন।

চঞ্চল হয়ে উঠে জমিদার খান বাহাদুর সাহেব বললেন– ওরে না- না, কোন খুন খারাবির মধ্যে যাওয়া যাবে না। কেউ খুন হলে সঙ্গে সঙ্গে খবরটা ইংরেজদের কাছে যাবে আর হিতে হবে বিপরীত। ইংরেজরা এ ব্যাপারে খুবই তৎপর। তখনই ইংরেজদের ফৌজ এসে তোমাদের তো ধরে নিয়ে যাবেই, আমার জমিদারিটা নিয়েও টানাটানি শুরু হবে।

হুজুর!

আর না হোক, ঐ পুঠিমারি বিলটা দীদার শাহ'র জেলেদেরকে চিরদিনের মতো বন্দোবস্ত দিয়ে দেবে। ঐ বিলে আর আমরা কেউ যেতে পারবো না।

তাহলে কি আমাদের কিছুই করার নেই হুজুর! ওরা জোর করেই বিলটা দখল করে নেবে?

একটু চিন্তা করে খান বাহাদুর সাহেব বললো– ঠিক আছে। আমি আজই কোর্টে যাবো আর ওদের বিরুদ্ধে জবরদখলের মামলা করে কোর্ট থেকে ইনজাংশান বের করে আনবো। দেখি ওরা মাছ ধরে কেমন করে!

বংশী হালদার ইতস্তত করে বললো– ওরা কি কোর্টের ইন্‌জাংশান, মানে ঐ স্থগিতাদেশ মানবে হুজুর?

মানবে না মানে? খোদ ইংরেজদের কোর্ট। ইংরেজ বিচারক। তার আদেশ অমান্য করার সাধ্য আছে ওদের?

কিন্তু ওরা যদি ঐ বিচারককে হাত করে ফেলে হুজুর! ওরা তো ইংরেজদের পক্ষেরই লোক!

: হাত করে ফেলবে?

অসম্ভব কি হুজুর! ঐ গুরু না গরু গাভীন ঠাকুর ইংরেজদের দালাল। ইংরেজদের পা-চাটা লোক। ওদিকে আবার দীদার আলী শাহও ইংরেজদের পায়ে তেল দেয়া মানুষ। গরু গাভীন্ গিয়ে যদি ঐ ইংরেজ বিচারককে তাদের পক্ষে নিয়ে নেয়? মানে, ইংরেজদের লোকদের পক্ষে নিয়ে নেয়?

আবার একটু চিন্তা করে খান বাহাদুর সাহেব বললেন– না, তা হয়তো পারবে না। কোন রাজনৈতিক কারণ না হলে, মানে এদেশ থেকে ইংরেজদের

উচ্ছেদ করার কারণ না হলে ইংরেজ বিচারকরা এসব স্থানীয় ব্যাপারে ন্যায় বিচারই করবে। ইংরেজ পক্ষের লোক হলেও কোন অন্যায় আদেশ দেবে না।

যদি প্রচুর টাকা ঢালে?

কোন ইংরেজ বিচারক ঘুষ নেবে না। ঐ যে বললাম, রাজনৈতিক কারণ ছাড়া দেশ শাসনের কোন ব্যাপারে ঘুষ ওরা খায় না। ওদের এ গুণটা আছে।

গুণ ওদের যাই থাক, কোর্টে গিয়ে তৎক্ষণাৎ কোন কাজ হলো না। রবিবারসহ ইংরেজদের কি এক পরব উপলক্ষে কোর্ট বন্ধ রইলো তিনদিন। আর এরই মধ্যে হয়ে গেল অন্যায়টা। খান বাহাদুর আর তাঁর পক্ষের জেলেরা যখন কোর্টে ঘুরছেন ঠিক সেই সময় জাল নিয়ে বিলে এসে হাজির হলো দীদার শাহ'র পক্ষের জেলেরা এবং দীদার শাহ ও গরু গাভীন্ ঠাকুরের হুকুমে তখনই সেই জেলেরা হইচই করে জাল নিয়ে নেমে পড়লো পুঠিমারী বিলে। এক টানা দুই দিন ধরে জাল টেনে বিলের তামাম বড় মাছ তুলে ফেললো তারা।

কিন্তু জেলেদের নসীবে জুটলো অষ্টরম্ভা। মাছ তোলার সাথে সাথে গরু গাভীন আর দীদার শাহ'র দলে দলে লোক এলো ভাঁড় নিয়ে। অতঃপর তারা বড় মাছগুলো সবই ভাঁড়কে ভাঁড় নিয়ে গেল গরু গাভীন্ আর দীদার আলীর পেয়ারের লোকদের উপঢৌকন দেয়ার জন্যে। বড় মাছ একটাও রইলো না। বিশ পঁচিশজন জেলে খেয়ে না খেয়ে দুই দিন ধরে জাল টেনে একটা পয়সাও পেলো না। পরে কয়েক ঢালি চাঁদা-পুঁটি যা পেলো, তা দিয়ে তাদের নাশতার পয়সাটাও হলো না। অপর দিকে তাদের ঘাড়ে রয়ে গেল শুধুই দেনা। অর্থাৎ নৌকা ভাড়া, জাল মেরামত খরচ, বাঁশের দাম ও মজুরের পাওনা। তাদের পেয়ারের গাভীন্ ঠাকুর আর দীদার শাহ'র হুকুমে এসে লাভের বদলে তারা বিপুল অংকের লোকসানে পড়ে গেল।

এখানেই শেষ নয়। আরো অনেক দূর গড়িয়ে গেল ঘটনা। দীদার শাহ'র জেলেরা সব মাছ মেরে নিয়েছে জানতে পেরে জবরদখল ও লুটতরাজের মামলা করলেন কোর্টে। সাক্ষ্য প্রমাণে ও তদন্ত অন্তে ঘটনা সম্পূর্ণ সত্য হওয়ায় ইংরেজ বিচারক সঙ্গে সঙ্গে দীদার শাহ'র জেলেদের প্রত্যেককে দুই বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়ে জেলে পুরে দিলেন। অন্যায়ের পক্ষ নেয়া আর

অন্যায় হুকুম তামিল করার উচিত শিক্ষা পেলো তারা।

এদের সাথে হুকুম দেয়ার অপরাধে ক্ষতিপুরণ বাবদ গরু গাভীন্ ঠাকুরকে আর দীদার আলী শাহকে গুনতে হলো মোটা অংকের অর্থ।

আজ মাদরাসা বন্ধ। বাইরে যাওয়া নেই। নূরু মিয়া খামার বাড়ির বারান্দায় চৌকির উপর আরামে গড়াগড়ি দিচ্ছে। এই সময় সেখানে এসে হাজির হলো শবনম সাদিকা। নূরু মিয়াকে লক্ষ করে বললো– মাদরাসা বন্ধ বলে আমিও বন্দি নাকি? আমার কি অন্য কোথাও যাওয়া নেই?

ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে নূরু মিয়া বললো– আছে নাকি ম্যাডাম?

শবনম সাদিকা বললো– আছে তো বটেই। ড্রাইভার মমতাজ শেখকে নিয়েও যেতে পারি। কিন্তু তোমাকে রেখে সেরেফ ঐ ড্রাইভারের উপর ভরসা করে কোথাও যাওয়ার ভরসা তো পাইনে।

ম্যাডাম!

জমিদার দীদার শাহ'র পুত্র বাদুর শাহকে ঐ নাস্তানাবুদ করার পর থেকে এলাকার তামাম বদমায়েশ খামুশ। শয়তানেরা এতই ভয় পেয়েছে যে, তোমাকে গাড়িতে দেখলেই রাস্তা ছেড়ে পড়িমরি দৌড়ে পালায়। সেবার তো দেখলেই, তুমি গাড়িতে নাই ভেবে দীদার শাহ'র কয়েকজন পোষা-গুণ্ডা গাড়ির দিকে এগিয়ে এসে তোমাকে দেখামাত্রই 'ওরে বাপরে' বলে আওয়াজ দিয়ে কেমন ঊর্ধ্বশ্বাসে পালালো।

নূরু মিয়া হেসে বললো– ভয়টা ওদের মনের মধ্যে গেঁথে গেছে। আর ওরা ম্যাডামের গাড়ির দিকে আসবে না।

শবনম বললো– কিন্তু কোনভাবে ওরা যদি জানতে পারে তুমি গাড়িতে নেই, তাহলে তো আসতে পারে!

: ভয়টা ম্যাডামের দিলের মধ্যেও গেঁথে গেছে।

: মানে?

মানে অধিক ভয় পাওয়ার কি আছে? আমি না থাকি ড্রাইভার মমতাজ মিয়া থাকলেও অধিক ঝামেলা হওয়ার কথা নয়। একেবারেই একা একা চালাতে গেলে অবশ্য ঝামেলাটা হতেই পারে।

সেই কথাই তো বলছি। আজ আমি খুবই এক দূর এলাকায় যাবো। তুমি

তৈরি হয়ে নাও।

ঠিক আছে ম্যাডাম। ড্রাইভারকে গাড়ি বের করতে বলুন।

না, ড্রাইভার যাবে না। তুমি সাথে গেলে আবার ড্রাইভার কেন? আমিই তো গাড়ি চালাতে পারি।

ও, ড্রাইভার যাবে না?

না। অনেক সময়ের ব্যাপার! সকালে বেরিয়ে ফিরতে ফিরতে বিকেল। ড্রাইভারের এত সময় দেয়ার উপায় নেই। কখন আবার আব্বাজানের তাকে জরুরি দরকার পড়ে, তার ঠিক কি?

ও, আচ্ছা। তা কোথায় যাবেন ম্যাডাম?

বললামই তো, খুবই বেশি দূরে। প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে এক মফস্বল এলাকায়। আমার কলেজের এক বান্ধবীর আব্বার বাড়ি ওখানে। ওখানে শাদি হচ্ছে আমার সেই বান্ধবীর। ঘনিষ্ঠ ক্লাসফ্রেন্ড বলতে যা বুঝায়। এই বান্ধবীটি আমার তাই। আজ প্রায় পনের দিন ধরেই সেই শাদির অনুষ্ঠানে হাজির হওয়ার জন্যে সে সাধাসাধি করছে আমাকে। গাঁয়ের গরীব মানুষ। না গেলে সে খুবই দুঃখ পাবে। ভাববে, আমি জমিদারের মেয়ে বলে অহংকার করে গেলাম না।

তা ঠিক- তা ঠিক।

কাজেই তৈরি হয়ে বেরিয়ে এসো। আমিও তৈরি হয়ে গাড়ির কাছে আসি। সকাল সকাল বেরুতে হবে।

www.boighar.com

নূরু মিয়াকে সাথে নিয়ে শবনম সাদিকা সকালের দিকেই ছেড়ে দিলো গাড়ি। বিয়ের অনুষ্ঠানে এসেও তারা হাজির হলো বেশ প্রথম দিকেই। কিন্তু বিদায় নিতে আর সকাল সকাল পারলো না। বিয়ের এবং উপঢৌকন দেয়ার পর কনের আত্মীয়-স্বজনদের লৌকিকতার চাপ এড়াতে এড়াতে বেলা একদম পরে গেল। বাড়ি ছেড়ে থাকার উপায় ছিল না। খান বাহাদুর তা আদৌ পছন্দ করেন না। তাই, খান বাহাদুরের গোস্বার ভয়ে শবনম সাদিকাকে সাঁঝ সামনে নিয়েই গাড়ি ছাড়তে হলো। বিপদ-আপদের জন্যে ছোট্ট একটা টর্চ লাইট সে চেয়ে নিলো।

অনেকখানি রাস্তা ভালোই কেটে গেল। কিন্তু সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে হঠাৎ করেই আকাশ ছেয়ে গেল মেঘে আর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো ঝড়বৃষ্টি।

বিপদ যখন আসে তখন এক সাথেই আসে। নিধুয়া এক প্রান্তরে এসে এই

সময় বন্ধ হয়ে গেল গাড়ি। খারাপ হয়ে যাওয়ায় আর স্টার্ট নিলো না ইঞ্জিন। অনেক চেষ্টা করার পর বাধ্য হয়ে টর্চ লাইট হাতে নিয়ে শবনম সাদিকা গাড়ি থেকে নেমে এলো ইঞ্জিন ঠিক করতে। কিন্তু ঢাকনা তুলে প্রায় আধা ঘণ্টা যাবত টিপাটিপি করেও বিকল ইঞ্জিনটাকে কোনভাবেই আর সচল করতে পারলো না।

চোখে পানি এলো শবনম সাদিকার। জনমানবহীন নিধুয়া বসতি, বিশেষ করে গাড়ি মেরামত করার ওয়ার্কশপ একেবারেই নাগালের মধ্যে না থাকায় শেষ অবধি শব্দ করেই কেঁদে ফেললো শবনম সাদিকা। ঝড়বৃষ্টি থামারও কোন আলামত না দেখে সে আহাজারি জুড়ে দিলো।

এবার উঠে দাঁড়ালো নূরু মিয়া। শবনম সাদিকাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো– আপনি থামুন তো ম্যাডাম। এত ঘাবড়াচ্ছেন কেন? আমি একটু দেখি।

টর্চ লাইটটা নিয়ে নূরু মিয়া ইঞ্জিনে হাত দিলো। এরপর একদম ম্যাজিক। মিনিট পাঁচেক পরেই সে ইঞ্জিনের ঢাকনা নামিয়ে দিয়ে এসে বললো– যান ম্যাডাম, এবার স্টার্ট দিয়ে দেখুন।

শবনম সাদিকা অসহায়কণ্ঠে বললো– স্টার্ট দিবো? স্টার্ট দিয়ে কি হবে?

: হবে আবার কি? গাড়ি স্টার্ট নেবে।

স্টার্ট নেবে?

হ্যাঁ, নেবে আর গাড়ি স্বাভাবিকভাবে চলবে।

মানে?

মানে, ইঞ্জিনের কোন জায়গায় ব্যারাম সেটা বুঝতে না পেরে খামোখা আপনি ইঞ্জিন টেপাটেপি করে হয়রান হলেন। এক জায়গায় কানেকশান খুলে গেছে, সেটা ধরতেই পারেননি।

: কানেকশান খুলে গেছে?

: জি, সেটা লাগিয়ে দিয়ে এলাম। এবার স্টার্ট দিন।

সেকি! সেকি! – বলতে বলতে শবনম সাদিকা গাড়িতে উঠে বসলো এবং স্টার্ট দিতেই গাড়ি গঁ গঁ করে ডেকে উঠলো। চালাতে শুরু করলে গাড়ি সুবোধ বালকের মতো পিল পিল করে চলতে লাগলো। নীচে দাঁড়িয়ে থাকা নূরু মিয়া সহাস্যে বললো– আরে সেকি- সেকি! এই নিধুয়া পাথারে আমাকে ফেলে রেখেই চললেন নাকি ম্যাডাম!

গাড়ি পিছাতে পিছাতে শবনম সাদিকা অপরিসীম বিস্ময়ে বলতে লাগলো–

তাজ্জব- কি তাজ্জব! কি অবিশ্বাস্য ব্যাপার! তুমি এত বড় একজন ইঞ্জিনিয়ার নূরু মিয়া? এত বড় একজন কারিগর, এ কথা তো আগে বলোনি?

গাড়ি থামিয়ে দিলো শবনম সাদিকা। গাড়িতে উঠতে উঠতে নূরু মিয়া বললো– কি বলবো ম্যাডাম! এটা তো বলার মতো কোন বড় কথা নয়।

কণ্ঠে জোর দিয়ে শবনম সাদিকা বললো– বড় কথা নয় মানে! আমি গাড়ি চালাই আর ইঞ্জিনের ব্যাপারটা অনেকটাই বুঝি। সেই আমি আধাঘণ্টা ধরে চেষ্টা করে কিছুই পারলাম না। আর তুমি, যে তুমি গাড়ি চালাতেই জানো না, সেই তুমি পাঁচ মিনিটেই সব ঠিকঠাক করে দিলে! এটা সম্ভব হলো কি করে? অত্যন্ত অভিজ্ঞ মেকার ছাড়া এটা তো সম্ভব নয়?

নূরু মিয়া বললো– তা ঠিকই বলেছেন ম্যাডাম। অত্যন্ত অভিজ্ঞ নই, তবে গাড়ি মেরামতের আমি কিছু কিছু জানি।

কি করে জানলে?

ঐ কাজ করে। আপনাকে একদিন বলিনি ম্যাডাম, পেটের দায়ে আমি ওয়ার্কশপেও কিছুদিন কাজ করেছি। একজন অভিজ্ঞ মেকারের যোগানদার ছিলাম। বলিনি এ কথা?

হ্যাঁ- হ্যাঁ, বলেছিলে।

ঐ ফাঁকে মেকারের কাজটাও কিছু কিছু শিখে ফেলেছিলাম।

তাই নাকি? বড়ই করিৎকর্মা লোক তো তুমি।

ম্যাডাম!

ওটা তুমি শিখে ফেলেছিলে বলেই আজ এই মহামুসিবত থেকে উদ্ধার পেলাম আমরা। দেবো, একটা বড় রকমের ইনাম তোমাকে অবশ্যই আজ দেবো। চলো, আগে বাড়ি যাই।

ইনাম দিতে হবে না ম্যাডাম। শুধু সুজনরটা পেলেই আমি ধন্য হবো।

সুজনর!

জি-জি! সুনজর মানে একটু সহানুভূতি, মানে একটু দরদ। আর কিছু চাইনে!

আর কিছু চাও না? শুধু একটু দরদ।

জি ম্যাডাম! আপনাকে তো বলেছিই, ঐ বস্তুটির আমি বড়ই কাঙাল।

নূরু মিয়া!

বইঘর.কম ও রোকন
একজনের ঐ দরদটাই তো খুঁজে বেড়াচ্ছি ম্যাডাম।

একজনের দরদ। কে সে? কার কথা বলছো? ঐ যে একদিন গেয়েছিলে– 'তবু তোমারে তো আজও ভুলি নাই'– তার কথা কি?

হুঁশে এসে নূরু মিয়া প্রসঙ্গ বদল করে তাড়াতাড়ি বললো– জি না-জি না, কেউ নয় ম্যাডাম। এমনি খেয়ালের মাথায় বলে ফেলেছি কথাটা।

: খেয়ালের মাথায়?

জি জি। একা একা থাকি আর আপন খেয়ালে অনেক কথাই বলি। ওসব কথা কি ধরতে আছে?

: বটে!

গাড়ি চালান ম্যাডাম। ঝড় বৃষ্টির মধ্যে এই তেপান্তরে আর দেরী না করে চলুন তাড়াতাড়ি যাই। কখন আবার কোন বিপত্তি ঘটে তার ঠিক কি। ঐ ফালতু আলাপের মধ্যে আর থাকবেন না।

: তা বটে- তা বটে।

গাড়ি স্টার্ট দিলো শবনম সাদিকা।

বান্ধবীর বিয়ে খেয়ে ফেরার পথে শবনম সাদিকা ও নূরু মিয়াদের যে ঝড়বৃষ্টিতে ধরলো তারা বাড়ি ফেরার পরও সে ঝড়বৃষ্টি চলতেই লাগলো সমানে। রাস্তাঘাট, মাঠ-ময়দান এবং বাড়ির উঠান বাহির আঙ্গিনা বৃষ্টির পানিতে সয়লাব হয়ে গেল। চারদিকে পানি আর পানি। সেই সাথে খড়কুটা, গাছ-গাছড়ার পাতা আর ডগায় ছেয়ে গেল চারদিক। এরই মধ্যে শবনম সাদিকারা যখন বাড়িতে এসে পৌঁছলো তখন তারা ঝড়ের কাক! এ অবস্থায় তাদের প্রথম দেখতে পেলো বাড়ির বিশ্বস্ত কাজের মেয়ে পরীর মা।

গাড়িবারান্দায় গাড়ি থেকে নেমে নূরু মিয়া আধভেজা হয়ে তার খামারবাড়ির আস্তানার দিকে ছুটলো আর পরীর মা শবনম সাদিকাকে ধরে অন্দর মহলে নিয়ে গেল। নিজের ঘরে ঢুকে শবনম সাদিকা পোশাক বদল করে এসে বসার সাথে সাথে তাকে চেপে ধরলো পরীর মা। পরীর মায়ের নিতান্ত পীড়াপীড়িতে তাদের বিপদের কথা বর্ণনা করে শোনাতেই হলো শবনম সাদিকাকে। ঝড়বৃষ্টির মধ্যে ফিরতে এত দেরীটা অম্‌নি অম্‌নি হয়নি। নিশ্চয়ই তারা মস্তবড় মুসিবতে পড়ে গিয়েছিল– এ ধারণা পরীর মাকে পেয়ে বসায় তার অস্থিরতার অবধি ছিল না। পরীর মাকে থামাতে শবনম সাদিকাকে বলতেই হলো– ঝড়বৃষ্টির মধ্যে পথে গাড়ি অচল হয়ে যাওয়ার

বইঘর.কম ও রোকন

কথা, নিজের দীর্ঘ সময় চেষ্টা করার পরও গাড়ি সচল করতে না পারায় হতাশায় তার ভেঙ্গে পড়ার কথা এবং শোনাতেই হলো তার হুকুমবরদার নূরু মিয়ার পাঁচ মিনিটেই গাড়ি সচল করে সব বিপদ দূর করার কথা।

একটানা সব ঘটনা বলে গেল শবনম সাদিকা আর দম বন্ধ করে শুনে গেল পরীর মা। শোনার পর পরীর মা ফের বিপুল বিস্ময়ে প্রশ্ন করলো– সে কি! সে কি! আপনি এ কী বলছেন আম্মাজান? আপনি যেটা পারলেন না, আপনার ঐ ফাই-ফরমায়েশ খাটার লোক সেটা পারলো?

শবনম সাদিকা বললো– হ্যাঁ, তাই পারলো। আর পারলো বলেই আমরা ফিরতে পারলাম।।

কি তাজ্জব, কি তাজ্জব! ঐ নূরু মিয়া মৌলভীটা তো বড় উস্তাদ মানুষ?

হ্যাঁ, এত বড়ই উস্তাদ মানুষ। আর সে জন্যে আমিও তো তাজ্জব হয়েছি। তোমার মতোই।

একেই বলে ছাইয়ের মধ্যে আগুন। যে বিপদ কাটিয়ে দিয়েছে সে, এর জন্য তো তার রীতিমত পুরস্কার পাওয়া উচিত।

হ্যাঁ, তাকে একটা বড় রকমের পুরস্কার দেয়ারই ইচ্ছা ছিল আমার। কিন্তু এ কথা বলায় সে ঘোর আপত্তি জানালো।

আপত্তি জানালো মানে? পুরস্কার নিতে চাইলো না?

বিলকুল চাইলো না। সাধাসাধি করার পরও নিতে চাইলো না!

মাগো মা! গালে গাত দিয়ে মুহূর্তখানেক বসে রইলো পরীর মা। তার পরই সে ব্যস্তকণ্ঠে বলে উঠলো– থাকগে ওর কথা। আমি যাই। আপনার ফেরার কথাটা আব্বা হুজুরকে গিয়ে শিগ্‌গির জানাই। আপনি এতক্ষণ ফিরে না আসায় তিনি বড়ই দুশ্চিন্তায় আছেন। –বলেই পরীর মা দ্রুতপদে খান বাহাদুর সাহেবের খাস কামরার দিকে ছুটলো।

একটু পরই খান বাহাদুর সাহেব শবনম সাদিকার ঘরে ছুটে এলেন। এসেই তিনি শবনম সাদিকাকে লক্ষ্য করে বললেন– আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ! তুমি ফিরে এসেছো? সুবহান আল্লাহ! যে ঝড়বৃষ্টি চলছে!

খান বাহাদুর সাহেব বললেন– হ্যাঁ-হ্যাঁ, পরীর মায়ের মুখে সব কথাই শুনলাম। সে তাড়াহুড়া করে সব কথাই বললো। তা একথা কি সত্যি যে, ঐ নূরু মিয়া ইঞ্জিনের একজন মস্তবড় মেকানিক্স?

জি আব্বাজান। এক সময় সে নাকি ওয়ার্কশপে কাজ করেছিল আর তখনই

সে ইঞ্জিন মেরামত করার কাজটা শিখেছিল। গাড়ির অচল ইঞ্জিনটা সে তাজ্জবভাবে চালু করে দিলো।

কি আশ্চর্য– কি আশ্চর্য! একজন তুচ্ছ ভবঘুরে মানুষের মধ্যে এত বড় একটা হিক্‌মত লুকিয়ে আছে!

তাই আছে আব্বাজান। যা স্বচক্ষে দেখলাম, তাতো আর না করার উপায় নেই।

: তা না হয় হলো। সে জন্যে তুমি নাকি তাকে পুরস্কার দিতে চেয়েছিলে আর সে পুরস্কার নিতেও সে অস্বীকার করেছে?

জি আব্বাজান। এই এক জেদি মানুষ। কোন ইনাম পুরস্কার সে কিছুতেই নেবে না।

কি মুস্কিল! তাহলে এক কাজ করো। তার মাইনেটা তুমি বাড়িয়ে দাও। এমন একজন চরিত্রবান আর গুণী লোকের মাইনে কমপক্ষে হাজার টাকা হওয়া উচিত।

সেটাও সম্ভব নয় আব্বাজান। এ যাবত তাকে তো কোন মাইনেই দেয়া হতো না। আমার কাজে নেয়ার পর তার সৎস্বভাব আর সৎ-চরিত্রের জন্যে তাকে মাসে একশত টাকা করে হাত খরচ দেয়া শুরু করি। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। ঐ একশত টাকাকে আর সোয়াশো টাকা করতে পারিনি।

কেন, কেন?

বলে, আমি টাকা কি করবো ম্যাডাম! থাকা-খাওয়ার আশ্রয় পেয়েছি, এই তো যথেষ্ট। এর উপর আপনি আবার মাসে একশো করে টাকা দেন। এটাও না নিলে পারতাম। কিন্তু কিছুটা প্রয়োজন হওয়ায় এটা কবুল করেছি। আর নয় ম্যাডাম। আর দিলে রাখার জায়গা নেই। ও টাকা চুরি হয়ে যাবে।

চুরি হয়ে যাবে। তাহলে ঐ একশো টাকাই বা করে কি? পান-তামাক খায় নাকি?

জি না- জি না। লোকটা একটা সৌখিন লোক। ছিমছাম জামা-পায়জামা পরিধান করে আর ছিমছাম বিছানায় শোয়। গোসলের সময় সাবানও ব্যবহার করে সে। আগে নাকি এ কয়টা টাকা সে পরিশ্রম করে উপায় করেছে।

: বলো কি?

এই সব খরচের জন্যেই সে ঐ একশো টাকা নেয়। সে টাকাই নাকি প্রতি মাসে কিছু কিছু বেঁচে যায়। তাই আর টাকা কিছুই নেবে না।

খান বাহাদুর সাহেব কিছুটা নারাজকণ্ঠে বললেন– ঠিক আছে। যে যেভাবে চলে সুখ পায়, চলুক। ও নিয়ে খামাখা আমরা চিন্তা করি কেন?

কথা শেষ করে নিজ কামরায় চলে গেলেন জমিদার মোজাফফর আহমদ খান বাহাদুর সাহেব।

পরদিন ড্রয়িংরুমে এসে বসতেই সামনে এসে হাজির হলেন তাঁর ম্যানেজার কোরবান আলী মিয়া। তাকে দেখে খান বাহাদুর সাহেব বললেন– কি ব্যাপার ম্যানেজার, কিছু বলবে?

ম্যানেজার সাহেব বললেন– জি হজুর। সেই লোকটা এখানে এসে হাজির হয়েছেন।

সেই লোক, কোন্ লোক?

ঐ যে কুসুম্বির ঐ লোকটা। মানে, রাস্তায় থামিয়ে সেদিন আপনার সাথে আলাপ করলেন যে লোক, সেই লোক।

ও, ঐ যে ইসলামউদ্দীন, না কি যেন নাম?

জি-জি। ইসলামউদ্দীন আকন্দ। মাথায় টুপি আর অল্প দাড়িওয়ালা ঐ মুরুব্বিটা।

আচ্ছা। তুমি কি আগে থেকেই চিনতে ওঁকে।

জি হুজুর, ঘনিষ্ঠভাবে চিনি। আমার খালার বাড়ি ঐ গ্রামে। বেশ পয়সাওয়ালা লোক।

পয়সাওয়ালা লোক?

জি। এক পয়সাওয়ালা আত্মীয়ের একমাত্র ওয়ারিশ হওয়ায়, ঐ পয়সার মালিক হয়েছেন উনি। কিন্তু হুজুর, মফুৎ এত পয়সা পাওয়ার পরও পয়সার লালচটা তাঁর অনেকটাই বেশি। মানে লোভটা।

আচ্ছা।

তিনি হুজুরের সাথে দেখা করতে চান। বলা যায়, ভোরবেলাতেই এসে হাজির হয়েছেন এখানে।

সে কি! কোথায় আছেন এখন?

বাইরে রাস্তার ধারে এক দোকানে বসে আছেন হুজুর। তার ছেলেটাকেও নিয়ে এসেছেন সঙ্গে করে।

বলো কি! ছেলে!

বইঘর.কম ও রেবেকন

: জি-জি। যে ছেলের সাথে সম্পর্ক করতে চান উনি, সেই ছেলে।

: হুঁউ!

খানবাহাদুর সাহেব গম্ভীর হলেন। ম্যানেজার সাহেব বললেন– ডাকবো হুজুর?

: ডাকো। এখানেই নিয়ে এসো।

একটু পরই পুত্রসহ ড্রয়িংরুমে এসে হাজির হলেন ইসলামউদ্দীন আকন্দ। আকন্দ সাহেবের পোশাক আশাক বেশ শালীন। পায়জামা পাঞ্জাবী পরনে। কাঁধে ভাঁজকরা চাদর ঝুলানো। মাথায় টুপি। কিন্তু তার ছেলের পোশাকটা একেবারেই উল্টো। টাইট ফুল প্যান্টের উপর স্পোর্টস্ গেঞ্জি গায়ে আর মাথায় মাংকি ক্যাপ।

এসেই খান বাহাদুরকে সসম্ভ্রমে সালাম দিলেন ইসলামউদ্দীন আকন্দ সাহেব। কিন্তু তার ছেলে সালাম দেয়ার বদলে অন্যদিকে চেয়ে পা দোলাতে লাগলো। ইসলামউদ্দীন ছেলেকে তাকিদ দিয়ে বললেন– আরে-আরে, দেখছো কি? গুরুজন মানুষ। সালাম দাও।

এ কথায় ছেলেটা মাথা সামান্য একটু হেলিয়ে হাত তুলে সালাম দিলো। সালামের জবাব দিয়ে খান বাহাদুর সাহেব প্রশ্ন করলেন– তোমার নাম?

ছেলেটা বললো– মুসলিমউদ্দীন আকন্দ।

খান বাহাদুর সাহেব ফের প্রশ্ন করলেন– কি করা হয়? মানে, এখন কি করো? বসে আছো না সংসারের...

মুসলিমউদ্দীন কিছুটা গর্বের সাথে বললো– জি না। আমি পড়াশুনা করি।

: পড়াশুনা করো?

: জি। বিএ পাশ করে এখন ওকালতি পড়ছি।

এসব ছেলে যে পড়াশোনায় ভাল হয় না তা অনুমান করে খান বাহাদুর সাহেব প্রশ্ন করলেন– বিএটা কি এক চান্সে পাস করেছো?

তা না করলে কি হবে, বিএ পাশ তো করেছি। তার উপর ওকালতি পড়ছি।

ভাল। তা লেবাসটা তো উকিলের মতো নয়। মাথায় আবার ওটা কি? টুপির বদলে ওটা কি পরেছো?

এটাকে বলে মাংকি ক্যাপ। এটাও এক ধরনের টুপি।

এক ধরনের টুপি?

জি জি। অল্পদিন পরই হ্যাট্ পরবো তো। তাই এটা পরে হ্যাট পরার প্র্যাক্টিস্ করছি।

এবার কথা ধরলেন ইসলামউদ্দীন আকন্দ। বললেন– ওকালতি পাশ করার পর মুসলিমউদ্দীন বিলেতে ব্যারিস্টারী পড়তে যাবে। মানে, আমিই পাঠাবো। ওখানে নাকি ওকে হ্যাট্ পড়তে হবে। তাই...

পিতার কথা শেষ না হতেই মুসলিম উদ্দীন বললো– নাকি মানে কি? তখন তো হ্যাট্ পরতে হবেই। ইংরেজ সাহেবদের সাথে ওঠাবসা করতে হবে, ক্লাব-পার্টিতে যেতে হবে, হ্যাট্ না পরে ঐ মিস্কীন মার্কা কাপড়ের টুপি পরলে চলবে? লোকে হাসবে না?

মুসলিমউদ্দীনকে আর কোন প্রশ্ন না করে থেমে গেলেন খান বাহাদুর সাহেব এবং ইংগিতে তাদের বসতে বললেন। পুত্রসহ আসন গ্রহণ করলে খান বাহাদুর সাহেব ইসলামউদ্দীন আকন্দকে সংক্ষেপে প্রশ্ন করলেন– তা হঠাৎ আজ কি মনে করে?

ভক্তিতে গদ গদ হয়ে ইসলামউদ্দীন আকন্দ বললেন– কথা আমার ঐ একটাই খান বাহাদুর সাহেব। আমার বড়ই ইচ্ছে আপনার সাথে আত্মীয়তা করার আপনাকে বলেছি। সে উচ্চ শিক্ষার আশা পোষণ করে, তাও আপনাকে জানিয়েছি। আজ তাই ছেলেকে সাথে করে এনেছি। ছেলেকে আপনি দেখুন। চেহারা তার মাশাআল্লাহ দেখার মতোই। কোন কানাখোঁড়া বা কালো কুৎসিত নয়। এখন যদি আপনার মেয়ের মানে, ঐ শবনম সাদিকার সাথে আমার এই ছেলের শাদি দিতে রাজি হন, আমি তাহলে বড়ই কৃতার্থ হই।

খান বাহাদুর সাহেব গম্ভীরকণ্ঠে বললেন– আমার মেয়ের শাদি? এই ছেলের সাথে?

জি-জি। সেই প্রস্তাব নিয়েই আমি এসেছি।

কিন্তু আপনার ছেলে তো দেখছি একদম খৃষ্টানপন্থী। আমরা ইসলামপন্থী লোক। কাজেই ঐ খেষ্টান মার্কা ছেলের সাথে...

ইসলামউদ্দীন আকন্দ সঙ্গে সঙ্গে বললেন– হয়ে যাবে, হয়ে যাবে। এখন একটু সখ হলেও ও সখ বেশিদিন থাকবে না। ইংরেজরা বাঙ্গালীদের তেমন পাত্তাই দেবে না। ওদের সমাজে স্থান না পেলে ছেলেকে আমার বাধ্য হয়েই

বইঘর.কম ও রেবিকন

মুসলমানদের সমাজে ফিরে আসতে হবে আর ইসলামী শরাশরিয়ত মতোই চলতে হবে। শুধু দুই দিনের অপেক্ষা মাত্র।

খান বাহাদুর সাহেব বললেন– তাহলে সেই অপেক্ষাটারই প্রস্তাব নিয়ে আসুন।

জি না- জি না। ছেলে আমার শুনছে না। ব্যারিস্টারী পড়তে বিলেত যাওয়ার আগেই শাদিটা সেরে ফেলতে চায়।

: কিন্তু আমরা তো তা চাইনে!

: জি?

ছেলে আপনার ওকালতিই পাশ করেনি আর করবে কিনা তাও বলা যায় না।

করবে করবে। আর ক'টা মাস পরেই তার পরীক্ষা। তাই, বন্দোবস্তটা এখনই পাকাপাকি করে ফেলা হোক– এই আমার আরজ।

: বন্দোবস্ত!

জি- জি! আপনি জমিদার মানুষ। আমি সামান্য একজন জোতদার। আমার একার টাকাতে তো ছেলেকে ব্যারিস্টারী পড়ানো সম্ভব নয়। তাই আপনি আপনার জামাইকে কি পরিমাণ অর্থ সাহায্য করতে পারবেন– সে কথাটা পাকাপাকি হয়ে থাকলে সব দুশ্চিন্তা চলে যায়।

খান বাহাদুর সাহেব সংক্ষেপে এবং গম্ভীরকণ্ঠে বললেন– ঠিক আছে, আপনার ছেলের লেখাপড়া শেষ হোক আর ইসলামের দিকে তার মন ঘুরুক, তখন ঐ বন্দোবস্তের ব্যাপারটা দেখা যাবে।

আকন্দ সাহেব শংকিতকণ্ঠে বললেন– সেকি! সে তো অনেক দিনের কথা।

হ্যাঁ, অনেক দিনেরই ব্যাপার। মেয়ে আমার পড়াশুনা করছে। এখন তার কাছে শাদির কোন কথাই তোলা যাবে না।

: খান বাহাদুর সাহেব!

: পারলে অপেক্ষা করবেন, না পারলে আমার কিছু করার নেই।

: জি?

আপনারা এবার আসুন। আমার খুবই তাড়া আছে। প্লিজ! –বলেই ড্রয়িংরুম থেকে উঠে অন্দরমহলে চলে গেলেন খানবাহাদুর সাহেব।

পরীর মায়ের ইংগিত আর পরীর মায়ের সাথে প্রায় প্রথম থেকেই ড্রয়িংরুমের

আড়ালে এসে দাঁড়িয়ে ছিল শবনম সাদিকা। পুত্রসহ ইসলামউদ্দীন আকন্দ অগত্যা বিদেয় হয়ে গেলে পরীর মা ঈষৎ হেসে বললো– কেমন দেখলেন আম্মাজান? ছেলেটা দেখতে খুবই সুন্দর, তাই নয়?

জবাবে শবনম সাদিকা বললো– হতে পারে। তোমার চোখে সুন্দর হলে হতে পারে। কিন্তু মাংকি ক্যাপ পরা ঐ মাংকি মার্কা সোনার চাঁদ আমার চোখে তেমন ঝিলিক মারলো না।

পরীর মা বললো– ওমা! ছেলেটাতো সুন্দরই দেখতে। তবু তোমার চোখে ধরলো না?

: না। তোমার চোখে ধরেছে?

: ধরবে না কেন? দেখতে তো আসলেই খারাপ নয়।

: তাই? তাহলে ওকে যেতে দিলে কেন? আজই ঝুলে পড়তে!

: ঝুলে পড়বো মানে?

গলাধরে ঝুলে পড়বে।

: মানে?

(ঈষৎ গানের সুরে) 'ঐ মাকুন্দ হতো যদি কুব্জ বালা, হতো দাড়িম্ব সুন্দরী দাড়িওয়ালা, আমি ঝুলে যে পড়িতাম, দাড়ি ধরে তার ঝুলে যে পড়িতাম।'

: (আর্তকণ্ঠে) আম্মাজান!

যাও, ঐ ছেলের খোয়াবে আর না থেকে এবার নিজের কাজে যাও। যার বিয়ে তার খোঁজ নেই, পাড়া পড়শির ঘুম নেই। –বলেই শবনম সাদিকা নিজেই আগে সেখান থেকে চলে গেল।

রাজনন্দিনী

খান বাহাদুর সাহেবের বাড়ির চাকর কেতাব আলীর ঘাড়ে ইদানিং খামারবাড়ির দায়িত্বটা পুরোপুরিভাবে চেপেছে। পাইট কিষাণেরা কে কি করছে, ক্ষেত-খামারের কাজকর্মগুলো ঠিক মতো হচ্ছে কিনা– এর তদারকিতে ইদানিং তাকে সকাল-সন্ধ্যা খামারবাড়িতেই থাকতে হচ্ছে। রাতটুকু শুধু অন্দর মহলের টুকিটাকি কাজকাম করে আর সকাল হলেই খামারবাড়িতে দৌড়ায়। এতে করে মৌলভী নূরু মিয়ার সাথে আলাপ-পরিচয়টা তার ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। দিনের ওয়াক্তিয়া নামাযগুলো সবই নূরু মিয়ার মোক্তাদি হয়ে আদায় করে আর সময় পেলেই নূরু মিয়ার কাছে বসে দীন-দুনিয়ার কথা শোনে। এমনই অবস্থায় একদিন কেতাব আলী নূরু মিয়াকে বললো– তা বলছিলাম কি মৌলবী সাহেব, যদি কিছু মনে না করেন– তাহলে একটা কথা বলি।

নূরু মিয়া বললো– হ্যাঁ, বলো বলো। খুব খারাপ কথা না হলে মনে করবো কেন?

না ঠিক খারাপ কথা নয়, তবে পরচর্চার কথা। মানে, এ বাড়ির লোকদের সম্বন্ধে কিছু কথা।

এই বাড়ির লোকদের সম্বন্ধে? কাদের সম্বন্ধে?

: কাদের মানে, ঐ শবনম সাদিকা আপামণি সম্বন্ধেই আসলে কথাটা।

শবনম সাদিকা ম্যাডাম? কেন, তাঁর আবার কি হলো?

হবে আবার কি? আপনি তো সব সময়ই তাঁর সাথে থাকেন। তার সাথে মাদরাসায় যান। একটা কথা তাঁকে বলতে পারেন না?

: কি কথা?

কথাটা হলো, তাঁকে বলেন– তাঁর ঐ ভূতের বেগার খাটাটা একেবারেই অর্থহীন।

: ভূতের বেগার! কোনটা ভূতের বেগার?

ঐ মাদরাসায় পড়াটা। কলেজে তো অনেক পড়াই পড়েছেন তিনি। আবার এই মাদরাসায় পড়া কেন?

সে কি! এটা তো ভাল কাজ। এটাই আসল পড়া। মাদরাসায় পড়লে তবেই আখেরের কাজ হয়। আখেরাত সম্বন্ধে জানা যায়। আল্লাহ-রসূল চেনা যায়। আল কুরআনের জ্ঞান লাভ হয়।

: অনর্থক ঐভাবে আপামণিকে জ্ঞান লাভ করতে হবে? শরীর মাটি করে?

: শরীর মাটি করে মানে?

ইদানিং উনি যা শুরু করেছেন তাতে শরীর তাঁর থাকবে না। সন্ধ্যা থেকে পড়া শুরু করে ইদানিং নিঁদ নাই, ঘুম নাই, সারারাত সমানে পড়ে চলেছেন। ওঁর কোন এক বান্ধবী চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে– এই পরীক্ষায় ঐ বান্ধবীই ফার্স্ট হবে আর ফার্স্ট হয়ে উপরের ক্লাশে উঠবে। কিন্তু আপামণির কথা, কভ্ভি নেহি। পরীক্ষায় আপামণিই ফার্স্ট হবে। এই বাহাসে নেমে অর্থাৎ পরীক্ষায় ফার্স্ট হওয়ার জন্যে আপামণি সারারাত সমানে পড়ে চলেছেন।

কেতাব আলী!

তাঁর চোখ দুটো ফুলে গেছে আর লাল টক্‌টকে হয়ে গেছে। আগামীকালই নাকি পরীক্ষা শেষ। আজ রাতেও উনি ঘুমাবেন না। তাকে নিষেধ করেন। রাত জেগে ফার্স্ট হয়ে লাভ কি?

ফার্স্ট হওয়ার আনন্দ আছে। কিন্তু তুমি যা বলছো তাতে শরীর নষ্ট করে ফার্স্ট হয়ে আনন্দ নেই।

সেই কথা তাকে বলেন। ঐভাবে লেখাপড়া শিখে লাভ নেই। দুইদিন পরই তো গিয়ে এক নাদানের হাতে পড়তে হবে। নাদানটা লেখাপড়াও বেশি জানে না, আল্লাহ-রসূলও বোঝে না। শুধুই ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে থাকে। ঐ ব্যবসা-বাণিজ্যই ওর বাপ-মা, ওর ইহকাল-পরকাল। বউকে কি ও কখনো আল্লাহ-রসূলের মধ্যে থাকতে দেবে? সংসারের হাজার কাজে ফেলে আপামণির হাড় মাংস কালো করে ফেলবে।

বলো কি! কে সে লোক?

বইঘর.কম ও রোকন

ঐ দুস্‌রা বেগম সাহেবার বোনপুত্‌। শবনম আপার নিজের মা মারা গেলে হুজুর ফের যাকে বিয়ে করে এনেছেন সেই দুই নম্বর বেগম। এই বেগমটি একদম ধান্দাবাজ মানুষ। পরীর মা বলে, ওটা দজ্জাল মেয়ে। সংসারের কোন ভাল কাজে নেই, কারো কোন ভালর মধ্যে নেই, কেবলই খাওয়া-শোয়া-ঘুম পাড়া আর বদ মতলব আঁটা।

: বলো কি?

আপামণির ঐ সৎমায়ের নজরটা শুধুই হুজুরের বিষয় সম্পত্তির আর জমিদারীর দিকে। এসব হাত করার জন্যে জব্বোর ফন্দি এঁটেছেন।

: ফন্দি!

জি মৌলভী সাহেব! শবনম আপামণি তো হুজুরের সব কিছুর একমাত্র ওয়ারিশ। তাই শবনম আপামণিকে কব্‌জা করতে পারলেই সব কিছু তাঁর কব্‌জার মধ্যে আসে। সেই ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছেন মতলববাজ মহিলাটা।

www.boighar.com

: অর্থাৎ?

শবনম সাদিকা আপামণির সাথে তাঁর ঐ নাদান বোনপুতের শাদি পাকা করে ফেলেছেন।

: বলো কি। হুজুর তাতে রাজী হবেন?

হবেন কি, হয়েছেন। হুজুর একদম রাজী। দ্বিতীয় এই ধূরন্ধর বেগমের ইচ্ছার এক সুত্‌ বাইরে যাওয়ার ফাঁক আছে কি হুজুরের! মুখের মিঠা দিয়ে হুজুরকে একদম বশ করে রেখেছেন। হুজুরও এখন এক পায়ে খাড়া। এই শাদিই তিনি দেবেন, কথাবার্তা ইতিমধ্যে সব পাকা। শুধু আর একটা বছর আপামণি মাদরাসায় পড়ুক, এই যা অপেক্ষা– এরপরই এই শাদি তিনি সম্পন্ন করবেন।

: তুমি বলো কি কেতাব আলী?

: একদম ওয়াদাবদ্ধ হয়ে গেছেন হুজুর। এর আর কোন নড়চড় হবে না।

ঠিক এই সময় দহলিজ থেকে খান বাহাদুর সাহেবের তলব আসায় কেতাব আলী পড়িমরি সেই দিকে ছুটলো। যাওয়ার মুহূর্তেও সে ব্যস্তকণ্ঠে নূরু মিয়াকে বলে গেল– নিষেধ করেন মৌলভী সাহেব! আপামণিকে ঐ ভূতের বেগার খাটতে নিষেধ করেন। খামাখা স্বাস্থ্য নষ্ট করে কোন লাভ নেই।

অনেকখানি চিন্তিত হলেও, নূরু মিয়া এ নিয়ে অধিক বিচলিত হলো না। কিন্তু তাকে বিচলিত হতে হলো পরের দিন মাদরাসায় যাওয়ার সময়। পরীক্ষার সময় একেবারে সন্নিকট হওয়ায় শবনম সাদিকা নূরু মিয়াকে জলদি জলদি ডেকে নিয়ে ছেড়ে দিল গাড়ি। নূরু মিয়া লক্ষ্য করে দেখলো– কেতাব আলীর কথাই ঠিক। সারারাত ঘুমায়নি শবনম সাদিকা। শরীর তার উস্কোখুস্কো, দুই চোখ টক্‌টকে লাল। জ্বরও গায়ে উঠেছে কি না কে জানে। এসব জিজ্ঞাসা করার কোন সুযোগ না দিয়ে পরীক্ষার সময় চলে গেল বলে শবনম সাদিকা একটানা চালিয়ে গেল গাড়ি এবং মাদরাসায় পৌঁছে পরীক্ষা হলে ঢুকলো। বরাবরের মতো গাড়ি পাহারা দিতে গিয়ে ফটকের বাইরে বসে রইলো নূরু মিয়া।

যথাসময়ে হয়ে গেল পরীক্ষা। পরীক্ষা শেষে শবনম সাদিকা যখন গাড়ির কাছে এলো তখন তার দুইপা টল্‌ছে। অন্য জগতে সে তখন। কথা বলার মতো কোন অবস্থায় না থাকায়, শবনম সাদিকা নীরবে গাড়িতে উঠে বসলো এবং ছেড়ে দিলো গাড়ি। খানিকক্ষণ চালিয়ে আসার পরই নূরু মিয়া লক্ষ করলো, গাড়ি কাঁপছে আর এদিক ওদিক পাক খাচ্ছে। চমকে উঠলো নূরু মিয়া। এক্‌সিডেন্ট নিশ্চিত জেনে সে দৌড়ে এসে গাড়ির স্টিয়ারিং ধরলো আর তখনই শবনম সাদিকা ঢলে পড়লো ড্রাইভিং সিটের উপর।

নূরু মিয়া তৎক্ষণাৎ গাড়িটা এক পাশে থামিয়ে রেখে ফের শবনম সাদিকাকে ধরলো আর চ্যাংদোলা করে তুলে এনে তাকে পেছনের ডাবল সিটে শুইয়ে দিলো। শবনম সাদিকা তখন সম্পূর্ণ অজ্ঞান। গায়ে তার দাউ দাউ করছে জ্বর। সে কাঁপছে। এখনই তাকে লেপের ভেতর শুইয়ে দিয়ে মাথায় পানি দেয়া আর ডাক্তার ডাকা দরকার বুঝে নূরু মিয়া এসে ড্রাইভিং সিটে বসলো এবং অতিদ্রুত চালিয়ে সে গাড়ি খান বাহাদুরের বাড়ির দিকে নিয়ে এলো। বাড়ির কাছাকাছি এসেই নূরু মিয়া ঘন ঘন হর্ণ দেয়ায় গাড়ি-বারান্দায় ছুটে এলো পরীর মা। সে নূরু মিয়াকে দ্রুত গাড়ি চালিয়ে আসতে দেখতে পেলো। এরপর গাড়ি এসে গাড়ি-বারান্দায় ঢুকলে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে থাকা শবনম সাদিকাকে দেখেই সে চিৎকার দিয়ে বলে উঠলো– হায় আল্লাহ! এ কি সর্বনাশ! কি হয়েছে আম্মাজানের? –বলতে বলতে এসে পরীর মা শবনম সাদিকাকে ধরলো।

শুরু হলো শুশ্রূষা। ডাক্তার এসে ওষুধ দিয়ে গেলেন। পরীর মা অহরহ তাঁর খেদমতে রইলো। ফলে সেদিন আর সে রাত যাওয়ার পরই জ্ঞান ফিরলো

বইঘর.কম ও রোকন
শবনম সাদিকার। জ্ঞান ফেরামাত্র শবনম সাদিকা ধড়মড় করে উঠে বসতে বসতে বললো– আমি কোথায়, আমি কোথায়? সামনেই ছিল পরীর মা। সে বললো– আপনি বাড়িতে।

শবনম সাদিকা বিস্মিতকণ্ঠে বললো– বাড়িতে! আমার কী হয়েছে?

: আপনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন।

: জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম?

জে আম্মাজান। গাড়ি চালিয়ে আসতে আসতে রাস্তার মধ্যেই আপনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন।

: রাস্তার মধ্যেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম? গাড়ি চালিয়ে আসতে আসতে?

: জি আম্মাজান, জি।

: তাহলে গাড়ি এলো কি করে? আমি বাড়িতে পৌঁছলাম কি করে?

মৌলভী নূরু মিয়া পৌঁছে দিলো। গাড়ি চালিয়ে এসে সে আপনাকে বাড়িতে পৌঁছে দিলো।

গাড়ি চালিয়ে এসে! কে গাড়ি চালিয়ে এলো?

ঐ মৌলভী নূরু মিয়া।

মৌলভী নূরু মিয়া! মৌলভী নূরু মিয়া গাড়ি চালিয়ে এলো?

: জি জি।

: তুমি কি খোয়াব দেখছো পরীর মা? নূরু মিয়া কি গাড়ি চালাতে পারে?

পারে আম্মাজান পারে। খুব ভাল পারে। অতিদ্রুত সে গাড়ি চালিয়ে এলো।

সে কি! কোন একসিডেন্ট্ করলো না?

এ্যাক্সিডেন্ট্ করবে কি? ওর হাতে গাড়িটাতো পোষমানা পাখির মতো সিধা চলে এলো। এতটুকু হেললোও না, দুললোও না।

কি তাজ্জব! কি তাজ্জব! তুমি ঠিক দেখেছো তো। নূরু মিয়া গাড়ি চালিয়ে এলো, না অন্য কেউ?

ওমা, সে কি! ঠিক দেখবো না কেন? পরিষ্কার দিনের বেলা দেখলাম, আমার ভুল হবে কেন?

ও মাই গড্?

শবনম সাদিকা দুই হাতে মাথার দুইদিক চেপে ধরলো। পরীর মা বললো– কি হলো আম্মাজান?

শবনম সাদিকা হুকুমের সুরে বললো– নূরু মিয়াকে ডেকে আনো! জলদি।

কেন আম্মাজান?

: যা বলছি, তাই করো। প্রশ্ন করো না।

অগত্যা নূরু মিয়াকে ডাকতে গেল পরীর মা। অল্পক্ষণ পরই নূরু মিয়াকে সঙ্গে নিয়ে ফের এসে হাজির হলো সেখানে। নূরু মিয়াকে দেখেই শবনম সাদিকা তাকে রোষভরে বললো– এদিকে এসো। আমার সামনে এসে দাঁড়াও।

আরো সামনে এসে নূরু মিয়া বললো– কি হয়েছে ম্যাডাম?

শবনম সাদিকা গুরুগম্ভীরকণ্ঠে বললো– তুমি কে? আসলেই কে তুমি?

নূরু মিয়া সবিস্ময়ে বললো– কেন ম্যাডাম, এ কথা বলছেন কেন?

পরীর মা ঠিক দেখেছে, না ভুল দেখেছে, বলো?

ম্যাডাম!

তুমি নাকি গাড়ি চালাতে পারো? পরীর মা নাকি দেখেছে?

ম্যাডাম!

যা বলছি তার উত্তর দাও। ম্যাডাম ম্যাডাম করো না। গাড়ি চালাতে পারো?

জি ম্যাডাম।

সে কি! পারো?

জি।

: তাজ্জব! তাহলে সেদিন মিথ্যা বললে কেন?

কোনদিন ম্যাডাম?

ঐ যে যেদিন অচল ইঞ্জিনটা চালু করে দিলে, সেদিন। আমি বললাম, তুমি তো গাড়ি চালাতে জানো না। ইঞ্জিন সম্বন্ধে তোমার এ জ্ঞান হলো কি করে? বলিনি?

জি ম্যাডাম বলেছিলেন।

তা হলে সেদিন স্বীকার করোনি কেন?

বইঘর.কম ও রোকন

: ম্যাডাম!

(কণ্ঠে জোর দিয়ে) তুমি যে গাড়ি চালাতে জানো, সে কথা সেদিন স্বীকার করোনি কেন?

আপনি তো আমাকে প্রশ্ন করেননি ম্যাডাম। আমি গাড়ি চালাতে জানি কি না সে প্রশ্ন না করে, আমি গাড়ি চালাতে জানিনে সে সিদ্ধান্ত আপনি নিজেই দিয়ে দিয়েছিলেন। এরপর আর আমার কি বলার ছিল ম্যাডাম?

: অর্থাৎ?

আপনি যখন ধরেই নিয়েছিলেন আমি জানি নে, তখন গায়ে পড়ে 'জানি' কথাটা বলা আমি সমীচীন মনে করিনি।

: সমীচীন মনে করোনি?

: ম্যাডাম!

তাহলে কি খুবই ভালভাবে চালাতে পারো গাড়ি? মানে পাকা ড্রাইভারের মতো?

: জি ম্যাডাম পারি।

: সুবহান আল্লাহ! এটা শিখলে কিভাবে?

ঐ যে ম্যাডাম, ওয়ার্কশপে কাজ করার সময় ইঞ্জিনের কাজ যেভাবে শিখেছিলাম, তখন ফাঁকে ফাঁকে চালিয়ে গাড়ি চালাতেও শিখেছিলাম। ওয়ার্কশপের আমার সেই উস্তাদ মানে ম্যাকানিক্‌স সাহেব, আমার আগ্রহ আর জ্ঞান বুদ্ধি দেখে আমাকে সে সুযোগ করে দিয়েছিলেন।

: সাব্বাশ্‌!

শবনম সাদিকা সুস্থ হয়ে উঠেছে শুনে ঠিক সেই সময়ে খান বাহাদুর সাহেব সেখানে এসে হাজির হলেন এবং এসেই তিনি শবনম সাদিকাকে খোশদিলে বললেন– আলহামদুলিল্লাহ! এই যে আম্মাজান! তোমার জ্ঞান ফিরে এসেছে? জ্বরটর সব গেছে?

শবনম সাদিকা বললো– জি আব্বাজান, এখন আমি সম্পূর্ণ সুস্থ।

খান বাহাদুর সাহেব ফের বললেন– তা শুনলাম, তুমি অজ্ঞান হয়ে গেলে এই নূরু মিয়াই নাকি গাড়ি চালিয়ে এনেছিল?

: জি আব্বাজান, তাই এনেছিল।

নূরু মিয়া গাড়ি চালাতেও জানে?

জানে আব্বাজান, খুব নাকি ভালভাবেই জানে। ওয়ার্কশপে ম্যাকানিক্‌সের কাজ শেখার সময় এটাও শিখেছিল।

মারহাবা- মারহাবা! এতো দেখছি সর্বগুণে গুণবান এক লোককে ভাগ্যগুণে পেয়ে গেছি আমরা। আর তাকে তোমার কাজে লাগিয়ে বড়ই বুদ্ধিমানের কাজ করেছি আমি। যাক, তোমার নিরাপত্তার ব্যাপারে আল্লাহর রহমে আমি এখন সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত।

আব্বাজান!

নূরু মিয়াকে লক্ষ্য করে অতঃপর খান বাহাদুর সাহেব বললেন– তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ নূরু মিয়া। তুমি নিতে না চাইলেও, তোমাকে একটা ইনাম আমি দেবোই। অবশ্যই দেবো। তা কি দেবো, সেটা ভেবে দেখি...

হাসতে হাসতে চলে গেলেন খান বাহাদুর সাহেব। শবনম সাদিকাকে বিশ্রামের সুযোগ দিয়ে নূরু মিযা ও পরীর মা দু'জনই খান সাহেবের পর পরই সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

'গজব-গজব, গজব হয়ে গেছে' কেরামত আলী আজগুবি লাফাতে শুরু করলো। তা দেখে তার দূর সম্পর্কের ফুফাতোভাই জিয়াফত আলী বললো– গজব হয়ে গেছে?

কেরামত আলী বললো– বিলকুল গজব হয়ে গেছে। হায় হায়! তোর ভাই আরাফত আর নেই!

জিয়াফত আলী বললো– নেই মানে?

কেরামত আলী বললো– টেনে নিয়ে গেছে। ফাইন্যাল বিচারের জন্যে আরাফতকে আজরাইল আরাফাতের মাঠে ছিড় ছিড় করে টেনে নিয়ে গেছে। তাকে আর এ দুনিয়ায় রাখেনি।

বললেই হলো?

একশোবার হলো। হাজারবার হলো।

কখ্‌খনো না। সে এই দুনিয়াতেই আছে।

কভ্ভি নেহি। সে ঐ দুনিয়ায় চলে গেছে।

খামুশ্! গাঁজিল কাঁহাকার।

খবরদার জিয়াফত। আমি গাঁজিল?

লক্ষবার গাঁজিল। দশ লক্ষবার গাঁজিল।

তোর ঠ্যাং ভেঙ্গে দেবো জিয়াফত। আবোল তাবোল বকবিনে।

তোকেও মেরামত করবো কিয়ামত। দস্তুর মতো মেরামত। মিথ্যা বলিস্নে।

হুঁশিয়ার জিয়াফত। এখনই কিন্তু আজরাইলকে জিয়াফত দিয়ে আনবো।

তোকেও এখনই কেয়ামত দেখিয়ে ছাড়বো।

: ইয়া আলী–

হক্ মওলা–

দু'জন দু'জনের উপর পড়ে পড়ে অবস্থা। এই সময় একটা পাগলা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে তাদের দিকে এলে তারা দু'জনই চমকে উঠলো ভয়ে। কেরামত আলী লাফিয়ে উঠে বললো– মর্গিয়া- মরগিয়া- মরগিয়া, বিলকুল মরগিয়া! বাঁচা...

জিয়াফত আলী লাফিয়ে উঠে বললো– মুর্দা হো গিয়া, বিলকুল মুর্দা হো গিয়া! বাঁচা...

দু'জনই ছুটে এসে সবলে জড়িয়ে ধরলো দু'জনকে আর ভয়ে থর থর করে কাঁপতে লাগলো এক সাথে। কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করতে করতে অন্যদিকে চলে গেলে কেরামত আলী জিয়াফত আলীকে ছেড়ে দিয়ে বললো– ছাড় ছাড়! গজব বিদায় হয়ে গেছে।

জিয়াফত আলী বললো– এ্যা! গজব বিদায়?

কেরামত আলী বললো– বিলকুল বিদায়। আর গজব নেই।

আর আমার ভাই? ওকে নিয়ে তোর গজব হলো কেন?

হবে না? আরাফত আরাফাতের ময়দানে নিলডাউন হয়ে বসে আছে বলেই তো গজবটা হলো।

আরাফত আরাফাতের ময়দানে– এ কথা তোকে কে বললো?

: আরে জ্বালা! তা না হলে সে এলো না কেন আমাদের সাথে? আমরা নাচতে

নাচতে এলাম আর সে এলো না কেন? ওখানে নিয়ে গিয়ে আজরাইল তাকে মুগুর মারছে বলেই তো...

এ্যাঁ!

সে আসবে কেন আমাদের সাথে? কুলসুম বিবি তাকে ডেকে পাঠিয়েছে যে! আমাদের পাড়ার কুলসুম।

কথা বলতে বলতে তারা দু'জন ইতোমধ্যে জমিদার মোজাফফর আহমদ খান বাহাদুর সাহেবের বাড়ির ফটক পার হয়ে এসেছিল। কেরামত আলী বললো– কুলসুম তাকে ডেকে পাঠিয়েছে? কেন কেন?

পেয়ার করতে। কুলসুম আরাফতকে পেয়ার করে যে। তাই আরাফত সেখানে ছুটেছে।

বলিস কি!

: বলার কি আছে। পেয়ারটা বড় না কুটুম্বিতা বড়। বল কোনটা বড়?

কেরামত আলী লাফিয়ে উঠে বললো– পেয়ার পেয়ার! একশোবার পেয়ার! আমিও শালা একটা পেয়ার করবো এবার। জরুর করবো।

পেয়ার করবি? কার সাথে?

ঐ তেজারত আলী ভাইয়ের শালীর সাথে।

তেজারত আলী ভাইয়ের শালী মানে?

ওরে বুদ্ধ! তেজারত আলী ভাই গুলজান খালার যে সৎ বেটিকে শাদি করবে, ঐ যে শবনম সাদিকা না কি যে নাম– সেই শবনম সাদিকার বোনের সাথে।

শবনম সাদিকার বোন! তার বোন আছে?

থাকতেই হবে। শালী না থাকলে তেজারত আলী ভাই কি অমনি অমনি খান বাহাদুর সাহেবের মেয়েকে শাদি করার জন্যে এমন পাগল হয়ে উঠেছে!

জিয়াফত আলী প্রশ্ন করলো– তুই তাকে দেখেছিস্?

কেরামত আলী বললো– আলবত দেখেছি।

দেখেছিস্! সে কি! ও মেয়ে কি তোর বাড়িতে কখনো গিয়েছিল?

তা যাবে কেন, সে তার বাড়িতেই ছিল।

তুইও তো এ বাড়িতে আর কখনো আসিস্ নি। বরাবর তুই তোর বাড়িতেই

ছিলি। তাহলে দেখলি কি করে?

আমার বাড়ি থেকেই দেখেছি।

সে কি! সে তো চল্লিশ মাইল ফারাগ।

ঐ ফারাগ থেকেই দেখেছি। জব্বোর সুন্দরী মেয়ে। তাকে না দেখলে চলে?

সুন্দরী?

বিশ্ব সেরা সুন্দরী।

জিয়াফত আলী এবার লাফিয়ে উঠে বললো– তাহলে আমি ওকে শাদি করবো।

কেরামত আলী শ্লেষভরে বললো– তুই? তুই তো একটা ভোঁদর। তোকে শাদি করবে কেন? আমাকে শাদি করবে।

তুইও তো আস্ত বাঁদর। মুখপোড়া বাঁদর। তোকে শাদি করবে কেন?

একশোবার করবে।

: কভ্ভি নেহি! আমাকে শাদি করবে।

হর গিজ্ নেহি। আমাকে শাদি করবে।

খুন করবো!

পুঁতে ফেলবো।

: খবর-দার...

: হুঁশিয়ার...

ইয়া আলী...

হক্ মওলা...

দু'জন দু'জনের দিকে অগ্রসর হলো। গোলমাল শুনে– 'এই, কে কে? এখানে গোলমাল করে কে? কেতাব আলী, দারোয়ান পাঠাও। দারোয়ান...' বলতে বলতে ছুটে এলো পরীর মা। দারোয়ান পাঠানোর কথা শুনে এরা ভয় পেয়ে গেল। কেরামত আলী বললো– আমি নই খালা, ও গোলমাল করেছে। ঐ শালা জিয়াফত।

কেরামতের দিকে আঙ্গুল তুলে জিয়াফত আলী বললো– আমি নই খালা, ও... ও, ঐ শালা জিয়াফত!

বইঘর.কম ও রোকন
কেরামতের দিকে আঙ্গুল তুলে জিয়াফত আলী বললো– আমি নই খালা, ও.. ও, ঐ শালা বদমায়েশ গোলমাল করেছে।

পরীর মা বললো– কে খালা?

কেরামত আলী বললো– আপনি। আপনি আমার গুলজান খালা। আমি বুঝি চিনিনে?

জিয়াফত আলী বললো– হ্যাঁ হ্যাঁ, হাজারবার গুলজান খালা। না চেনার কি আছে!

পরীর মা বললো– না, আমি গুলজান মানে গুলজাহান খালা নই।

কেরামত আলী বললো– আলবৎ গুলজান খালা।

জিয়াফত আলী বললো– পাঁচশোবার গুলজান খালা। এক বাড়িতে এক খালা ছাড়া আর কয়টা খালা থাকবে?

পরীর মা বললো– আরে না বাবা, আমি এ বাড়ির কাজের মেয়ে। কোন খালাটালা নই। তোমরা কে?

কেরামত আলী বললো– বোনপুত! বোনপুত! গুলজান খালার বোনপুত!

জিয়াফত আলী বললো– নূরজান খালার বেটা তেজারত আলীর ভাই। আমরা তার আত্মীয়।

পরীর মা বললো– তেজারত আলী! তেজারত আলী কে?

কেরামত আলী বললো– জামাই, এ বাড়ির হবু জামাই। তেজারত আলী বিশ্বাস। যার সাথে খান বাহাদুর সাহেবের মেয়ে শবনম সাদিকার শাদি হবে, আমরা তার নিকট আত্মীয়। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়।

খেয়াল হতেই পরীর মা বললো– এ্যাঁ! তেজারত আলী বিশ্বাস? কোথায় সে ছেলে?

জিয়াফত আলী বললো– এই বাড়িতেই তো এসেছে। আমরাও তার সাথেই এসেছি। আমরা একটু পিছে পড়ে গিয়াছিলাম, তাই তেজারত ভাই আগে এসে এই বাড়িতে ঢুকেছে।

পরীর মা সন্ত্রস্তকণ্ঠে বললো– ওমা, সে কি! তাহলে বেগম সাহেবার কাছে গেছে নিশ্চয়ই। গুলজাহান বানু বেগম সাহেবার কাছে। খালার কাছেই তো যাবে আগে। যাই যাই, এতক্ষণ হয়তো তোলপাড় শুরু হয়ে গেছে। ডাক পড়েছে আমার। বোনপুতের খেদমত করার জন্যে ডাক পড়েছে আমার।

বইঘর.কম ও রোকন

বলতে বলতে পরীর মা ছুটে অন্দরে চলে গেল। কেরামত আলী বললো– আরে, আমাদের ফেলে রেখে যাচ্ছো কেন? আমাদের নিয়ে যাও। আমরাও তো তেজারত আলীর মতো বোনপুত। নিয়ে যাও, নিয়ে যাও। অন্দরের কোথায় কোন ঘরে ঐ খালা আছে, আমরা তো চিনিনে। নিয়ে যাও নিয়ে যাও...

জিয়াফত আলী বললো– আরে কাকে ডাকছো? চিড়িয়া ফুরুৎ। এখানে কি আর আছে?

তেজারত আলী বিশ্বাস ইতোমধ্যেই তার খালার কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। তার খালা গুলজাহান বানু বেগম তেজারত আলীকে দেখে খুশিতে জার জার। এই তেজারতের সাথে শবনম সাদিকার শাদিটা সম্পন্ন করতে পারলেই খান বাহাদুর সাহেবের এই জমিদারী আর বিষয়-সম্পত্তি সব তাঁর মুঠোয়। তাই গুলজাহান বানু বেগম খুশিতে তাঁর বোনপুত তেজারত আলীকে কোলের কাছে টেনে নিলেন আর মাথায় মুখে হাত বুলাতে বুলাতে দরদ ভরে বলতে লাগলেন– আহা, বাছা আমার কত দূর থেকে এসেছে! এত দূরের রাস্তা পেরিয়ে আসতে বাছার আমার তকলিফ হয়েছে খুব। খুব কষ্ট হয়েছে। তাই নয় বাছা?

তেজারত আলী বললো– জি খালা, সাংঘাতিক কষ্ট হয়েছে। বহুত দূরের রাস্তা তো, আসতে আমার জান ফানা ফানা হয়ে গেছে।

খালা বললেন– আহারে! বসো বাছা, এখানে বসে একটু বিশ্রাম নাও।

বোনপুত বললো– না খালা, আগে শবনম সাদিকাকে ডাকো। সে আমার কাছে এসে বসুক। দুটো মিষ্টি কথা বলুক। 'ঐ দুধটুকুর জন্যেই এই রোযাটা করা'।

বাপজান!

:শবনম সাদিকার কথা বলছি।

: শবনম সাদিকা?

জি-জি। তাকে ডাকো। এখানে আনো।

হ্যাঁ হ্যাঁ, আনাই। কাজের বেটিটা ফের কোথায় যে গেল! কাজের সময় হাতের কাছে পাওয়া যায় না। পরীর মা... ও পরীর মা...!

গুলজাহান বানু বেগম উচ্চৈঃস্বরে ডাকতে লাগলেন। ছুটতে ছুটতে এসে

পরীর মা বললো– এই যে হুজুরাইন, আমি এখানে। হুকুম করুন।

হুজুরাইন রুষ্টকণ্ঠে বললেন– কোথায় ছিলে এতক্ষণ! আমি ডেকে ডেকে হয়রান।

পরীর মা বললো– ঐ ফটকের দিকে হুজুরাইন। আপনার আরো দুইজন বোনপুত এসেছে তো! তারা গোলমাল জুড়ে দিয়েছিল।

গুলজাহান বানু বেগম বিস্মিতকণ্ঠে বললো– সে কি! আরো দুইজন বোনপুত মানে?

তেজারত আলী সঙ্গে সঙ্গে বললো– আমার দুই ফুফাতোভাই খালা। দূর সম্পর্কের দুই ফুফুর দুই ছেলে। তারা জিদ্ ধরলো আপনার বাড়ি দেখবে। তাই বাধ্য হয়ে তাদের সাথে আনতে হলো।

ও, নূরজাহানের, মানে তোমার আম্মার ঐ দূর সম্পর্কের দুই ননদের ছেলে?

জি জি।

বেশ বেশ! এনেছো ভালই করেছো। তা তারা কোথায়?

পরীর মা বললো– ঐ ফটকের কাছে ঘুরছে। ওদের ডেকে আনবো বেগম সাহেবা!

ফের রুষ্টকণ্ঠে বললেন– না, ওদের ডাকতে হবে না। ওদের ডাকতে অন্য কাউকে পাঠাবো। তোমাকে যেজন্যে খুঁজছি সেইটে আগে করো।

হুজুরাইন!

শবনম সাদিকাকে ডাকো। ডেকে এখানে আনো।

এখানে?

হ্যাঁ, এখানে। শুনতে পাও না? জলদি জলদি যাও–

পরীর মা ফের শবনম সাদিকার তালাশে ছুটলো। তেজারত আলী বললো– শবনম সাদিকা নাকি ফের মাদরাসায় পড়তে শুরু করেছে! ওসব বাদ দাও খালা। আমি কাজের লোক। শাদিটা তাড়াতাড়ি সেরে দাও। ওকে কাজে লাগাবো।

খালা বললেন– হ্যাঁ হ্যাঁ, তাড়াতাড়িই সেরে দেবো। খান বাহাদুর সাহেব চাইছেন আর একটা বছর পড়ুক। কিন্তু উনি চাইলেই কি তা শুনবো? জলদি জলদি শাদিটা সেরে ফেলতে আমি ওঁকে বাধ্য করবো।

এই সময় কেরামত আলী ও জিয়াফত আলী সেখানে এসে হাজির হলো। কেরামত আলী বললো– এই যে, ঠিক জায়গায় এসে হাজির হয়েছি। আমরা কি বুদ্ধু যে আসতে পারবো না!

তেজারত আলী বিশ্বাস বললো– ও, তোমরা এসে গেছো?

কেরামত আলী বললো– হ্যাঁ এসে গেছি। কিন্তু এটা কি তোমার আক্কেল তেজারত ভাই! আমাদের ফেলে রেখে এসে তুমি একাই খালার আদর লুটে নিচ্ছো? আমরা কি? আমরা কি সব ফেলনা?

গুলজাহান বানু বেগম তেজারতকে বললেন– এই বুঝি তোমার সেই দুই ফুফাতো ভাই?

তেজারত আলী বললো– হ্যাঁ, দূর সম্পর্কের ফুফাতো ভাই।

বেগম সাহেবা বললেন– তা হোক দূর সম্পর্কের। ফুফাতো ভাই তো!

জি জি, তা ঠিক। আমিই তাদের সাথে করে এনেছি।

বেশ বেশ! এসো বাবা, তোমরা ঐ সোফাটায় বসো। আসতে তো তোমাদের কষ্ট হয়েছে। বিশ্রাম নাও।

কেরামত আলী বললো– না খালা, ঐ তেজারত ভাইয়ের মতো আমরাও কাজের লোক। তাই বিশ্রামের আগে কাজের কথাটা বলে ফেলাই পছন্দ করি।

: কাজের কথা! কি কথা বাবা?

এই তেজারত ভাইয়ের শাদির সাথে সেইদিনই তার শালীটারও শাদি দিতে হবে খালা।

তেজারত আলীর শালী মানে?

মানে, তেজারত ভাইয়ের হবু বউয়ের বোন। ঐ শবনম সাদিকা না কি যেন নাম, তার ছোট বোন।

এবার জিয়াফত আলী বললো– হোক ছোট। ছোট থাকতেই মেয়েদের শাদি দেয়া উচিত। বয়স বেশি হতে দেয়া ঠিক নয়।

খালা বললেন– এ তোমরা কি বলছো?

কেরামত আলী বললো– ও ঠিকই বলছে খালা। বর যখন হাতের কাছে রেডি, তখন আর দেরী করে লাভ কি? ঐ একই দিনে মেয়েটার শাদিটাও

হয়ে যাক।

বর রেডি! কার বর?

আপনার সৎবিটির ছোট বোনের বর।

কি মুস্কিল! তার ছোট বোন এলো কোত্থেকে?

আছে খালা, আছে। আমরা জানি। খুবই সুন্দরী মেয়ে। আপনারা বলতে চাইছেন না, তাই। কিন্তু বর যখন আগ্রহী, তখন আর...

বর! কে বর?

আমি, আমি। এই কেরামত আলী মোল্লা। আমি ওকে শাদি করতে চাই। বুঝতে পারছেন না খালা?

ক্ষেপে গেল জিয়াফত আলী। সে সক্রোধে বললো– খবরদার কেরামত! তুই শাদি করবি মানে? তেজারত ভাইয়ের ঐ সুন্দরী শালীকে শাদি করবো আমি। এই জিয়াফত আলী শেখ।

কেরামত আলী বললো– কখ্খনো না। আমি শাদি করবো।

জিয়াফত আলী বললো– হরগিজ্ না। আমি শাদি করবো।

না, আমি।

না, আমি।

খবরদার জিয়াফত?

হুঁশিয়ার কেরামত!

: তবে রে...

তবে রে...

দু'জন দু'জনের দিকে ঘুষি বাগিয়ে নিয়ে এলো। তা দেখে গুলজাহান বানু বেগম বিরক্ত হয়ে বললেন– আরে আরে! এরা তো আসলেই পাগল!

অতঃপর তেজারত আলীকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন– এদের কেন এনেছো বাবা!

তেজারত আলী দু'জনকে ধমক দিয়ে বললো– এই, থাম থাম। এটা পাগলা গারদ নাকি যে তোরা ফ্রি-স্টাইল পাগলামী শুরু করেছিস। নন্সেন্স কাঁহাসব!

গুলজাহান বানু বেগম বললেন– তা যা-ই বলো বাবা, পাগলা গারদই এদের উপযুক্ত স্থান। এদের কেন সঙ্গে নিয়ে ঘুরছো?

বইঘর.কম ও রোকন

তেজারত আলীও বিরক্ত হয়ে বললো– কি আর করবো খালা। কতদিন এদের বাপ-মাকে বললাম– এদের দু'জনের মাথা দুটো একদম অচল হয়ে গেছে, কাজ করছে না। মেরামত করতে ওয়ার্কশপে পাঠাও। কিন্তু কে শুনে কার কথা!

জিয়াফত আলী বললো– কি বললে?

তেজারত আলী সক্রোধে বললো– ঘোড়ার ডিম!

ঘোড়ার ডিম?

এই এত্তো বড় ডিম!

কেরামত আলী উল্লাসে নেচে উঠে সুর করে বললো– 'ঘোড়ার কি ডিম হয়, হয়কি ডিমের ছানা...'

সঙ্গে সঙ্গে জিয়াফত আলীও একইভাবে নেচে উঠে সুর করে বলতে লাগলো– 'পাগলা গারদ কোথায় আছে নাই বুঝি তা জানা! ঘোড়ার কি ডিম হয়, হয় কি ডিমের ছানা! পাগলা গারদ কোথায় আছে নাই বুঝি তা জানা।'

বিপুল উল্লাসে কথাগুলো সুর করে বার বার বলতে লাগলো জিয়াফত আলী আর এলোপাতাড়ি নাচতে লাগলো।

তা দেখে কেরামত আলীও গৌরাঙ্গের মতো দুই হাত ঊর্ধ্বে তুলে তার সাথে নাচতে লাগলো আর কথাগুলো বিপুল শব্দে বলতে লাগলো। গুলজাহান বানু বেগমের খাস কামরাটা পলকে একটা পাগলা গারদে পরিণত হয়ে গেল। হুজুরাইনের ঘরে বিপুল হৈ চৈ শুনে কয়েকজন প্রহরী ছুটে এলো। তাদের দেখেই তেজারত আলী বললো– নিয়ে যাও, নিয়ে যাও। এদের নিয়ে গিয়ে ফটকের ধুন্টি গরে তুলে তালা বন্ধ করে রাকো। এদের মাথাগুলো একেবারেই বিগড়ে গেছে। ঘরে বন্ধ হয়ে থাকলে আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হবে মাথা এদের। আর ঠাণ্ডা হবে এরা। নিয়ে যাও...

প্রহরীরা তখনই কেরামত আলী আর জিয়াফত আলীকে সবলে টেনে নিয়ে ঘরের বাইরে চলে গেল।

কিছুক্ষণ খালা-বোনপুত দু'জনই চুপ্‌চাপ। এই সময় পরীর মা ফিরে এসে বললো– এলেন না হুজুরাইন! শবনম সাদিকা আম্মাজান এলেন না।

গুলজাহান বানু বেগম সবিস্ময়ে বললেন– এলেন না মানে?

মানে, উনি বললেন, উনার এখন যাওয়ার উপায় নেই।

বইঘর.কম ও ব্লোকন

উপায় নেই কি রকম? তেজারত আলী বাপজান যে এসেছে, সে কথা বলেছিলে? বলেছিলে, তেজারত আলী তার সাথে কথা বলতে চায়?

বলেছিলাম হুজুরাইন! কিন্তু আম্মাজান বললেন, তিনি খুব ক্লান্ত আছেন। ক্লান্তি তার পুরোপুরি যায়নি। তাই উনি এখন আসতে পারবেন না।

বটে!

তেজারত আলী গোস্বাভরে বললো– মুখের কথায় হবে না খালা। এসব মেয়ে হাড় বদমায়েশ। চুলের মুঠি ধরে টেনে না আনলে এদের বদমায়েশী যাবে না।

পরীর মা এ কথায় নাখোশ নয়নে তাকালো। গুলজাহান বানুর নজর সব দিকে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তেজারত আলীকে বললেন– বলতে হয় না বাবা, ওভাবে বলতে হয় না। আমি বুঝি, লম্বা রাস্তা পেরিয়ে আসতে তোমার কষ্ট হয়েছে আর সে জন্যে তোমার মন মেজাজ পুরোপুরি ঠিক নেই। কিন্তু তাই বলে কি তোমার মতো এত শান্ত সুন্দর ছেলের এত শিগগির অধৈর্য হলে চলে? শাদিটা হয়ে যাক, তখন আপছে আপ্ সে শুধরে যাবে। আর একান্তই যদি শুধ্‌রে না যায়, তখন তুমি তাকে শুধরাবে।

পরীর মা এ কথার দিকেও কান দিলো দেখে গুলজাহান বানু বেগম তাকে বেরিয়ে যাওয়ার হুকুম দিতে চাইতেই ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন খান বাহাদুর সাহেব। তিনি বললেন– কি হয়েছে, কি হয়েছে! এ ঘরে এত গোলমাল হলো কেন? একদম হাট বসে গেছে মনে হলো! বিলকুল পাগলাগারদের ব্যাপার!

জবাব দিলো তেজারত আলী। বললো– ব্যাপার কতকটা তাই-ই খালুজান। আমার দুই আধপাগলা ফুফাতো ভাই নেহায়েত নাছোড়বান্দা হয়ে গিয়েছিলো বলেই ওদের সাথে এনেছিলাম। কিন্তু এরা যে এমন কাণ্ড করবে তা বুঝতে পারিনি।

খান বাহাদুর সাহেব বললেন– অর্থাৎ?

তেজারত আলী বললো– আগে মাঝে মধ্যে একটু আধটু পাগলামী করতো। আজ দেখছি একদম বেহাল হয়ে গেছে। দীর্ঘ রাস্তা আসতে গাড়ির ঝাঁকুনি খেয়েছে তো, তাতেই ওদের মাথার মগজগুলো একেবারেই উলট পালট হয়ে গেছে।

খান বাহাদুর সাহেব বললেন– তাজ্জব!

বইঘর.কম ও রোমেন্স

গুলজাহান বানু বেগম ঝাঁঝের সাথে বললেন– তাজ্জবের কি দেখেছেন? আপনার বেযাদব মেয়েটা যে কারবার করলো, তাতে একজন পাগলও তাজ্জব না হয়ে পারে না।

কেন, সে আবার কি করলো?

কি করলো না! আমার তেজারত আলী বাপজান দীর্ঘ রাস্তা কষ্ট করে এলো তার সাথে দুটো কথা বলার জন্যে অথচ আপনার মেয়ে তাকে পাত্তাই দিলো না।

: কি রকম?

রকম আবার কি? ক্লান্ত আছে বলে ফাল্‌তু এক অজুহাত খাড়া করে জোর জোর তাকিদ দেয়া সত্ত্বেও সে এলো না। আজ বাদে কাল যার সাথে তোমার শাদি হবে, তাকে এতটা উপেক্ষা করা কি ঠিক হচ্ছে তোমার। এতে কি মনে করছে তেজারত আলী বাপজান?

: ঠিকই তো, ঠিকই তো।

খান বাহাদুর সাহেব তখনই পরীর মাকে বললেন– যাও তো পরীর মা, শবনম আম্মাকে গিয়ে বলো, আমি তাকে ডাকছি। জলদি তাকে আসতে হবে। যাও...।

চলে গেল পরীর মা। এবার পরীর মায়ের সাথে শবনম সাদিকা যখন এলো তখন তাকে হঠাৎ করে চিনতে পারে, সাধ্য কার? তার সর্ব শরীর বোরকাদিয়ে ঢাকা। মুখের ঢাক্‌নাটা তুলে দিয়ে গোটা মাথা ওড়না দিয়ে পেচানো। শুধু মুখ মণ্ডলটুকু খোলা। তাকে এ অবস্থায় দেখে যারপরনাই নাখোশ হলেন গুলহাজান বানু বেগম। তিনি রোষভরে বললেন– এ আবার কি ঢং? এভাবে আসার মানে?

শবনম সাদিকা শক্তকণ্ঠে বললো– ঢং নয়। পরপুরুষের সামনে আসতে হলে এভাবেই আসতে হয়।

www.boighar.com

পরপুরুষ! কিসের পরপুরুষ? এ মাসেই শাদিটা হয়ে গেলে তেজারত আলী আর পরপুরুষ থাকবে?

: এ মাসেই শাদি মানে?

হ্যাঁ, তেজারত আলী চাইছে ওসব পড়াশুনা আর দরকার নেই। এ মাসেই শাদিটা হয়ে যাক।

বইঘর.কম

তার মানে? কার শাদি? আমার? পড়াশোনা শেষ না হতেই কারো সাথে শাদি পুষবো আমি? অসম্ভব ।

সে কি! তেজারত আলীর ইচ্ছাকে কোন মুল্য দাও না তুমি?

কি করে দেবো? আমার ইচ্ছাই আমার কাছে বড় । তাতে কারো ইচ্ছা পূরণ না হলে আমার কিছু করার নেই ।

বটে! তেজারত আলীর মতো একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির ইচ্ছার কোন মূল্য নেই তোমার কাছে? অথচ ভবঘুরে ঐ নয়া কামলা নূরু মিয়া কোন ইচ্ছার কথা বলার সাথে সাথে তো দৌড় দাও তার ইচ্ছা পূরণে । তাও আবার এভাবে আব্রু করে নয়, একদম খোলা মাথায় দাও না?

হ্যাঁ, দিই ।

ঐ একটা বেআদব কামলার কাছে যেতে কোন বোরকা লাগে না তোমার?

না লাগে না । ঐ বেআদবটার যে আদব আছে এসব দশটা বিশিষ্ট ব্যক্তির আদব একত্র করলেও তার সিকিটার সমানও হবে না ।

কি! এত বড় কথা?

হ্যাঁ, এত বড় কথাই ।

এত বড় কথা বলতেও তুমি সাহস পাও ।

যা সত্য তা বলতে আমি ভয় পাইনে ।

গুলজাহান বানু বেগম এবার তাঁর স্বামীকে উদ্দেশ্য করে বললেন– শুনছেন, শুনছেন! শুনছেন আপনার মেয়ের কথা?

খান বাহাদুর সাহেব তার মেয়েকে উদ্দেশ্য করে বললেন– ছিঃ আম্মাজান, এসব কথা বলতে নেই । আমি তো শিগগিরই এই তেজারত আলী বিশ্বাস বাপজানের সাথে তোমার শাদি দিতে চাই । তার সম্বন্ধে এসব কথা বলতে নেই ।

শবনম সাদিকা বললো– শিগগিরই শাদি দিতে চান?

হ্যাঁ আম্মাজান, সেইটেই আমার ইচ্ছে ।

তা হলেও আমি অপারগ আব্বাজান । আমার লেখাপড়া শেষ না হলে, আমি কোন শাদির মধ্যে নেই ।

সেটা কবে শেষ হবে?

আমার কামেল পর্যন্ত পড়ার ইচ্ছা। তা না হলেও অন্তত ফাজিল পর্যন্ত। তাতে যে কয় বছর লাগে লাগবে।

: কিন্তু আম্মাজান...

আমার বেয়াদবী মাফ করবেন আব্বাজান। গোস্তাগী মাফ করবেন। আমি অত্যন্ত ক্লান্ত। আমি দাঁড়াতে পারছিনে। এখনই শুয়ে পড়তে হবে। আমি ঘরে চললাম আব্বাজান, আমার ঘরে...

বলতে বলতে শবনম সাদিকা চলে গেল। গুলজাহান বানু বেগম বিস্মিতকণ্ঠে বললেন– এটা কি হলো?

বিবির কাছে অপ্রতিভ হয়ে খান বাহাদুর সাহেব বললেন– কোন চিন্তা করবেন না বেগম। আসলেই খুব ক্লান্ত আছে সে। যে রকম অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল, তাতে এত শিগগির তার এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারার কথা নয়।

কিন্তু সে যা বললো–

বলুক, যা বলে বলুক। এনিয়ে কোন চিন্তা করবেন না। আমি তাকে বুঝিয়ে সুজিয়ে ঠিক পথে নিয়ে আসবো। আপনি যেভাবে বলবেন, সেভাবেই তেজরাত আলীর সাথে শাদি হবে শবনমের। এক বছর অপেক্ষা করতে চেয়েছিলাম; প্রয়োজন হলে ছয় মাসের মধ্যেই দিয়ে দেবো শাদিটা।

ঠিক তো?

ঠিক ঠিক। তুমি এখন তেজারত আলী বাবাজীর বিশ্রামের ব্যবস্থা করো। বেগমের খাস কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেন খান বাহাদুর সাহেব।

দীর্ঘদিন ধরে অপরিসীম মর্মপীড়ায় ভুগছেন ষষ্ঠীতলার জমিদার দীদার আলী শাহ্। জমিদার খান বাহাদুর সাহেবের মেয়ের সাথে ছেলে বাহাদুর আলীর শাদি হলেই খান বাহাদুর সাহেবের জমিদারীটা আপছে আপ্ হাতে আসবে তাঁর, দীদার আলীর সে পরিকল্পনা বানচাল হয়ে গেল। খান বাহাদুর সাহেব এ বিয়ে দিতে ঝাড়া অস্বীকার করলেন। অথচ এই বিয়ে দিয়েই জমিদারীটা তিনি পাবেন আশায় খান বাহাদুর সাহেবের জমিদারীর উপর এ যাবত কোন আঘাত আনেন নি দীদার আলী শাহ্। বিয়েটা তো হলোই না উল্টো খান বাহাদুর সাহেবের চাকর তাঁর ছেলেকে মেরে হাসপাতালে পাঠালো। এর উপর আবার খাঁড়ার ঘা। পুঠিমারী বিলের মামলায় অতিশয় মোটা অংকের জরিমানা দিতে হলো তাঁকে। শুধু তাঁকেই নয়, দীদার আলীর হুজুর গুরু গোবিন্দ ঠাকুরকেও ঐ একই পরিমাণ জরিমানা দিতে হলো। জমিদার মোজাফফর আহমদ খান বাহাদুর তাঁদের এতটাই ভুগালেন। অর্থশোক বড় শোক। সেই সাথে এত সব অপমান! দীদার আলী এতটা সামলায় কি করে!

তাই প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন দীদার আলী শাহ। অর্থ দণ্ড দিতে হয়েছে তার গুরুদেব গুরু গোবিন্দ ঠাকুরকেও। কাজেই গুরু গোবিন্দের দ্বারা প্রতিশোধ নেয়াটা এবার খুবই সহজ হবে চিন্তা করে গুরু গোবিন্দের বাড়িতে এসে হাজির হলেন দীদার আলী শাহ্ সাহেব। বাড়ির ফটকে এসে 'হুজুর হুজুর' বলে ডাক হাঁক শুরু করলে বেরিয়ে এলো এক চাকর। প্রশ্ন করলো– কাকে ডাকছেন?

দীদার আলী বললো– আমার হুজুরকে।

চাকর ফের প্রশ্ন করলো– আপনার হুজুর! কে আপনার হুজুর?

এই বাড়ির মালিক। মানে, গুরু গোবিন্দ ঠাকুর।

এই সময় বেরিয়ে এলেন গুরু গোবিন্দ ঠাকুর। গরমকণ্ঠে বললেন– কেরে, কে? আমার নামটাও জানে না, কে লোকটা?

দুই হাত জোড় করে প্রণাম করার পর দীদার আলী শাহ বললেন– আমি হুজুর, আমি।

সে কি! দীদার আলী তুমি! তুমি আমার নামটাও জানো না?

: হুজুর!

গুরু গোবিন্দ, গুরু গোবিন্দ করছো কেন? আমার প্রভু হিজ এক্সেলেন্সী ডেভিড নিকোলসন সাহেব আমাকে যে নামে ডাকেন, সে নামের চেয়ে অন্য কোন নাম কখনো বড় হতে পারে? তোমরা জানো না, প্রভু আমাকে গরু গাভীন ঠাকুর বলেন?

জানি হুজুর, জানি।

তবে? সব সময় আমার ইংরেজী নাম বলবে। বলবে গরু গাভীন ঠাকুর। ঐ সব রাবিশ দেশী নাম বলবে না।

: আজ্ঞে হুজুর, আজ্ঞে। তাই বলবো।

এবার বলো, এত সকালে ইঠাৎ কি মনে করে?

ঐ বদমায়েশ খান বাহাদুরকে জব্দ করার জন্যে হুজুর। ব্যাটা আমাদের কতগুলো টাকা দণ্ড লাগালো, তা ভুলে গেছেন হুজুর?

: না, ভুলিনি। এটা কি ভুলে যাওয়া সম্ভব!

: তাহলে ব্যাটাকে জব্দ করছেন না কেন?

কি করে করবো? পথ তো পাচ্ছিনে!

সে কি হুজুর! ওর জমিদারীটা কেড়ে নিলেই তো ও ব্যাটা চরম জব্দ হয়। মাঠে গিয়ে ব্যাটাকে লাঙ্গল ঠেলে খেতে হয়।

: তা তো বুঝি। কিন্তু কেড়ে নেবো কি করে?

আপনার হিজ্ এক্সেলেন্সী প্রভুকে বলুন কেড়ে নিতে। কেড়ে নিয়ে আমাকে দিতে।

ওরে বাপ্রে! সে কথা বলা মাত্র প্রভু ডেভিড নিকোলসন সাহেব আমাকে শুট্ করবেন। গুলি করে মারবেন।

কেন হুজুর?

আমার প্রভু বুঝবেন, আমাদের দোষে আমাদের যে দণ্ড লেগেছে, সেই রাগে আমি ঐ নিরপরাধ লোকটার জমিদারী কেড়ে নেয়ার কুযুক্তি দিতে এসেছি।

হুজুর!

ইংরেজ সাহেবেরা খুবই ইনটেলিজেন্ট। খুবই বুদ্ধিমান। বলার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মতলব বুঝে ফেলবেন। ইংরেজি বিচারক বিচার করে দণ্ড দিয়েছেন। সেই দণ্ডকে অপমান করলে...

না-না হুজুর। আমরা সেদিকে যাবো কেন? শুধু শুধু জমিদারীটা কেড়ে নিতে বলবো কেন? অন্য অভিযোগ আনতে হবে। ঐ ব্যাটার বিরুদ্ধে অন্য গুরুতর অভিযোগ আনতে হবে।

গুরুতর অভিযোগ?

বিদ্রোহের অভিযোগ। ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অভিযোগ। এদেশ থেকে ইংরেজদের তাড়ানোর জন্যে ঐ ব্যাটা জমিদার দিনরাত ষড়যন্ত্র করছে আর তার প্রজাদের ক্ষেপিয়ে তুলছে– এই অভিযোগ।

দীদার আলী!

যারা শুরু থেকেই ইংরেজদের এ দেশ থেকে তাড়ানোর সংগ্রাম করে আসছে, ঐ ব্যাটা তাদের দলে নাম লিখিয়েছে– এই অভিযোগ। লিখিতভাবে এই অভিযোগ করুন। আমি জানি হুজুর, ইংরেজরা সব দোষই মাফ করে। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিযোগ কখনো মাপ করে না।

ক্ষণিক চিন্তা করে গরু গাভীন ঠাকুর বললো– হ্যাঁ-হ্যাঁ সে কথা ঠিক। এ অভিযোগ আনা যায় আর এইভাবে ব্যাটাকে ঠিকই জব্দ করা যায়।

তাহলে তাই করুন হুজুর।

ঠিক আছে। আজকে অভিযোগ লিপিবদ্ধ করে কালকেই আমার প্রভু হিজ্ এক্সেলেন্সী ডেভিড নিকোলসন সাহেবের কাছে দাখিল করবো।

করবেন তো হুজুর?

অবশ্যই করবো। কাল এসো। এক সাথে গিয়ে অভিযোগ দাখিল করবো। এখন যাও!

চলে গেল দীদার আলী শাহ। কিন্তু গুরু গোবিন্দ ঠাকুর একজন চাটুকারমাত্র। সাহেবের সাক্ষাৎ পাওয়া তার পক্ষে মোটেই সহজ নয়। পরের দিন চলে এলেন দীদার আলী। তাকে নিয়ে গুরু গোবিন্দু ঠাকুর খুব ভয়ে ভয়ে এসে ডেভিড নিকোলাসন সাহেবের খাস অফিস কক্ষের গেটে হাজির হলেন। গেটে ছিল এক আদ্‌না বাঙ্গালী দারোয়ান। তার কাজ নিকোলসন সাহেবের অফিস করে দরজা খোলা আর বন্ধ করা। শুধু আদনাই নয়, দারোয়ানটা ছিল একদম ক-বর্গ বঞ্চিত এক মূর্খ মানুষ। সাহেবের একটা কথাও সে বুঝতো না। কেউ সাহেবের সাথে দেখা করতে এসেছে– একথা বলার সাধ্য আর এক্তিয়ার তার ছিল না। দরজার বাইরে ছোট একটা টুল পেতে বসেছিল দারোয়ানটা। দীদার আলী আর গুরু গোবিন্দকে দেখে দারোয়ানটা বললো– কে তোমরা? এখানে কেন?

গুরু গোবিন্দ তথা গরু গাভীন্ বললেন– আমি হিজ্ একসেলেন্সী প্রভুর সেবাদাস। প্রভুর সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছি।

দারোয়ানটি বিস্মিতকণ্ঠে বললো– সাক্ষাৎ করতে? এই অফিসে? আগে কখনো এখানে এসে সাক্ষাৎ করেছো?

গুরু গোবিন্দ আমতা আমতা করে বললো– না, মানে...

দারোয়ানটা বললো– খাস ইংরেজ ছাড়া এখানে এসে কেউ সাক্ষাৎ পায় না।

গুরু গোবিন্দ বললো– তা ঠিক তা ঠিক। প্রভু যখন বাড়ির বাইরে বাগানে ভ্রমণ করেন, তখন আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করি। এখানে কখনো আসিনি। কিন্তু খুবই জরুরী তাই এখানে এসেছি। প্রভুকে একটু ডাকো।

দারোয়ান বললো– ডাকবো? আমি কি ডাকতে জানি?

: জানো না?

আজ্ঞে না। আমার সে হুকুম নেই। তা ছাড়া ডাকতে ইংরেজী কথা বলতে হয়। আমি ইংরেজী জানি নে।

: ইংরেজী জানো না?

একটুও না।

: সে কি! এখানে তুমি তাহলে কি কাজ করো?

: সাহেব যখন বলে তখন এই দরজা খুলি আর বন্ধ করি।

সে কি! ইংরেজী জানো না তো সাহেবের সে কথা বুঝো কি করে?

বইঘর.কম ও রোকন

সাহেব যখন খুব শব্দ করে বলে, 'দরোজা খোল্‌দে,' তখন খুলে দি।

কি তাজ্জব! সাহেব বাংলা জানেন।

তা জানিনে।

তাহলে- তাহলে?

এ সময় একজন পথচারী এ দিক দিয়ে যাচ্ছিল। এদের কথোপকথন শুনে সে বললো– ও তথ্য আমি জানি।

গরু গাভীন উল্লাসিত কণ্ঠে বললেন– তুমি জানো? সাহেব কি ভাবে বাংলা বলেন, তা তুমি জানো?

পথচারী বললো– জানি। ওটা সাহেবের এক চালাক কেরানী সুধীর বাবুর কৌশল। মানে, সুধীর বাবু এই দারোয়ানকে দিয়ে দরজা খোলার আর বন্ধ করার এক কৌশল সাহেবকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন।

: কিভাবে?

ধুধীর বাবু একটা কাগজে ইংরেজীতে লিখলেন– 'দেয়ার ওয়াজ এ ব্রাউন ক্রো।' কাগজের অপর পৃষ্ঠায় লিখলেন– 'দেয়ার ওয়াজ এ কোল্ড ডে।' তারপর সাহেবকে ইংরেজীতে বুঝিয়ে বললেন– এই প্রথম পৃষ্ঠার লেখাটা হেঁকে পড়লে, সঙ্গে সঙ্গে ঐ দারোয়ান দরজা বন্ধ করবে। আর দ্বিতীয় পৃষ্ঠার লেখাটা হাঁকলে, সে সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে দেবে।

হলোও তাই। ইংরেজদের উচ্চারণ খোট্টা মার্কা কর্কশ উচ্চারণ। সাহেব উচ্চকণ্ঠে পড়েন– 'দেয়ার ওয়াজ আ ব্রাউন খ্রো।' তখনই দারোয়ান বুঝে সাহেব বলছে– 'দরোজা বন্ধ করো' অমনি সে দরজা বন্ধ করে দেয়। আবার সাহেব যখন পড়েন– 'দেয়ার ওয়াজ আ খোল্ড ডে', তখনই দারোয়ান বুঝে সাহেব বলছে– 'দরোজা খোল দে'। তখনই দারোয়ান দরজা খুলে দেয়।

গরু গাভীন ও দীদার আলী তাজ্জব হয়ে বললেন– কি তাজ্জব। এই ব্যাপার?

পথচারী বললো– হ্যাঁ, এই ব্যাপার। সাহেবকে ডেকে দেয়ার ক্ষমতা এ দারোয়ানের নেই আর এখানে খাস ইংরেজ ছাড়া আর কারো সাথে দেখাও করেন না সাহেব।

তাহলে?

তাহলে এখান থেকে আজ ফিরে যান। সাহেব যখন বাসায় গিয়ে বাগানে বা লনে বসে থেকে হাওয়া খান, তখন সেখানে গিয়ে তাঁর সাথে দেখা করবেন।

বইঘর.কম ও রোকন
গরু গাভীন বললেন– তা বটে, তা বটে। বরাবর ঐভাবেই সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করি আমি। অন্য কোথাও দেখা কখনো পাইনি।

তাহলে তাই যান। খামাকা এখানে মাথাকুটে লাভ নেই।

চলে গেল পথচারী। সেই মোতাবেক সাহেবের বাগানে আর লনে দেখা করার চেষ্টা করলেন এরা দুইজন। অর্থাৎ, গরু গাভীন আর দীদার আলী। কিন্তু পর পর তিন দিন ঘুরেও সাহেবকে বাগানে বা লনে তারা পেলেন না। এক সপ্তাহ কেটে গেল। দেখা পেলেন দ্বিতীয় সপ্তাহের একদিন। সাহেব লনে বসে গুনগুন করে গান গাইছিলেন আর পা নাচাচ্ছিলেন। কুঁজো হয়ে দূর থেকে সালাম ঠুকতে ঠুকতে সাহেবের সামনে এসে দাঁড়ালেন গরু গাভীন ঠাকুর ও দীদার আলী। গরু গাভীনকে দেখে ডেভিড নিকোলসন সাহেব বললেন– হ্যাল্লো মি. গরু গাভীন, হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট? হোয়াই আর ইউ হেয়ার? (ওহে মি. গরু গাভীন, তুমি কি চাও? তুমি এখানে কেন?)

গরু গাভীন বললেন– উইথ্ এ কম্প্লেন মাই লর্ড। উই হ্যাভ কাম হেয়ার উইথ এ রিটেন কমপ্লেন। (অভিযোগ নিয়ে প্রভু। একটি লিখিত নালিশ নিয়ে আমরা এখানে এসেছি।)

নিকোলসন সাহেব প্রশ্ন করলেন– উইথ এ রিটেন কম্প্লেন! এগেন্ষ্ট হোম? (লিখিত অভিযোগ নিয়ে! কার বিরুদ্ধে?)

গরু গাভীন বললেন– এগেন্ষ্ট জমিনদার মোজাফফর আহমদ খান বাহাডুর। (জমিদার মোজাফফর আহমদ খান বাহাদুরের বিরুদ্ধে।]

মোজাফফর আহম্মড্ কান বাহাডুর! হোয়াট ডু ইউ সে? হি ইজ এ ভেরী গুড্ ম্যান। আই হ্যাভ্ হার্ড ইট। (মোজাফফর আহমদ খান বাহাদুর! কি বলছো তুমি? সে একজন অত্যন্ত ভাল মানুষ। আমি তা শুনেছি।)

নো মাই লর্ড। হি ইজ এ ভেরী ব্যাড ম্যান। (না প্রভু! সে একজন অত্যন্ত খারাপ মানুষ)

: ব্যাড্ ম্যান! (খারাপ মানুষ।)

ইয়েস্ মাইলর্ড এ ডেঞ্জারাস ইনিমি। (হ্যাঁ প্রভু। একজন সাংঘাতিক দুশমন।)

এ ডেঞ্জারাস্ ইনিমি। (একজন সাংঘাতিক দুশমন।)

ইয়েস্ মাই লর্ড। এ ড্যাঞ্জারাস ইনিমি অফ দি হোনী হার্টেড এ্যান্ড গড্-

বইঘর.কম ও রোকন
লাইক ইংলিশ পিউপল্ (হ্যাঁ প্রভু। পবিত্র হৃদয় ও ইশ্বরতুল্য ইংরেজ লোকদের একজন সাংঘাতিক দুশমন।)

গরু গাভীন! (গুরু গোবিন্দ।)

হি ওয়ান্ট্স্ টু ড্রাইভ এ্যাওয়ায়ে দি ইংলিশ পিউপল ফ্রম্ দিস্ ল্যান্ড। (সে ইংরেজদের এদেশ থেকে বিতাড়িত করতে চায়।)

(ক্ষপ্তি কণ্ঠে) হোয়াট! (কি বললে?)

হি হ্যাজ্ বিন কন্স্পায়রিং ফর ইট উইথ অল্ আদার ইনিমিজ অফ্ দি ইংলিশ পিউপ্ল্ ডে এ্যান্ড নাইট। (এ জন্যে সে ইংরেজদের অন্যান্য সকল শত্রুর সাথে দিন রাত ষড়যন্ত্র করে চলেছে।)

গরু গাভীন! (গুরু গোবিন্দা)

হি ইজ এ ট্রেটার। (সে একজন বিশ্বাসঘাতক।)

আর ইউ শিওর? (তুমি নিশ্চিত?)

হান্ড্রেড পারসেন্ট মাইলর্ড; হান্ড্রেড্ পারসেন্ট। (একশো ভাগ প্রভু, একশো ভাগ।)

হান্ড্রেড পারসেন্ট? (একশোভাগ?)

ইয়েস মাই লর্ড। পানিশ্ হিম্। (হ্যাঁ প্রভু। তাকে শাস্তি দিন।)

ওকে, ওকে। আই শ্যাল ডু ইট্। বাট আই শ্যাল ইনকোয়্যার ইন্টু ইট ফার্ষ্ট। (ঠিক আছে ঠিক আছে। আমি তা করবো। কিন্তু প্রথমে আমি এটা তদন্ত করে দেখবো।)

গুরু গোবিন্দ ঠাকুর বাধা দিয়ে বললো– নো নীড-নো নীড। ইট ইজ ট্রু। টোটালী ট্রু। পানিশ্ হিম্ মাইলর্ড। (দরকার- দরকার নাই। ঘটনা সত্য প্রভু। এ ঘটনা সম্পূর্ণ সত্য। তকে শাস্তি দিন।)

গরু গাভীন! (গুরু গোবিন্দ!)

কাইন্ডলী ক্যান্সেল দি লাইসেন্স অফ হিজ জমিনডারী মাইলর্ড। ক্যানসেন দি গ্র্যান্ট্ অফ্ হিজ জমিনডারী। হি মাস্ট্নট এনজয় ইট এনি মোর। (দয়া করে তার জমিদারীর লাইসেন্স বাতিল করুন প্রভুর। তার জমিদারীর অনুমোদন বাতিল করুন। তাকে আর কোন মতেই জমিদারী ভোগ করতে দেয়া যায় না।)

এ্যান্ড দেন? (এবং তারপর)

কাইন্ডলী গিভ্ দ্যাট জমিনডারী টু দিস্ ম্যান। গ্রান্ট্ ইট টু হিম্। (দয়া করে ঐ জমিদারীটা একে দিন। এর নামে মঞ্জুর করুন।)

গরু গাভীন দীদার আলী শাহের প্রতি ইংগিত করলেন। সাহেব বললেন– হু ইজ হি? (কে ঐ লোক?)

গরু গাভীন বললেন– হি ইজ ডিডার আলী শাহ, দি জমিনডার অফ্ ষষ্ঠীতলা। এ ভেরী ওবিডিয়ন্ট ম্যান। (সে দীদার আলী শাহ। ষষ্ঠী তলার জমিদার। অত্যন্ত বাধ্যগত মানুষ।)

ওবিডিয়েন্ট! (বাধ্য গত!)

ইওর মোষ্ট অবিডিয়েন্ট সারভেন্ট মাইলর্ড। এ ভেরী লয়্যাল পারসন টু অল্ দি ইংলিশ পিউপল। (আপনার একান্ত বাধ্যগত গোলাম প্রভু। গোটা ইংরেজ জাতির প্রতি সে অত্যন্ত অনুগত লোক।)

ও. কে। আই শ্যাল থিং ইট্ লেটার। ফার্ষ্ট লেটমী ইনকোয়্যার ইন্টু দি ম্যাটার। (ঠিক আছে। এটা আমি পরে ভেবে দেখবো। আগে আমি এটা তদন্ত করে দেখি।)

এ কথায় গরু গাভীন ও দীদার আলী উভয়েই শংকিত হয়ে উঠলেন। গরু গাভীন শশব্যস্তে বললেন– নো নীড্ মাইলর্ড। নো নীড টু ইনকোয়্যার ইন্টু। (না প্রভু, কোন দরকার নেই। এটা তদন্ত করে দেখার কোন দরকার নেই)

নো-নো, ইট ইজ ভেরী নেসেসারী। (না-না, এটা অত্যন্ত জরুরি।)

গরু গাভীন কাতরকণ্ঠে বললেন– মাইলর্ড। (প্রভু)

সাহেব বললেন– নাউ গো হোম। আই হ্যাভ্ আদার বিনজেস ইন মাই হ্যাণ্ড। ইউ লীভ মী এলোন। (এখন তোমরা বাড়ি যাও। আমার হাতে অন্য কাজ আছে। আমাকে একা থাকতে দাও।)

বাট্ মাইলর্ড... (কিন্তু প্রভু)

সাহেব ক্ষেপে গেলেন। ধমক দিয়ে বললেন– গেট্ আউট্। আই সে গেট্ আউট (বেরিয়ে যাও– বেরিয়ে যাও–)

চমকে উঠলেন গুরু গোবিন্দ ঠাকুর ও দীদার আলী। আতংকগ্রস্ত হয়ে তারা তখনই সে স্থান ত্যাগ করলেন।

ডেভিড্ নিকোলসন সাহেব পরের দিনই জমিদার মোজাফফর আহমদ খান বাহাদুর সাহেবকে তলব দিলেন। খান বাহাদুর সাহেব এলে নিকোলসন সাহেব দোভাষীর মাধ্যমে তাঁকে জানালেন– আপনার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ আছে। অভিযোগে বলা হয়েছে– আপনি ইংরেজদের এদেশ থেকে তাড়ানোর জন্যে দিন রাত ষড়যন্ত্র করছেন। এদেশে আর যত ইংরেজদের শত্রু আছে, তাদের সাথে অবিরাম বৈঠক দিচ্ছেন। এদেশ থেকে আমাদের তাড়ানোর জন্যে আপনি বদ্ধপরিকর। এ কথা কি সত্য?

জবাবে খান বাহাদুর সাহেব দোভাষীর মাধ্যমে বিনয়ের সাথে বললেন– মিথ্যা জনাব। এ অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। অভিযোগকারী শত্রুতা করে আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনেছে। আমি শান্তিপ্রিয় মানুষ। কোন শাঠ্য-ষড়যন্ত্র আমি কখনো জানিনে বা ওসবে আমি থাকিনে। বিশ্বাস না হলে জনাব যথাযথ তদন্ত করে তা দেখতে পারেন।

খান বাহাদুর সাহেবকে বিদায় করে দিয়ে নিকোলসন সাহেব তদন্ত করে দেখতে লাগলেন। বিভিন্ন টিমের মাধ্যমে তদন্ত করে তিনি দেখলেন, অভিযোগটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। জমিদার খান বাহাদুর সাহেব আসলেই একজন সৎ ও সম্মানী লোক।

যারপর নেই ক্ষেপে গেলেন নিকোলসন সাহেব। তখনই তিনি জরুরী তলব দিলেন গরু গাভীন ও দীদার আলী শাহ্কে। তলব পেয়ে তারা কাঁপতে কাঁপতে এসে সাহেবের সামনে দাঁড়ালেন। সাহেব পিস্তল তুলে বললেন– ইউ ব্রাডী লায়ার! আই শ্যাল শুট ইউ। ইউ হ্যাভ সাবমিটেড্ এ টোটালী ফল্স্ কমপ্লেন। হোয়াই ডিড ইউ ডু ইট্? জমিনদার মোজাফফর আহম্মড্ খান বাহাডুর ইজ এ ভেরী ফাইন ম্যান। এ নাইস্ জেন্টল ম্যান। হোয়াই ডিড ইউ টেল এ লাই? (ঘৃণ্য মিথ্যুক। আমি তোমাকে গুলি করবো। তুমি একটি সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ দাখিল করেছো। কেন তুমি তা করলে? জমিদার মোজাফফর আহমদ খান বাহাদুর সাহেব একজন অত্যন্ত সুন্দর মানুষ। একজন অত্যন্ত সুন্দর ভদ্র লোক। কেন তুমি মিথ্যা বললে?)

গরু গাভীন্ থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে বললো– মাইলর্ড! (প্রভু)।

ষ্ট্যান্ড্ ইন্ এ লাইন। আই শ্যাল শুট্ বোথ অফ ইউ। (লাইন ধরে দাঁড়াও। তোমাদের দুজনকেই আমি গুলি করবো।)

গরু গাভীন ও দীদার আলী চমকে উঠে তৎণাৎ হুড়মুড় করে পড়ে গেলেন

সাহেবের পায়ে। গরু গাভীন আর্তকণ্ঠে বললেন– সেভ আস মাইলর্ড, সেভ্ আস– দিস্ ইজ নট্ আওয়ার ফল্ট। নট আওয়ার ওন কমপ্লেন। উই হ্যাভ হার্ড ইট ফ্রাম দি পাবলিক। দি পাবলিক স্রেড- 'হি ইজ এ কন্স্পিরেটার।" উই লাভ দি ইংলিশ পিউপ্ল। দিস হার্ট আস। সো, এস সুন এস উই হার্ড ইট, উই সাবমিটেড দ্যাট্ কম্প্লেন। (রক্ষা করুন প্রভু, আমাদের রক্ষা করুন। এটা আমাদের ত্রুটি নয়। আমাদের নিজেদের অভিযোগ নয়। আমরা এটা জনগণের নিকট থেকে শুনেছি। জনগণ বললো– 'সে একজন ষড়যন্ত্রকারী। আমরা ইংরেজ জাতিকে বড়ই ভালবাসি। তাই একথা আমাদের হৃদয়ে বড়ই লেগেছে। এ কারণে শুনামাত্র আমরা ঐ নালিশটা দাখিল করেছি।

অল্ রাবিশ! হোয়াই ডিড ইউ বিলিভ্ দি হেয়ার সে ম্যাটার? (যত্তসব বাজে। কেন তোমরা জনশ্রুতি বিশ্বাস করতে গেলে?)

নো মোর মাইলর্ড্। উই শ্যাল বিলিভ ইট নো মোর। কাইন্ডলী একস্কিউজ আস্ দিস্ টাইম। ইউ আর এ ভেরী মার্সিফুল লর্ড। বি মার্সিফুল টু আস। (আর নয় প্রভু। আর কখনো এসব বিশ্বাস করবো না। দয়া করে আমাদের এবার মার্জনা করে দিন। আপনি একজন অত্যন্ত দয়ালু প্রভু। আমাদের প্রতি দয়াবান হউন।)

অলরাইট! ফর দি ফার্ষ্ট টাইম আই এক্স্কিউজ্ ইউ। বাট্ নো মোর আফটার দিস্। (ঠিক আছে। প্রথমবারের মতো মাফ করে দিলাম। কিন্তু এর পরে আর নয়।)

থ্যাংক ইউ মাই লর্ড, মেনী মেনী থ্যাংক্স্ টু ইউ। ইউ আর রিয়ালী এ ভেরী মার্সিফুল্ ম্যান। (ধন্যবাদ প্রভু। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনিসত্যই একজন অতিশয় দয়ালু ব্যক্তি।)

গরু গাভীন। (গুরু গোবিন্দ!)

: বাট ওয়ান থিং মাইলর্ড। ইট ইজ এ ফ্যাক্ট দ্যাট দেয়ার ইজ অল্ওয়েজ এ টারবুলেন্ট ক্যাওস্ এ্যাণ্ড কন্ফিউশান ইন দি জমিরডারী অফ দ্যাট্ খান বাহাদুর। এ ফিউরিয়াস এটাক্ এ্যাণ্ড কাউন্টার এটাক। কাইণ্ডলী ডু সামথিং এবাউট্ ইট। (কিন্তু একটা বিষয় প্রভু। ইহা সত্য যে, ঐ খান বাহাদুরের জমিদারীর মধ্যে সব সময় দুর্দান্ত হৈচৈ ও গোলমাল লেগেই থাকে। ভয়াবহ আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণ। দয়া করে এ ব্যাপারে একটা কিছু করুন।)

বইঘর.কম ও রোকন

নো, দিস্ ইজ নট্ মাই বিজনেস। ইট ইজ হিজ ইন্টারন্যাল এ্যাফেয়ারস্। হি উইল ডু হোয়াট এভার হি লাইকস্ বেষ্ট্। এক্সেপ্ট্ মার্ডার আই শ্যাল নট্ পোক মাই নোজ্ ইনটু আদার্স ইন্টারন্যাল ম্যাটার। (না, এটা আমার বিষয় নয়। এটা তার অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। এ সব ব্যাপারে সে যা ভাল মনে করে তাই সে করবে। একমাত্র খুন ছাড়া অন্যের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে আমি নাক গলাই না।)

মাইলর্ড! প্রভু!

গেট আউট ডোন্ট্ কাম এগেন উইথ ফলস্ কম্প্লেন। (বিদায় হও। আর কখনো মিথ্যা অভিযোগ নিয়ে আসবেনা।) www.boighar.com

নো মোর মাইলর্ড। নো মোর। থ্যাংক ইউ মাইলর্ড। থ্যাংক ইউ। (আর নয় প্রভু, আর নয়। ধন্যবাদ প্রভু, ধন্যবাদ)

ছাড়া পেয়ে গুরু গোবিন্দ ও দীদার আলী পড়িমরি দ্রুত পদে সেখান থেকে পালালেন।

বেরিয়ে আড়ালে এসে গুরু গোবিন্দ দীদার আলীকে বললেন– এখানে কিছু হবে না। রাস্তা পরিষ্কার করে নিলাম। সাহেব আর দেখতে আসবে না। এখন যা করার আপনাকেই করতে হবে।

দীদার আলী বললেন– কি করবো?

গুরু গোবিন্দ বললেন– ডান্ডা লাগান। ঐ চাকর নূরু মিয়া না কিযেন নাম, ঐ চাকরের পিঠে ডান্ডা লাগিয়ে খান বাহাদুরের মেয়েকে লোপাট করে নিয়ে যান। কয়েক দিন ফূর্তি লুটে ছেড়ে দিলে চরম জব্দ হয়ে যাবে ঐ খান বাহাদুর। চাই কি, তখন আপনার বাহাদুর আলীর সাথে মেয়ের শাদি দিতে সে আপনার হাতে-পায়ে ধরবে।

তা তো বুঝলাম। কিন্তু ঐ চাকরটা থাকতে ঐ মেয়ের কাছে ভিড়া যাবে কি করে? একবার যে মার মেরেছে আমার ছেলেকে!

মারবেই তো। দুই তিন জন লোক গেলে ঐ রকম মারবে আর কাপড় চোপড় নষ্ট করাবে। বিশ-পঁচিশ লোক পাঠান। বিশ-পঁচিশ জন লোক এক জোটে ঐ চাকরটার উপর হামলা করলে তখন ঐ চাকরটাই কাপড় চোপড় নষ্ট করবে।

: তা অবশ্য ঠিক।

বইঘর.কম

কিন্তু সাবধান! ঐ ব্যাটা চারকটা যেন একদম মরে না যায়। আধ্মরা করে ছেড়ে দেবেন।

: তা না হয় হলো। কিন্তু বারোজনে ঐ মেয়েটাকে নিয়ে ফূর্তি করলে, আমার ছেলেই যদি ওকে আর নিতে না চায়?

আরে-আরে! বারোজনে কেন? মেয়েটাকে ধরে নিয়ে গিয়ে আপনার ছেলের কাছেই এক ঘরে তুলে দেবে। ফূর্তি যা করার তা আপনার ছেলে একাই করবে। তখন তো আকর্ষণ আরো বেড়ে যাবে। আপনার ছেলে না করবে মানে?

দীদার আলী শাহ্ খানিক চিন্তা করে বললেন– তা হলে তো আবার সেই বিপদ!

গুরু গোবিন্দ ঠাকুর প্রশ্ন করলেন - সেই বিপদ মানে?

দীদার আলী বললেন– মানে, আমার ছেলেকে তো তাহলে আবার সেখানে যেতে হবে। মানে, ঐ খান বাহাদুরের এলাকায় ঐ চাকরটার কাছে।

হ্যাঁ যেতে হবে। আপনার এলাকা থেকে এতলোক ঐ এলাকায় যাবে, আর আপনার ছেলে যাবে না?

: আবার যদি ঐ চাকরটা আমার ছেলেকে মারে?

এত লোক থাকতে আপনার ছেলেকে মারবে কি করে? সব লোক একজোটে ঐ চাকরটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে, নিজের জান বাঁচানোরই সে পথ পাবে না। আপনার ছেলেকে মারার সুযোগ পাবে কোথায়?

তবু যদি এক ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এসে মারে! না হুজুর, আমার দীদার আলীর গিয়ে কাজ নেই।

তাহলে ঐ মেয়েকে নিয়ে ঐ বারোজনই ফূর্তি করবে। আপনার ছেলের হাতে আর পড়বে না বা তাকে শাদি করাও তার হবে না।

কেন- কেন?

আপনিই তো বললেন- বারোজনে ফূর্তি করা মেয়েকে আপনার ছেলে আর নাও নিতে পারে?

: তা কথা হলো...

তা ছাড়া নিতে চাইলেও লাভ নেই। খান বাহাদুর সাহেব বারোজনে ফুর্তি

করা মেয়েকে ঐ বারোজনের যে কোন একজনকেও দিতে পারেন। আপনার ছেলে তো আর ফূর্তি করেনি। তার সাথে শাদি দিতে চাইবেন কেন?

হুজুর!

কিংবা দূর দূরান্তের অন্য কারো সাথে শাদি দিয়ে মেয়েকে দূর দূরান্তে পাটাতে পারেন। অন্য কোন ওয়ারিশ নেই। জমিদারীটা তখন সেই জামাই-ই পাবে। আপনার ভাগ্যে শিকে আর ছিঁড়বে না।

তা হলে?

ভয় করলে জয় লাভ হয় না। এত ভয় না করে আপনার পাঠানো ঐ মারতে যাওয়া দলের সাথে ছেলেকে পাঠিয়ে দিন। যা বললাম সেইভাবে কাজ হলে, ঐ মেয়েটাও আপনার ছেলের বউ হবে আর খান বাহাদুরের জমিদারীটাও আপনার হাতে পড়বে।

বলছেন?

হ্যাঁ, বলছি। ভয় না করে মর্দের মতো কাজ করুন। শক্ত মরদের দক্ষিণ দুয়ারী ঘর, বুঝেছেন?

দীদার আলীকে সাহস দিয়ে গুরু গোবিন্দ তথা গরু গাভীন ঠাকুর নিজের পথ ধরলেন।

'ঘোড়ার কি ডিম হয়, হয় কি ডিমের ছানা?

পাগ্‌লা-গারদ কোথায় আছে, নাই বুঝি তা জানা?'

হেলে দুলে গাইতে গাইতে খামারবাড়ির বারান্দায় এসে দাঁড়ালো কেতাব আলী। ঘরের দরজা ভেজানো দেখে সে আপন মনে বললো– নামায পড়ে গিয়ে আবার দেখছি শুয়ে পড়েছে মৌলভী সাহেব। এরপর সে হাঁকতে লাগলো– মৌলভী সাহেব, ও মৌলভী হুজুর, আবার ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি? বেলা আটটা পার হয়ে গেছে, তবু উঠবেন না?

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মৌলভী নূরু মিয়া বললো– কি ব্যাপার কেতাব আলী? এমন সুর ভাঁজ্‌ছো যে! এ আবার কি গান?

কেতাব আলী বললো ঐ ডান্যা-বাঁয়ার গান। সেদিন যে ঢোল এসেছিল, সেই

ঢোলের ডাইনা-বাঁয়া।

ঢোল!

জি, জয়ঢাক। মৌলভী মোহম্মদ তেজারত আলী বিশ্বাস।

আচ্ছা।

তার সাথে যে দুই পাগলা মাদার এসেছিলেন, মানে কেরামত আলী আর জিয়াফত আলী, ঐ দুই পাগলা মাদার গেয়েছিলেন গানটা।

তাই নাকি? আমি তো এসব কিছু জানিনে।

কি করে জানবেন? হুজুরাইনের খাস কামরায় ঘটনা। আপনি তো ওদিকে তখন যান নি।

: ঘটনা। কি ঘটনা?

শাদির কথাবার্তা। ঐ যে বলেছিলাম, শবনম আপামণির আর পড়াশুনা করে কাজ নেই। ঐ জয়ঢাক, মানে তেজারত মিয়া লেখাপড়ার তো ধার ধারে না, ঐ অদ্‌না জয়ঢাকের সাথে আপামণিকে শাদি দেয়ার জন্যে নয়া বেগম সাহেবা, মানে নয়া হুজুরাইন যে উঠে পড়ে লেগেছেন, সেই সব কথাবার্তা।

বলো কি! হুজুরাইন আবার সেই কথা তুলেছেন?

তুলবেন না? বোন্‌পুত যে ছাড়ে না। আর তাছাড়া তাঁর নিজের গরজটাও তো কম নয়।

: নিজের গরজ!

: জি। সেইটেই তো আসল। বুঝেন না?

: থাক। ওসব বুঝে আমার কাজ নেই। আদার বেপারী হয়ে, জাহাজের খবরে আমার কাজ কি? এবার বলো, এত সকালে এত হাঁকাহাকি করছো কেন?

: তলব পড়েছে যে! আপামণি তলব দিয়েছেন। উনি বেরোবেন।

সে কি! পরীক্ষার ফল না বেরোতেই আবার তার ক্লাশ শুরু হলো নাকি?

সেটা তাঁকেই জিজ্ঞাসা করবেন। এখন তৈরি হয়ে গাড়ির কাছে আসুন। আমি যাই। ওদিকে আবার হয়তো আমার তলব পড়ে গেছে।

চলে গেল কেতাব আলী। নূরু মিয়া তৈরী হয়ে গাড়ির কাছে আসতেই বেরিয়ে এলো শবনম সাদিকা। বললো– গুড্! এসেছো?

নূরু মিয়া বললো– জি ম্যাডাম। তা কোথায় যাবেন? মাদরাসায়?

না মাদরাসার তো ফল বেরোইনি। ফল বেরোনোর পর ক্লাশ। আমি আর্ট স্কুলে যাবো।

আর্ট স্কুলে?

হ্যাঁ পরীার জন্যে অনেক দিন সেখানে যাওয়া হয়নি।এদিকে আবার ঘরে বসে থেকে থেকে আমিও হাঁপিয়ে গেছি। তাই বেরোচ্ছি। চলো...।

নূরু মিয়া গাড়িতে উঠে বসলো। গাড়ি ছেড়ে দিলো শবনম সাদিকা।

আর্ট স্কুলে গিয়ে ঘণ্টা দুই আড়াই আর্ট শেখার পর ফের গাড়ির কাছে ফিরে এলো শবনম সাদিকা। বরাবরের মতো নূরু মিয়া গাড়ি পাহারা দিয়ে নিয়ে গাড়িতেই বসেছিল। শবনম সাদিকা উঠে গাড়িতে ষ্টার্ট দিলো এবং বাড়ির দিকে রওনা হলো।

অনেকখানি রাস্তা সে বিনে ঝঞ্ঝাটেই এলো। কিন্তু লোকালয় ছেড়ে একটা ফাঁকা জায়গাতে আসামাত্র শুরু হলো মুসিবত। বিশ-পচিশজন লোক রাস্তায় গাছের মোটা ডাল ফেলে আটকিয়ে দিলো গাড়ি আর ঘিরে দাঁড়ালো গাড়িটা। গাড়িতে এলোপাথাড়ি কয়েকটা বাড়ি দিয়ে তারা বলতে লাগলো– আয় সুন্দরী, গাড়ি থেকে নেমে আয়! তোকে নিয়ে - কিছুক্ষণ মজাছে ফূর্তি করে আমরা ছেড়ে দেবো তোকে। জানে মারবো না। আয়, নেমে আয়...।

শবনম সাদিকা সক্রোধে বললো– খবরদার বদমায়েশের দল! খবরদার বাজে কথা বলবে না!

ক্ষেপে গেল দুর্বৃত্তরা। তারা হুংকার দিয়ে বললো– তবে রে শালী! ভালোয় ভালোয় নেমে না এলে গাড়ি ভেঙ্গে তোকে টেনে নামাবো আর সবাই মিলে তোকে নিয়ে আচ্ছামতো ফূর্তি করার পর এখানেই পুঁতে রেখে যাবো।

এতক্ষণ নীরব ছিল নূরু মিয়া। এবার সে গর্জে উঠে বললো– হুঁশিয়ার জানোয়ারের দল! প্রাণে যদি বাঁচতে চাও, পালাও এখনই এখান থেকে।

এই দুর্বৃত্তদের মধ্যে ষষ্ঠীতলার জমিদার দীদার আলীর ছেলে বাহাদুর আলও ছিল। সবাইকে উদ্দেশ্য করে বাহাদুর আলী বললো– এই সেই চাকরটা। এই ব্যাটাই সেবার আমাকে মেরে অজ্ঞান করে দিয়েছিল। এই ব্যাটাকেই সবাই আগে ফাটাও। ফাটিয়ে শুধু কাপড় চোপড় নষ্ট করাই নয়, শালাকে একদম যমের বাড়ি পাঠিয়ে দাও।

বইঘর.কম ও রেকিন

নূরু মিয়া বললো– তবে রে উল্লুক! তুমি এদের ডেকে এনেছো? বাঁচতে চাও তো এই মুহূর্তেই এদের নিয়ে পালাও। নইলে সবাইকে তোমাদের আজরাইলের হাতে তুলে দেবো।

এবার দুর্বৃত্তেরা সবাই একজোটে চিৎকার করে বলে উঠলো ভাং গাড়ি। গাড়ি ভেংগে দুটোকেই টেনে বের করবো। একটাকে এখন পুঁতে ফেলবো, আর একটাকে নিয়ে সবাই আচ্ছামতো ফুর্তি করার পর যমের বাড়ি পাঠিয়ে দেবো। ভাং...।

বলে সবাই গাড়িতে দমাদম বাড়ি মারতে লাগলো। 'তবে রে খাটাশের দল' বলে আওয়াজ দিয়েই পাকা বাঁশের গিট্ তোলা শক্ত লাঠি হাতে নিয়ে নূরু মিয়া লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নামতে লাগলো। তা দেখে শবনম সাদিকা সভয়ে বলে উঠলো– নেমো না নূরু মিয়া, নেমোনা। ওরা তোমাকে মেরে ফেলবে।

নূরু মিয়া বললো– ভয় নেই ম্যাডাম। চুপ করে বসে থাকলেই বরং বেঘোরে মারা পড়বো। তার চেয়ে যদি মরতেই হয় ঐ শয়তানদের মেরে তবে মরবো।

নূরু মিয়া একাই জমি দখল করতে আসা তিন চারশো লোককে মেরে দুরমুশ্ করা লাঠিয়াল। বিশ-পঁচিশ জন লোককে পরোয়া কি তার। হুংকার দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে এসে সে এমনভাবে লাঠি চালাতে লাগলো যে, দুর্বৃত্তেরা কিছু বুঝে উঠার আগেই ফটাফট্ ফেটে গেল কয়েকজনের মাথা। নূরু মিয়া এমন উস্তাদী কায়দায় লাঠিতে একটা করে পাক দিয়ে দিয়ে লাঠি চালাতে লাগলো যে সেই পাকের সাথে সাথে অনেকের হাত থেকে লাঠি ছিট্কে গিয়ে অনেক দূরে পড়তে লাগলো। নূরু মিয়ার ঐ ঘুরন্ত লাঠির বেড়া ভেদ করে দুশমনদের একখানা লাঠিও নূরু মিয়াকে স্পর্শ করতে পারলো না। ফল দাঁড়ালো মারাত্মক। নূরু মিয়ার লাঠির ঘায়ে দুশমনদের অনেকের মাথা ফেটে গেল আর হাত পাগুলো ভেংগে চুরমার হয়ে গেল। জমিনে লুটিয়ে পড়লো তারা। আর দেরী করলে মৃত্যু নিশ্চিত বুঝতে পেরে এই লুটিয়ে পড়া দুশমনেরা জমিন থেকে কোন মতে উঠে হামাগুড়ি দিয়ে পালিয়ে যেতে লাগলো। অর্ধেকের বেশী লোককে ঐ অবস্থায় পালিয়ে যেতে দেখে বাদবাকী লোকেরাও নূরু মিয়ার লাঠির ঘা খেতে খেতে পড়িমরি দৌড় দিয়ে পালালো।

পালাতে পারলো না বাহাদুর আলী। পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেও সে নূরু

মিয়ার লাঠির ঘায়ে পড়ে গেল জমিনে। এইটেই মূল লোক বিবেচনায় নূরু মিয়া তার উপর এমন লাঠি চালালো যে শুধু কাপড় চোপড় নষ্ট করা বা অজ্ঞান হয়ে যাওয়াই নয়, খুলে গেল তার হাত-পায়ের জোড়া হাড়। সে মিশে গেল মটির সাথে। খবর পেয়ে ষষ্ঠীতলার জমিদার দীদার আলী শাহ 'ওরে আমার বাহাদুর আলী রে,' বলে আর্তনাদ করতে করতে বাহাদুর আলীর কাছে এসে দেখলো প্রাণটা তার আছে বটে, তবে উঠে দাঁড়ানোর শক্তি এক রত্তিও নেই। ফলে প্রাণ প্রিয় পুত্রকে ঝোলায় করে ঘরে নিতে হলো গরু গাভীন ঠাকুরের পরামর্শ শোনা দীদার আলী শাহ্‌কে।

দীদার আলীর আগমনটা অবশ্য একটু পরের ঘটনা। সে যা-ই হোক, শয়তানেরা সব পালিয়ে যাওয়ার পর নূরু মিয়া ফিরে এসে দেখলো, ভয়ে-বিস্ময়ে সংবিতহীনের মতো ড্রাইভিং সিটে নিশ্চল হয়ে বসে আছে শবনম সাদিকা। গাড়ি চালোনোর মতো সংবিত তার খুব একটা নেই। তা দেখে সে শবনম সাদিকাকে বললো– ঐ পেছনের সিটে গিয়ে বসুন ম্যাডাম। গাড়িটা আমি চালিয়ে যাই।

অর্ধ চৈতন্য অবস্থায় শবনম সাদিকা বললো– কৈ কি বললে?

নূরু মিয়া বললো– আপনি পেছনে গিয়ে বসুন। গাড়িটা আমি চালাই।

সংবিত পুরোপুরি ফিরে এলে শবনম সাদিকা শশব্যস্তে বললো– তুমি? তোমার হাত মাথা ফাটেনি!

না ম্যাডাম, আল্লাহর রহমে একটুও না।

সে কি? এত লোকে ঘিরে ধরলো!

এত আর কৈ ম্যাডাম! মাত্র বিশ-পচিশজন লোক। তিন চার শো তো নয়। মানে।

তিন-চারশোকে সামলানোর অভিজ্ঞতা আছে আমার। এ কয়জনকে সামলাতে বেগ পেতে হবে কেন?

: নূরু মিয়া!

ম্যাডাম।

: তুমি কি মানুষ, না অশরীরি কিছু?

নূরু মিয়া হেসে বললো– শরীরি অশরীরি ওসব বুঝিনে ম্যাডাম। আল্লাহ তায়ালার রহম আছে আমার উপর, শুধু এইটুকু বুঝি।

বইঘর.কম

তাজ্জব! আমাকে যে বার বার তাজ্জব করছো তুমি!

তা যা করি, করি। এবার সিট ছেড়ে দিয়ে বসুন ম্যাডাম। আমি গাড়ি ষ্টার্ট দিই।

শবনম সাদিকা ছেড়ে দিলো ড্রাইভিং সিট। নূরু মিয়া সেখানে বসে ছেড়ে দিলো গাড়ি।

বাড়িতে এসে শবনম সাদিকা তার আব্বাকে এ ঘটনার কথা বললে, তাজ্জব হয়ে গেলেন জমিদার খান বাহাদুর সাহেবও। কিছুক্ষণ নীরব হয়ে থাকার পর তিনি প্রীতি কণ্ঠে বললেন– ছেলেটার প্রশংসা করার আমার কোন ভাষা নেই। আসলেই ও একটা ক্ষণজন্মা পুরুষ।

এদিকে ছেলেকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার আর তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করার পর দীদার আলী শাহ তার হুজুর গরু গাভী ঠাকুরকে নিয়ে বসলেন। হুজুরের কাছে এসেই দীদার আলী অভিযোগ করে বললেন– একি পরামর্শ দিলেন হুজুর! আমার ছেলেটা যে এখন যায়!

গরু গাভীন ঠাকুর বললেন– যায় মানে?

দীদার আলী শাহ বললেন– মানে যমালয়ে যায় হুজুর। এবার আর তার বাঁচার আশা নেই।

নেই মানে? কি হয়েছে?

আপনার কথায় শক্ত মরদের দক্ষিণ দুয়ারী ঘর দেখতে গিয়ে আমার মাথায় বাড়ি হয়েছে।

অর্থাৎ?

আমার বাহাদুর আলীকে সাথে নিয়ে গিয়ে বিশ-পঁচিশজন লোক ঐ মেয়েটার উপর যথারীতি চড়াও হলো। কিন্তু এক পলকও গেল না হুজুর! এক পলকও টিকতে পারলো না তারা। ওদের ঐ চাকরটার মারে হাত পা ভেংগে নিয়ে অন্যেরা সবাই কোনমতে পালিয়ে এলো বটে, কিন্তু আমার বাহাদুর আলী আর পালিয়ে আসতে পারলো না। ওখানেই সে মটির সাথে মিশে পড়ে রইলো।

বলো কি! তারপর?

: তার পর আর কি হুজুর! তাকে ঝোলায় করে বাড়ি আনতে হলো।

বইঘর.কম ও রোকন

সে কি! একা ঐ চাকরটা... ।

যমদূত হুজুর, যমদূত । একাই সে সবাইকে মেরে তক্তা বানিয়ে দিলো ।

তাজ্জব!

বেকায়দায় পড়ে কোথায় খান বাহাদুর আমার ছেলের সাথে তাঁর মেয়ের বিয়ে দেবেন, তার জমিদারী আমার হাতে আসবে, আর সেখানে কোথায় আমার ছেলেই এখন ফুরিয়ে যাচ্ছে। আর দুটো দিনও সে আছে– এমন আশা একবিন্দুও নেই ।

বড় সাংঘাতিক কথা!

এর একটা বিহিত করুন হুজুর । আপনার মহাপ্রভু হিজ্ এক্সেলেন্সীকে বলে এর একটা বিহিত করুন ।

গরু গাভীন চমকে উঠে বললেন– ওরে বাপ্রে! সে কথা বললে হিজ্ এক্সেলেন্সী সঙ্গে সঙ্গে আমাকেই শুট্ করবে ।

দীদার আলী বললেন– কেন কেন?

গরু গাভীন বললেন– তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার তারা দেখবে । কোন খুন খারাবী হওয়া ছাড়া হিজ এক্সেলেন্সী ওদিকে নজর দেবেন না । সেখানে এখান থেকে লোক গিয়ে তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হাত দেয়া, তাদের উপর চড়াও হওয়া, হামলা করা, মারতে গিয়ে মার খেয়ে আসা– এসব কথা শুনলে হিজ্ এক্সেলেন্সী শুধু আমাকেই নয়, তোমাকেও সরাসরি শুট্ করবেন । গুলির পর গুলি করবেন ।

হুজুর!

www.boighar.com

কাটা কান চুল দিয়ে ঢেকে থাকা ছাড়া আর উপায় নেই । এ নিয়ে উচ্চবাচ্য করলে ছেলে তোমার যমের বাড়ি পাক আর না পাক, তার আগেই আমাদের যমের বাড়ি পেতে হবে ।

সেকি? তাহলে খামাখা দক্ষিণ দুয়ারী ঘরের পরামর্শ দিলেন কেন হুজুর!

দিয়েছিলাম শক্ত মরদ ভেবে। তোমার ছেলে আর তোমার পাঠানো লোকেরা যে মরদ তো নয়ই মানুষও নয়, সবাই একদম নিংটি ইঁদুর । তা কি আর কল্পনা করতে পেরেছি?

হুজুর!

ভাগো-ভাগো। নিজে বাঁচলে বাপের নাম। তোমার কথায় হিজ এক্সেলেন্সীর কাছে গিয়ে নিজের জানটা হারাবো নাকি? বিদেয় হও- বিদেয় হও, এক্ষুণি বিদেয় হও!

দেখা পাওয়ার জন্যে কয়েকবার এসে শেষবারে নুরু মিয়ার দেখা পেয়ে কেতাব আলী কলকণ্ঠে বলে উঠলো– চমকে গেছে, দশদিক একদম চমকে গেছে? বাপ্‌রে বাপ্‌রে বাপ! আপনি একি মানুষ' মৌলভী হুজুর! আপনি একজন নামায পড়ানো মৌলভী। সেই আপনার হাতে লাঠি! আর সে লাঠি কামান বন্দুকের বাড়া! সাব্বাশ হুজুর, সাব্বাশ!

খুশীতে কেতাব আলী হাত পা ছুড়তে লাগলো। তা দেখে নূরু মিয়া বললো– কি হলো কেতাব আলী? তুমি এমন করছো কেন?

কেতাব আলী বললো– এমন করছি মানে? কি করছি?

নূরু মিয়া বললো– এমন হাত, পা ছুড়্ছো কেন?

ছুড়্বো না? এর পরও কি মানুষ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে হুজুর? অন্য কেউ হলে তো আনন্দে নাচতে শুরু করতো। আমি তো নাচতে শুরু করিনি।

: তাই? তা এত আনন্দ কেন?

সারা দুনিয়া চমকিয়ে দিলেন আপনি, আর বলছেন এত আনন্দ কেন? ওরে বাপরে! এক পাল লোক। একাই আপনি সবাইকে পিটে ফেলাট্ করে দিলেন। আপনার ভয়ে তো এখন অনেক লোক কাঁপতে শুরু করেছে।

কেন, অনেকের এখানে কাঁপার কি এলো?

আসবে না? জানটা যদি নাও যায়, কাপড় চোপড় তো জরুর নষ্ট হয়ে যাবে।

তাজ্জব! কি আবোল তাবোল বকছো?

হুজুর!

জানটা যদি নাও যায় মানে? কার কথা বলছো।

ঐ তেজারত আলীর কথা। নয়া হুজুরাইনের বোনপুত ঐ জয়ঢাকের কথা

বলছি। আপনার কথায় তার এখন বাড়িতেই কাপড় চোপড় নষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়ে উঠেছে।

কেন কেন? তার আবার কি হলো?

এখানে সে এসেছিল, কিন্তু আপনার পাল্লায় পড়েনি। শবনম আপামণির ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে তাঁকে শাদি করতে চাচ্ছে। আপামণি যদি এখন সে কথা আপনাকে বলে দেয় আর আপনি যদি ক্ষেপে যান– এই ভয়ে হুজুরাইনের বোনপুত এখন ঢোকে ঢোকে পানি খাচ্ছে।

কে বললে সে কথা? মানে, তুমি কার কাছে তা শুনলে?

জেয়াফত আলীর কাছে। ঐ পাগলা মাদার। জিয়াফত আলী গত পরশু এসেছিল। আপনার ঐ বাহাদুরীর কথা শুনে সে আনন্দে ছুটে এসেছিল এই কথা বলতে। আপামণিকেই বলতে এসেছিল। কিন্তু আপামণির হদিস্ করতে না পেরে সে আমাকেই বলে গেছে কথাগুলো।

তাই?

জি। বললো– আপামণিকে জোর করে শাদি করতে চাইলে আপামণি যেন সে কথা আপনাকে বলে দেয়। চোখ গরম করে আপনি একবার ঐ তেজারত মিয়ার দিকে তাকালেই নাকি তার পায়জামার ফিতা ছিঁড়ে যাবে। শাদির আশা ত্যাগ করে সে তখনই বাড়ির দিকে দৌড় দেবে পায়জামার ফিতা এক হাতে ধরে নিয়ে।

নূরু মিয়া ঈষৎ হেসে বললো– সে কি! এ ব্যাপারে জিয়ারত আলীর এত আগ্রহ যে! হেতু কি?

রাগে হুজুর, রাগে। জিয়াফত আলীকে তেজারত আলী বিশ্বাস একদিন মেরেছিল যে!

মেরেছিল! কেন কেন?

জিয়াফত আলী তো তেজারত আলীর আপন ফুফাতো ভাই নয়। তেজারত আলীর বাপের, মানে আমাদের হুজুরাইন গুলজাহান বানু বেগমের বোন, নূরজাহান বানু বেগমের স্বামীর নিজের বোনের ছেলে নয়। তাঁর নিজের বোনের ছেলে ঐ কেরামত আলী। জিয়াফত আলী দূর সম্পর্কের বোনের ছেলে।

তাতে কি হয়েছে?

হয়েছে মানে, জিয়াফত আলী তেজারত আলীদের বাড়িতে এসেছিল তেজারত আলীর বিরুদ্ধে তেজারত আলীর বাপের কাছে নালিশ করতে। তাকে আর কেরামত আলীকে তেজারত আলী যে আমাদের ফটকের ঘুন্টি ঘরে তুলে তালা বন্ধ করে রেখেছিল সেই নালিশ করতে। তেজারত আলীর বাপ এ কথা শুনে তেজারত আলীকে কিছু বকাবকি করে। সেই রাগে তেজারত আলী জিয়াফত আলীকে একা পেয়ে মারধোর করে।

একা পেয়ে মানে?

মানে, বলে তো জিয়াফত আলীকে এঁটে ওঠার সাধ্য তেজারত আলীর নেই। অঢেল খাবার পেয়ে খেয়ে খেয়ে শরীরটাই শুধু ভূষির বস্তার মতো, মানে জয় ঢাকের মতো ফুলিয়ে তুলেছে, কিন্তু আসলেই একটা খোস্কা কাঠের ঢেকি। ভেতরে বস্তু কিছু নেই। তাই তাদের বাড়িতে এলে তাকে একা পেয়ে বাড়ির চাকর বাকর ডেকে নিয়ে তেজারত আলী জিয়াফত আলীকে মারে।

: তাই নাকি?

জি মৌলভী সাহেব। সেই রাগে জিয়াফত আলী চায়, শবনম আপামণির সাথে তেজারত আলীর শাদি না হোক।

: আচ্ছা!

শবনম আপামণির শাদি অন্য আর যার সাথেই হোক, ঐ জয়ঢাক, মানে তেজারত আলী, বিশ্বাসের সাথে না হোক– এইটেই জিয়াফত আলী চায়। সে চায়, তেজারত আলীর দাপট এ বাড়ি থেকে উঠে যাক। এই খান বাহাদুর সাহেবের বাড়ি তার জন্যে হারাম হোক।

: তাজ্জব!

আপনার ভয়ে তেজারত এমনিতেই এখন লোটা লোটা পানি খাচ্ছে, এর উপর শবনম আপামণি যদি আপনার কাছে নালিশ করে বসে, তাহলে আর জীবনেও এ বাড়ির দিকে পা বাড়াবে না।

বলো কি! ষষ্ঠীতলার ঐ হামলাকারীদের দূরবস্থার কথা শুনে ও এতটাই ভয় পেয়ে গেছে?

তাই-ই গেছে মৌলভী সাহেব। আর শুধু তেজারত আলী কেন? আপনার নামে তো এখন অনেক লোক আতংকিত হয়ে উঠছে। কখন যে কার ঘাড়ের উপর পড়েন গিয়ে আপনি, সেই ভয়েই সবাই এখন অস্থির।

কেন, আমি কি বাঘ?

শুধুই ভাগ! একদম রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার।

ওরে বাবা? তুমি আবার ইংরেজীও জানো দেখছি। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার এ কথাও বোঝো?

বুঝবো না কেন? এটা তো ইংরেজী নয়, বাংলা। দেশের তাতাম লোক মানে কিষাণ-মজুর সবাই এটা বুঝে আর সবাই এটা বলে।

ও আচ্ছা। তা যে যা-ই বলুক, আমি কিন্তু বাঘ ভালুক নই। আমি একজন মানুষ আর আল্লাহভক্ত ঈমানদার মানুষ। আমি জন্তু জানোয়ার হতে যাবো কেন?

না না, তা হবেন কেন? লোকে ঐ সব ভয়ংকর জীব-জন্তুর সাথে আপনার তুলনা করে। তাই বলে কি আপনি জন্তু-জানোয়ার?

তবে? তা ওসব কথা থাক। তুমি কি কেবল আমার তারিফ করার জন্যেই এখানে এসেছো? না অন্য কোন কথা আছে?

আছে-আছে। সে কথা তো আপনাকে বলাই হয়নি। এই খামার বাড়ির পাট আপনার উঠলো। মানে, উঠে গেল।

কি রকম কি রকম?

একটা যাত্রা পালা শুনেছিলাম। পালার নাম চাষার ছেলে। ছেলের বাপের সেখানে একটা গান আছে– 'কোন্ শালা আর চাষা বলে, বাসা আমার রাজপুরীতে।' আপনার ব্যাপারটাও এখন ঐ রকম। আপনার বাসা এখন রাজপ্রাসাদে।

অর্থাৎ?

আপামণির হুকুম– এখন থেকে আপনি জমিদার বাড়ির অন্দর মহলের একটা পৃথক কক্ষে থাকবেন। এই পাইট কিষাণের খামার বাড়িতে নয়। এ নির্দেশ জমিদার বাহাদুরেরও। আপনার মতো লোককে আর কিছুতেই এত অসম্মান করা যায় না।

নূরু মিয়া গম্ভীরকণ্ঠে বললো– বটে!

কেতাব আলী বললো– মানে?

ফকির টাটু ঘোড়া করবে কি?

সে কি! টাটু ঘোড়া কেন?

পান্তাভাতের পেটে পোলাও কোর্মা সয় না।

বললেই হলো? আপামণি আর খোদ হুজুর এই সিদ্ধান্তই নিয়েছেন। একদম ফাইন্যাল।

: তা তাঁরা নিতেই পারেন। কিন্তু আমারও তো একটা মতামত আছে।

তার মানে? আপনি যাবেন না অন্দর মহলের বাসায়?

না, এই বরং ভাল আছি। স্বচ্ছন্দে আছি।

মৌলভী সাহেব!

ওখানে গেলে আমি বরং অস্বস্তি বোধ করবো। খাচার পাখি হয়ে যাবো।

: হুজুর!

খাচার পাখির থেকে বনের পাখি অনেক বেশী সুখী। অনেক বেশী স্বাধীন। বন্দি হতে কে চায়!

তার মানে আপনার ইচ্ছা মতো চলাফেরা–

: ব্যাহত হয়ে যাবে। কি দরকার খামাখা ঝামেলা বাড়ানোর?

এই সময় সেখানে এলো শবনম সাদিকা। হাসিমুখে বললে– কার আবার কি ঝামেলা বাড়লো কেতাব আলী?

কেতাব আলী বললো– এই মৌলভী হুজুরের। উনি ও ঘরে যাবেন না।

সে কি। যাবেন না কেন?

নূরু মিয়া বললো– আমার ভাল লাগবে না ম্যাডাম।

শবনম সাদিকা বললো– আমি চাইছি, তুমি অন্দরের একটা ভাল কক্ষে যাও, তবু ভাল লাগবে না তোমার?

: না ম্যাডাম।

আমার ইচ্ছার প্রতি কোন দরদই নেই তোমার?

আপনার নিজের ব্যাপার হলে অবশ্যই দরদ থাকতো ম্যাডাম। এটা তো ম্যাডামের নিজের বিষয় নয়। আমার থাকা-শোয়ার ব্যাপার।

: আমার আব্বাজানও চান এটা। তবু তুমি...।

জোর করলে আমি নিরুপায়। তাঁর আদেশ মানতেই হবে আমাকে।

বইঘর.কম ও রোকন

কিন্তু অন্যের অস্বস্তি বাড়ানার জন্যে উনি জোর করবেন কেন?

অস্বস্তি। কিসের অস্বস্তি?

সাদামাটা জায়গায় থাকা-শোয়া মানুষ আমি। ভাল জায়গা থাকার আর ভাল খাটে শোয়ায় অভ্যস্ত নই। অস্বস্তি বোধ তো হবেই।

সেটা দু'চারদিনের ব্যাপার। জানোতো মানুষ অভ্যাসের দাস। দু'চার দিনে অভ্যাস হয়ে যাবে।

তবু আমাকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে যেতেই হবে ম্যাডাম?

নিয়ন্ত্রণ মানে? যেভাবে থাকলে তুমি স্বাচ্ছন্দ বোধ করবে, সে ভাবেই তোমাকে রাখা হবে। চাও যদি একেবারেই বাইরের কোন ফটকের দিকে কক্ষ দেয়া হবে তোমাকে। যখন ইচ্ছে বেরিয়ে আসবে, যখন ইচ্ছে ভেতরে যাবে। সব তোমার ইচ্ছাধীন। সে জন্যে কারো অনুমতি নিতে হবে না তোমাকে। এখানে যেমন স্বাধীনভাবে আছো, ওখানেও সেই রকম স্বাধীনভাবে থাকবে।

নূরু মিয়া হেসে বললো– তা হলে অবশ্য হতে পারে ম্যাডাম। তাহলে আমার কোন আপত্তি নেই।

শবনম সাদিকা খুশী হয়ে বললো– গুড্। এইটেই তো তোমার কাছে চাই আমি।

ম্যাডাম!

আমি যাই। তোমার পছন্দ হয় এমন একটা কক্ষ বেছে বের করিগে। পরে এসে তোমাকে নিয়ে যাবো।

চলে গেল শবনম সাদিকা। কেতাব আলীর দিকে চেয়ে নূরু মিয়া হেসে বললো– কি নাছোড় পিন্ডে মানুষরে বাবা!

কেতাব আলীও হেসে বললো– কোম্‌লা ছোড়েগা তো কুম্‌শী নেহি ছোড়েগা, হুজুর!

নূরু মিয়া নারাজকণ্ঠে বললো– আরে এই এই, এমন মন্তব্য করতে নেই।

'কৈ, কেতাব আলী কোথায়? কেতাব আলী...'

দুমদাম পদক্ষেপে সেখানে এসে হাজির হলেন নয়া হুজুরাইন গুলজাহান বানু বেগম। কেতাব আলীর উপর নজর পড়তেই তিনি রোষভরে বললেন– এই

যে, তা জিয়াফত আলী আমার কোন বাঁ-পায়ের কুটুম যে তাকে তুমি জিয়াফত দিয়ে এনেছো?

কেতাব আলী সবিস্ময়ে বললো– জিয়াফত দিয়ে এনেছি! সেকি হুজুরাইন!

জরুর জিয়াফত দিয়ে এনেছো। নইলে ঐ আপদ তোমার কাছে আসবে কেন? আমার কাছে এলে তো আমি ওর ঠ্যাং ভেঙ্গে দিতাম।

তা - মানে?

তুমি ভেবেছো, আমার কানে পড়বে না কিছু! তোমাদের মতো বেঈমান চাকর-নফর ছাড়াও যে আমার আরো অনেক বিশ্বাসী লোক আছে, তা জানো না?

হুজুরাইন!

শয়তানটার এত বড় স্পর্ধা যে আমার বোনপুত তেজারত আলীকে ভয় দেখায়? শবনম সাদিকার সাথে আমার তেজারত আলীর শাদি হবে না তো, কোন আবাগীর বেটার সাথে হবে, হোক দেখি? সেই আবাগীর পুতের হাড় আমি চুর করে দেয়ার ব্যবস্থা করবো না? আমার বোনপুত ছাড়া অন্য এক হাড় হাভাতে এখানে জামাই হয়ে থাকবে, এতটাই আশা? ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেবো না? লাঠিপেটা করে এ বাড়ি থেকে নামিয়ে দেবো না?

নিজের মনে কিছুক্ষণ গজর গজর করে চলে যেতে যেতে গুলজাহান বানু বেগম সাহেবা নূরু মিয়ার দিকে আড় চোখে তাকিয়ে বললেন– শবনম নালিশ করলেই আমার বোনপুতের গায়ে হাত দেয় কোন্ ল্যাংখাকীর বেটা, সেটাও আমি দেখবো! আমারই খাবে আর আমারই বুকে বসে চোখের ভ্রূ উপড়াবে?

মৌলভী নূরু মিয়া এখন জমিদার বাড়ির অন্দর মহলে থাকে। যে রকম অবস্থানে থাকলে তার স্বাচ্ছন্দ বজায় থাকবে, সেই রকম অবস্থানে দেয়ায়, নূরু মিয়া বেশ স্বস্তির সাথেই অন্দর মহলে আছে এখন। তার স্বাচ্ছন্দ বিধানেও নিয়োজিত আছে এখন অনেকেই। কেতাব আলী আর পরীর মা তো সব সময় তার খেদমতে আছেই, তার উপর শবনম সাদিকাও মাঝে মাঝেই এসে সে সব খোঁজ খবর নিচ্ছে।

এদিকে, বাড়ির একজন চাকর কামলাকে এনে অন্দর মহলে স্থান দেয়ায়, হিংষেয় জ্বলে পুড়ে মরছেন বাড়ির নয়া মালেকা গুলজাহান বানু বেগম। তার বোনপুত এসে যে অন্দর মহলে স্থান পায়, সেই অন্দর মহলে স্থান পেয়েছে নূরু মিয়ার মতো একজন ভবঘুরে, পথের মানুষ। নয়া বিবি এটা হজম করতে পারছেন না। তার উপর শুধুই কি স্থান পাওয়া, ঐ পথের মানুষের সেকি তদবির আর সেবা-যত্ন। অথচ তার বোনপুত তেজারত আলী বিশ্বাসের বেলায় মানে একজন মস্তবড় তেজারতদারের বেলায়, একমাত্র নয়া বিবি নিজে ছাড়া চাকর-চাকরানীরা কেউ ভুলেও তার খেদমতে আসে না। এতটা বোনপুতের খালা সহ্য করেন কি করে?

জমিদার খান বাহাদুর কয়েকদিনের জন্যে বাইরে গেছেন, তাই কিছু করতে পারছেন না বেগম সাহেবা। জমিদার সাহেব ফিরে এলেই এই আদিখ্যেতা খাটো করবেন তিনি, এই অপেক্ষায় দুই বেলা ভেতর বাহির করতে লাগলেন।

জমিদার সাহেব বাইরে যাওয়ায় এদিকে আর এক মস্ত বিপদ দেখা দিলো। জমিদার সাহেবের ম্যানেজার কোরবান আলী মিয়া তার দপ্তরে বসে কাগজপত্রের কাজ করছিলেন। এই সময় একজন আগন্তুক হন্ত দন্ত হয়ে তাঁর দপ্তরে এসে হাজির হলেন। তাঁকে দেখে ম্যানেজার সাহেব সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন– আরে আরে! তুমি, মানে আপনি কে?

আগন্তুক বললেন– আমি জমিদার খান বাহাদুর সাহেবের বোনের বাড়ি থেকে আসছি।

এ কথায় ম্যানেজার সাহেব উদগ্রীব হয়ে প্রশ্ন করলেন– বোনের বাড়ি থেকে মানে? কোন্ বোনের বাড়ি থেকে?

বোন তো উনার একটাই। অনেক দূরে, মানে পাশের জেলার এক মহকুমা শহরে যাঁর শাদি হয়েছে, সেই বোনের বাড়ি থেকে। উনার নিজের বোন।

ম্যানেজার সাহেব তটস্থ হয়ে উঠলেন। বসার একটা আসন টেনে দিয়ে ব্যস্তকণ্ঠে বললেন– বসুন বসুন। তা কি খবর সেখানকার?

বসতে বসতে আগন্তুক বললেন– খবর খুব খারাপ। খান বাহাদুর সাহেব কোথায়?

উনি তো নেই। কয়েকদিনের জন্য উনি কি এক কাজে অনেক দূরে গেছেন।

সর্বনাশ! তাহলে উপায়?

উপায় মানে? কি হয়েছে?

উনার বোন মৃত্যু শয্যায়। বলা যায়, মারা গেছেন। কোন মতে ক্ষীণ একটা শ্বাস আসা-যাওয়া করছে মাত্র। যে কোন সময় ও শ্বাসটুকুও থেমে যাবে। জবান তো আগের দিন থেকেই বন্ধ হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে কি যে হলো, কে জানে!

সে কি- সে কি! কি হয়েছিল?

: মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন! ব্যস্! ওতেই এসব কাণ্ড।

বলেন কি!

আর কি বলবো! বুড়ো মানুষ। খান বাহাদুর সাহেবের চার পাঁচ বছরের বড়। খান বাহাদুর সাহেবকে উনিই কোলে পিঠে করে মানুষ করেছেন। এই বুড়ো মানুষ হঠাৎ পড়ে গেলেন তো গেলেন আর উঠলেন না। জবান বন্ধ, নিঃশ্বাসও যাই-আসি করতে দেখে এসেছি। এর মধ্যে হয়তো চলেই গেছেন। উনাকে দেখতে হলে এখনই সেখানে যেতে হবে।

সেকি! তাহলে-তাহলে! হুজুর নেই, এখন কি করি?

শুধু তাহলে তাহলে কবলেই হবে? হুজুর যখন নেই তখন তো কাউকে না কাউকে এখনই যেতে হবে। আপন ভাইয়ের বাড়ি। এখান থেকে কোন কেউই না গেলে চলবে কেন? যেতেই হবে।

হ্যাঁ-হ্যাঁ, যেতে তো হবেই। কিন্তু কে যায়। হুজুরের তো একটা মাত্র মেয়ে ছাড়া আর কোন ছেলে মেয়ে নেই। কাকে পাঠাই!

তাকেই পাঠান। না হয় আপনি তো শুনলাম হুজুরের বিশ্বস্ত ম্যানেজার। আপনিই চলুন।

হ্যাঁ-হ্যাঁ, যেতেই হবে। কাউকে যেতেই হবে। দেখি কি করি- বলেই তিনি ডাকতে লাগলেন- কেতাব আলী, কেতাব আলী, শিগগির শবনম আম্মাজানকে পাঠাও তো!

www.boighar.com

ডাক শুনে শবনম সাদিকাই ছুটে এলো। এসে বললো- কি হয়েছে চাচা? এত ব্যস্তভাবে ডাকছেন কেন?

ম্যানেজার সাহেব কম্পিতকণ্ঠে বললেন- সর্বনাশ হয়ে গেছে আম্মাজান। তোমার ফুফু বোধ হয় আর নেই!

শবনম সাদিকা আর্তনাদ করে উঠলো বললো- সে কি! একি বলছেন! বলে মুখ তুলে চাইতেই আগন্তুককে দেখতে পেলো শবনম সাদিকা। দেখেই সে চমকে উঠে বললো- একি, সোবহান চাচা! আপনি?

ম্যানেজার সাহেব বললেন- তুমি একে চিনো আম্মাজান?

চিনবো না কেন? ফুফুর বাড়িতে থাকেন। সম্পর্কেও আমার ফুফার অনেকখানি আপন ভাই।

: তাই?

: জি চাচা। তা কি খবর চাচা?

: খুব খারাপ খবর আম্মাজান। তোমার ফুফু বোধ হয় আর নেই।

শবনম সাদিকা ফের আর্তনাদ করে উঠে বললো- চাচা!

ম্যানেজার সাহেব সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে বললেন- একজন কাউকে এখনই সেখানে যেতে হবে। আমি গেলেও চলতো। কিন্তু আমি তো গাড়ি চালাতে জানিনে। ড্রাইভার মমতাজ শেখকে হুজুর নিয়ে গেছেন।

ঘটনা শুনে শবনম সাদিকা শশব্যস্তে বললো- আমি যাবো- আমি যাবো। আপনি যাবেন কি? আব্বাজান নেই। আপনি গেলে বাড়ি একদম অভিভাবকহীন হয়ে যাবে।

হ্যাঁ- হ্যাঁ, সেটাও একটা মস্ত বড় কথা। কিন্তু বহুদূরের রাস্তা। তুমি একা যাবে...

বইঘর.কম ও রোকন

একা কোথায় চাচা? নূরু মিয়া সাথে যাবে। সে সাথে থাকলে কি আর কাউকে লাগে?

: তা ঠিক তা ঠিক। তার উপর সে গাড়ি চালাতেও পারে।

শুধু পারে না, আমার চেয়েও অনেক ভাল পারে। তার সাথে অচল গাড়ি সচল করতেও পারে।

জি-জি। তাহলে এখনই তোমরা রওনা হও।

এখনই রওনা হচ্ছি। আপনি নূরু মিয়াকে খবর দিন।

তা দিচ্ছি। কিন্তু হুজুর বাড়িতে নেই। ওখানে গিয়েই তুমি অবস্থা জানিয়ে আমাদের তার করবে। খবর খারাপ হলে আর হুজুর ইতিমধ্যে ফিরে এলে, তোমার টেলিগ্রাম পেলেই মমতাজ শেখকে নিয়ে উনিও জরুর রওয়ানা হবেন।

ঠিক ঠিক। এখন আপনি পরীর মাকে ডেকে সোবহান চাচার কিছু মুখে দেয়ার ব্যবস্থা করুন আর নূরু মিয়াকে খবর দিন। আমি রেডি হয়ে আসি। সোবহান চাচাও আমাদের সাথে আমাদের গাড়িতেই যাবেন।

অতি সত্বর তিনজন রওনা হলো। সারা রাস্তা সবার এদের বুক টিপ্ টিপ করতে লাগলো। প্রায় পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন মাইল রাস্তা। গিয়ে তাঁরা কি দেখবেন, কে জানে।

রাখে আল্লাহ, মারে কে? ফুফুর বাড়িতে এসেই সকলে খুশীতে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। শবনম সাদিকার ফুফু ইতিমধ্যে একেবারেই সুস্থ হয়ে উঠেছেন। তিনি উঠে বসে সকলের সাথে হেসে হেসে কথা বলছেন। ঘটনা, হঠাৎ পড়ে যাওয়ায় তিনি সাময়িকভাবে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন। সময় মতো ডাক্তার ডাকায় আর উপযুক্ত শুশ্রূষার ফলে, শবনম সাদিকার ফুফুর অসুখ একেবারেই উধাও হয়ে গেছে। তিনি পূর্ববৎ সবল ও স্বাভাবিক হয়ে গেছেন। ফুফুকে দেখে শবনম সাদিকা আর শবনম সাদিকাকে দেখে তার ফুফু আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠলেন। ভাইঝিকে কাছে বসিয়ে ফুফু ভাইঝির চোখ মুখ নেড়ে বাড়ির খবর নিতে লাগলেন। খোশ হালে খবরাখবর আদান প্রদানের পর শবনম সাদিকা তখনই সুসংবাদ জানাতে বাড়িতে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিলো।

দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ফুফুর বাড়িতে আসতেই শবনম সাদিকাদের দিন শেষ হয়ে গিয়েছিল। এই দীর্ঘপথ জার্নির পর শবনম সাদিকাদের যেমন

বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল, সদ্যরোগমুক্তির পর শবনম সাদিকার ফুফুরও তেমনি বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল। তাই, রাতে আর কথা না বাড়িয়ে আহার অন্তে সবাই শয্যা গ্রহণ করলেন।

পরের দিন সকালে ফুফু এবার ভাইঝিকে নিয়ে জোরে-শোরে গল্প-আলাপে বসলেন। আলাপের প্রথমেই তিনি বললেন– সাথে যে ছেলেটাকে এনেছো, সে কেরে আম্মা? বাপরে কি সুন্দর ছেলের চেহারা! রাজপুত্রকে বলে, তুই ওখানে থাক্। এমন সুপুরুষ কালে ভদ্রে দেখা যায়। ছেলেটা কে?

শবনম সাদিকা হেসে বললো– কাজের লোক ফুফু। আমাদের সংসারে থাকে আর আমাদের, বিশেষ করে আমার পাঁচটা কাজে লাগে।

ফুফু ঠুশ্ খেয়ে পড়লেন। হতাশ কণ্ঠে বললেন– হায় আল্লাহ! কাজের লোক! মানে চাকর নফর?

শবনম সাদিকা সঙ্গে সঙ্গে বললো– না ফুফু, চাকর নফর নয়। বেশ মানী লোক। আমাদের বাড়ির যত কাজের লোক আর উড়তি লোক আছে, তাদের সবাইকে সে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ায়। মানে, তাদের নামাজে ইমামতি করে। সেজন্যে সবাই তাকে সম্মান করে।

ও, মৌলভী মানুষ?

: জি ফুফু, তাছাড়া আরো হাজারটা গুণ আছে। একেবারে করিৎকর্মা লোক!

ফুফু ঐ একই রকম বিষণ্নকণ্ঠে বললেন– তা হোক। কিন্তু আমি ভাবলাম এক, হলো আর এক।

ফুফুমণি!

ঐযে একটা কথা আছে না– 'হায়রে চক্ষু গেলু, মানুষ বলে সালাম দিলাম, হাঁড়গিলে গা হলু!' সেই কথার হাল।

কেন ফুফুমণি, এ কথা বলছেন কেন?

বলবো না? দুটিতে যা মানাতো না, চোখ জুড়িয়ে যেতো! কিন্তু ভাবলাম কি, আর হলো কি!

ছিঃ ফুফু! এ সব কি ভাবছো?

ভাবছি, সেরেফ অন্য অপর মানুষ যখন, তখন তাকে সাথে এনেছো কেন?

সে যে আমার সাথেই থাকে।

তোমার সাথে থাকে?

বইঘর.কম ও রোকন

হ্যাঁ, সব সময় তাকে সাথে রাখি আমি।

ওমা, সে কি কথা! ঐ একটা কাম্‌লা কাজের লোককে সব সময় কাছে রাখো তুমি?

সব সময়। যখন যেখানে যাই ওকে সাথে নিয়েই যাই।

ছিঃ ছিঃ একেই বলে মরণ! মন টলেছে বুঝি! যে সুন্দর চেহারা?

শবনম সাদিকা ক্ষুণ্নকণ্ঠে বললো– ফুফুমণি।

ফুফুমণি তাঁর নিজের ভাবেই বললেন– ঐ যে কথায় আছে 'রূপেতে মজিল মন, কিবা হাড়ী, কিবা ডোম' ঐ একটা কাম্‌লা গোছের লোকের হাতেই মান সম্মানটা দিলে আম্মাজান?

কি যে বলেন ফুফু!। ওসব ভাবতে নেই, গুনাহ্ হবে।

মানে?

ফেরেশতা-ফেরেশতা। যাকে নিয়েঐ সব কথা বলছো, সে একজন আসমানী মানুষ। কোন কুচিন্তা-কুপ্রবৃত্তি তার মনে লেশমাত্র নেই।

সে কি! এতটা কি সত্যি?

আপনি তো তাকে দু'চারদিন দেখেন নি ফুফু। দেখলেই বুঝতে পারতেন।

ফুফু ঈষৎ হেসে বললেন– তাই কি? ঠিক আছে, এবার তাহলে দু'চারদিন কেন, দশ-পনের দিন ধরে দেখবো।

তার মানে?

মানেটা পরে বলবো। এবার একটা কথা বলো তো আম্মাজান, বয়সটা তো অনেকখানিই হলো, শাদির ব্যাপারে কি তোমার চিন্তা ভাবনা?

মৃদু হেসে শবনম সাদিকা বললো–আমার চিন্তাভাবনার অপেক্ষা কোথায় ফুফুমণি? চারদিক থেকে সবাই যেভাবে হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ছে, তাতে কে কাকে রুখে!

: কি রকম- কি রকম?

: নানা দিক থেকে নানাজন শাদির প্রস্তাব নিয়ে এন্তার আসতেই আছে।

আসতেই আছে?

আসবে না? বাপের একমাত্র সন্তান আমি। আমাকে হাত করতে পারলে যে বাপের অর্থবিত্তসহ গোটা জমিদারীটাই হাতে পারে তারা। কাজেই ছেলে তাদের যত অপদার্থই হোক, জমিদার, জোতদার, বিত্তবান- সবাই তাদের

ছেলের সাথে আমার শাদি দিয়ে আমার বাপের জমিদারীটা হাত করতে উঠে পড়ে লেগেছে।

বলো কি?

নানা রকম ধাক্কা খেয়ে এক্ষণে অনেকেই কিছুটা থেমে থাকলেও একজন একেবারে আদাপানি খেয়ে সে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। জমিদারীটাসহ আব্বার সব কিছু তার চাই-ই।

ওমা! কে সে?

: আমার বিমাতা। আমার আব্বার দ্বিতীয় স্ত্রী।

তাই? হ্যাঁ-হ্যাঁ, তা হবে- তা হবে তোমার আম্মার উন্তেকালের পর মোজাফফর মানে তোমার আব্বা যে জাতের মেয়েকে ঘরে এনেছে তাতে এমনটিই স্বাভাবিক। এমন কথা কিছু কিছু আমার কানেও এসেছে।

: ফুফুমণি!

কি সোনার মানুষ ছিল তোমার আম্মা। যেমনই খানদানী ঘরের মেয়ে, তেমনই তার ঈমান-আচরণ আর আদব-আখলাক। সে জায়গায় মোজাফফর যে কোন ভাগার থেকে এমন এক নোংরা মেয়েকে শাদি করে আনলো, তা কি বলবো। একেবারেই এক নীচু ঘরের অমার্জিত মেয়ে। স্বভাব-আচরণও একেবারে নীচু মানের। যা দেখেছি, তাতে এক নিকৃষ্ট পল্লীর কৃষক মজুরের মেয়ের মতো তার চলন বলন।

ঠিকই দেখেছেন।

তোমার আব্বাও কি চান? এ শাদি হোক?

আব্বাজান ঠিক মনে প্রাণে না চাইলেও আমার ঐ সৎমা তো ভানুমতির মতো আমার আব্বাজানকে যাদু করে রেখেছেন। আমার সৎ মায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়ার সাধ্য নেই তাঁর। বুঝতে পারি, সাংসারিক অশান্তি এড়াতেই আব্বাজান তাঁর স্ত্রীর কথা মতো চলছেন।

তোমার কি ইচ্ছে? তুমিও কি সেটা চাও?

ক্ষেপেছেন? ঐ একটা অশিক্ষিত নাদান বরকে শাদি করবো আমি?

তাহলে কি ভাবছো? শাদি করার ব্যাপারে তোমার চিন্তা ভাবনা কি?

আপাততঃ আমার কোন চিন্তাভাবনা নেই। আমার পছন্দ মতো বর কখনো পেলে শাদি করবো, না পেলে করবো না। এ যুগে কুমারী হয়ে থাকাটা মোটেই কোন ঝকমারী ব্যাপার নয়। শিক্ষিত পরিবেশে আজকাল অনেক

মেয়েই কুমারী হয়ে আছে।

কিন্তু এটা তো কোন স্বাভাবিক জীবন নয়। স্বাভাবিক জীবন ছাড়া...

শবনম সাদিকা বাধা দিয়ে বললো– থাক ফুফু। অনেক হয়েছে। এ ব্যাপারে আর আলাপ করতে চাইনে। আপনি অন্য কথা বলুন।

: অন্য কথা!

হ্যাঁ। আপনি এখন কেমন আছেন। কেমন বোধ করছেন। ছেলে-মেয়েরা আপনার আদর যত্ন কেমন করছে– এই সব কথা বলুন।

জবাবে ফুফুমণি খোশকণ্ঠে বললেন– ভাল-ভাল। খুবই আদর যত্নে রেখেছে তারা আমাকে। আমার ছেলে মেয়ের মতো ছেলে মেয়ে এ যুগে খুব একটা পাওয়াই ভার। আম্মা বলতে সবাই তারা অজ্ঞান।

আলহামদুলিল্লাহ! আপনি সুখে আছেন শুনলে, আমরাও খুব শান্তি পাই। বাড়িতে গেলে আব্বাজান তো সবার আগে আপনার সুখ স্বাচ্ছন্দের কথাটাই জানতে চাইবেন।

জানি-জানি। তোমার আব্বা যে আমার বড়ই আদরের ভাই। তা কোথায় গেছে আর কবে ফিরবে, এসব কি কিছু জানো?

না ফুফু। তবে শুনেছি তিন চারদিনের জন্যে বাইরে গেছেন। ইতিমধ্যে হয়তো ফিরে আসতেও পারেন। আগামী কাল বাড়িতে যাই। টেলিগ্রাম যদিও করেছি, তবু এদিকের সমস্ত খবর জানার জন্যে উনি নিশ্চয়ই উদগ্রীব হয়ে আছেন।

কি বললে- কি বললে? আগামী কাল যাই না কি বললে? অসম্ভব। যা জানানোর, চার-পাঁচ পাতা চিঠি লিখে বিস্তারিত সব জানিয়ে দাও। দশপনের দিনের আগে তোমাকে ছাড়ছে কে?

ফুফুমণি!

কতদিন পরে আমার এখানে এসেছো। আমার জীবদ্দশায় আর তোমার এখানে আসা হবে কিনা কে বলতে পারে? দশ পনের দিনের আগে তোমার যাওয়ার কথা বাদ।

ফুফুমণি জিদ্ ধরলেন ঠিকই, কিন্তু শবনম সাদিকাও পাশাপাশি জিদ ধরায়, ফুফুমণি তাকে বেশী দিন আটকিয়ে রাখতে পারলেন না। নানা রকম চিন্তা শবনম সাদিকার মাথায়। সে বাড়িতে নেই বাপ বাড়িতে নেই, ম্যানেজার সাহেবও জমিদারীর হাজারটা ঝুট-ঝামেলায় সর্বদাই ব্যস্ত। বাড়িটা

প্রকৃতপক্ষে অরক্ষিত। এ অবস্থায় তার সঙ্গে মাটা তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী চাকর চাকরানীদের যে কি হাল করে ছাড়ছে, কে জানে। নূরু মিয়াও তার সাথে থাকায়, ফাঁকা ফিল্ডে বোনপুতকে সংবাদ দিয়ে এনে একটা থৈ-মাতম কাণ্ড করা তার সৎমায়ের পক্ষে অসম্ভব নয়। জিয়াফত আলীকে সংবাদ দিয়ে আনার ঐ আজগুবী অভিযোগে বোনপুত সহকারে কেতাব আলীর উপর চরম দুর্ব্যবহার শুরু করতেও আটকাবে না ঐ দুষ্ট মাহিলার। এসব কথা ভেবে শবনম সাদিকা চঞ্চল হয়ে উঠলো। কোন মতে আর দিন তিনেক থাকার পরে ফুফুকে সমঝিয়ে বিদায় নিলো সে এবং বাড়ির পথ ধরলো।

বৈশাখ মাস। ঢেলে পড়েছে রোদ। তার সাথে ভ্যাপসা গরম। জন জীবন অনেকটাই কষ্টকর হয়ে উঠেছে। কষ্টকর হয়ে উঠেছিল নূরু মিয়া আর শবনম সাদিকার জীবনও। কিন্তু গাড়ি ছেড়ে দেয়ার পরে স্বস্তি ফিরে এলো তাদের মাঝে। চলন্ত গাড়ির ফুরফুরে হাওয়ায় শরীর তাদের ঠাণ্ডা হয়ে গেল। গাড়ি চালাচ্ছিলো শবনম সাদিকা। লোকালয় পেরিয়ে ফাঁকা রাস্তায় আসার পরে শবনম সাদিকা বাড়িয়ে দিলো গাড়ির বেগ এবং চলতে চলতে মনের আনন্দে গুন গুন করে গান ধরলো–

চলরে চলরে চল
চল্-চল্-চল্।
ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল,
নিম্নে উতলা ধরণী তল
অরুণ প্রাতের তরুণ দল–
চলরে-চলরে-চল...।

গুন গুন করে গাইতে গাইতে গাড়ির বেগের সাথে গলার বেগও বাড়িয়ে দিলো শবনম সাদিকা। পেছনের সিটে বসে নূরু মিয়াও আনন্দের সাথে উপভোগ করছিল শবনম সাদিকার গান।

কিন্তু কথায় বলে, 'আজ হাসি কাল রোলানা দেনা,' কিংবা বলে, 'হাসির পর আছে কান্না, বলে গেছে রাম শর্ন্মা'। অনেকক্ষণ মহানন্দে চলে আসার পরে হাসি তাদের মিলিয়ে গেল অকস্মাৎ। অকস্মাৎ ইয়া নফ্সী ইয়া নফসী অবস্থা হলো তাদের।

www.boighar.com

অনেক রাস্তা চলে এসেছিল তারা। লোকালয় বনজঙ্গল পেরিয়ে একেবারে মুক্ত মাঠের রাস্তা দিয়ে তারা চলছিল। দুই পাশে ফাঁকা মাঠ আর রাস্তার দুই ধারে মেহগনি, সেগুন, কড়ই ও প্রচুর কাঠের ঘন বৃক্ষ। শুধু ঘনই নয়, বলা

যায় এই সব বিশাল বিশাল বৃক্ষে রাস্তাটা ছাওয়া। ঘন ছায়া পেয়ে শবনম সাদিকারা আরো আরাম বোধ করলো আর এই ছায়া শীতল রাস্তা বেয়ে দুরন্ত বেগে ছুটে চললো।

অকস্মাৎ কড়-কড়াৎ আর মড়-মড় মড়াৎ। ভ্যাপসা গরম দেখে মনে হয়েছিল ঝড় বৃষ্টি একটা কিছু হলেও হতে পারে। কিন্তু ঝড় বৃষ্টি যাকে বলে তা কিছু হলো না। অকস্মাৎ শুরু হলো সাইক্লোন। অতি অল্প পরিসর স্থান জুড়ে শাঁ শাঁ রবে ছুটে এলো টর্নেডো বা সাইক্লোন। অন্য কথায়, সাইকোনের ছোবল গিয়ে লাগলো শুধু রাস্তাটায়। সোজা রাস্তাটা বেয়েই তাণ্ডব শুরু হলো সাইক্লোনের। ঐ রাস্তা বরাবরই ছুটতে লাগলো ঘূর্ণিঝড় আর মড় মড় করে ভেঙ্গে পড়ত লাগলো ঐ বিশাল বিশাল অসংখ্য গাছগুলি। শবনম সাদিকার গাড়ির আগে পিছে ভাঙ্গা গাছের গুড়ি সশব্দে পড়তে লাগলো। আর উপড়ে উপড়ে পড়তে লাগলো অনেক আস্ত গাছ। নসিবের জোরে তখনও কোন গাছ তাদের গাড়ির উপর পড়ে নি। কিন্তু পড়তেও আর দেরী নেই দেখে চমকে উঠলো নূরু মিয়া। সে চিৎকার করে শবনম সাদিকাকে বললো– রাস্তা ছেড়ে শিগগির গাড়িটা মাঠের মধ্যে নিন ম্যাডাম, বিশাল গাছের ঐ একটা গুড়ি গাড়ির উপর পড়লে শুধু গাড়িটাই ভাঙ্গবে না, আমাদের নিজেদেরও কোন অস্তিত্ব থাকবে না।

সমানে পড়ছেই তখনো গাছ। বাতাসের বেগে উড়ে উড়ে উঠছে তাদের গাড়ি। 'হায় আল্লাহ, বাঁচাও বাঁচাও' বলে সংবিতহীন শবনম সাদিকা কেবলই কাঁপতে আর চিৎকার দিতে লাগলো। নূরু মিয়ার কথায় কোন কানই দিলো না। তা দেখে নূরু মিয়া লাফ দিয়ে গিয়ে গাড়ির স্টিয়ারিং ধরলো আর রাস্তার পাশেই মাঠের মধ্যে একটা শুকনো ও গভীর খাল দেখে তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিলো গাড়ি। বুদ্ধি করে গাড়িটা গভীর গর্তের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়ার সাইক্লোনের ছোবল আর গাড়িতে লাগালো না আর গাড়ির উপর গাছ গাছড়া ভেঙ্গে পড়ার সম্ভাবনাও রইলো না।

মাত্র দশ পনের মিনিটের ব্যাপার। এর পরেই মিলিয়ে গেল সাইক্লোন। কিন্তু রাস্তাটা গোটাই ভেঙ্গে পড়া আর উপ্‌ড়ে পড়া গাছের আচ্ছাদিত হয়ে গেলো। গাড়ি ঘোড়া তো দূরের কথা, রাস্তার আগে পিছে কোন দিকে মানুষ চলাচলের পথও আর রইলো না।

সন্ধ্যে হয়ে এসেছিল। স্বাভাবিক অবস্থায় বাড়িতে পৌঁছতে তাদের কিছুটা রাত্রি হয়ে যেতো। এখন সে অবস্থা আর রইলো না। গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে

বইঘর.কম ও রোকন

এখন তারা কি করবে, সেই কথাই ভাবছিল। এই সময় রাস্তার ধারে এক মুরুব্বী গোছের লোক পেয়ে নুরু মিয়া জিজ্ঞাসা করলো– মুরুব্বী! আপনি কি এখানকার লোক?

মুরুব্বী বললো– না, আমি রোড্স অ্যান্ড হাইওয়েজের এক লেবার সর্দার। রাস্তার দুই পাশের অবস্থাটা জানার জন্যে খানিকদূরে ডাল কেটে রাস্তা একটু ফাঁক করে আমি এপারে এসেছি।

নূরু মিয়া বললো– তাহলে বাবাজী, আমরা কি গাড়ি চালিয়ে যেতে পারবো না?

মুরুব্বী বললো– আজ তো নয়ই, কাল সকালে অনেক লেবার এসে করাত দিয়ে গাছ কেটে সাফ না করা পর্যন্ত, আগে পিছে কোন দিকেই যেতে পারবেন না। আগামী কাল দুপুর পর্যন্ত লাগবে রাস্তা সাফ করতে। তার পরে গাড়ি চালিয়ে যেতে পারবেন।

নূরু মিয়া হতাশকণ্ঠে বললো– হায় আল্লাহ্! আজ তাহলে সারারাত মাঠের মধ্যে এই গাড়িতেই থাকতে হবে!

চম্‌কে উঠে লেবার সর্দারটি বললো– ওরে বাবা! খবরদার- খবরদার! ও কাজটি মোটেই করবেন না। এ জায়গাটা খুব খারাপ। চোর ডাকাতের লীলাভূমি এই জায়গা। তাদের অভয় আশ্রম। রাতের অন্ধকারে তারা আপনাদের উপর চড়াও হয়ে খুন জখম করে যা কিছু আছে তাতো নিয়ে যাবেই, তার উপর সঙ্গে দেখছি এক জোয়ান মেয়েছেলে। মেয়েটার জান-মান ইজ্জত সবই যাবে।

তাহলে? আমরা এখন তাহলে কি করবো মুরুব্বী?

এই মাঠের ওপারে ঐ দূরে ছোট একটা বন্দর আর বাজার আছে। ওখানে দুই তিনটে ছোট থাকার হোটেল আছে। ঐ হোটেলগুলোর একটাতে গিয়ে আশ্রয় নিন। ঐ বন্দরেও গাড়ি নিয়ে রাতে বাইরে থাকবেন না। বাজারের অর্ধেক লোকই গুণ্ডা আর লম্পট। ওরাও রাতের অন্ধকারে আপনাদের জান মাল ও ইজ্জতের চরম ক্ষতি করে ফেলবে।

তাহলে?

বেলাটুকু থাকতেই ওখানে যান আর একটা নিরাপদ আশ্রয় খোঁজ করুন। নিরাপদ আশ্রয় না পেলে কিন্তু মহামুসিবত আপনাদের সামনে।

মুরুব্বীটি চলে গেলেন। অগত্যা গাড়ি নিয়ে সেইখানে রওনা দিলো নূরু

মিয়া। গিয়ে দেখলো, সেটা একটা ছোট বাজার আর বন্দর মাফিক স্থান। খোঁজ করে দেখলো, ঠিকই থাকার মতো ছোট ছোট দুই তিনটে হোটেল আছে সেখানে। এগুলোর মধ্যে যেটা কিছুটা বড়, সেখানে গিয়ে নূরু মিয়া একজনকে সামনে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলো– এই হোটেলের মালিক কে, বলুন তো?

লোকটি বললেন– আমিই মালিক। কেন বলুন তো?

আশান্বিত হয়ে নূরু মিয়া বললো– ও- আপনি? খুব ভাল খুব ভাল। তা এখানে কি থাকার কোন রুম পাওয়া যাবে?

মালিক বললেন– রুম? না এখন আর পাওয়া যাবে না। তিনটে রুমের তিনটেই বুক হয়ে গেছে।

নূরু মিয়া হতাশকণ্ঠে বললো– তিনটেই বুক হয়ে গেছে?

হ্যাঁ, একটু আগেই বুক হয়ে গেছে। ঝড়ে গাছ পালা ভেংগে পড়ে গাড়ি চলার রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে তো! তাই তাঁরা গাড়ি নিয়ে এসে আমার এই হোটেলে উঠেছেন।

: তাই নাকি? তা কোন মতে কি দুই সিটের একটা রুম বা রুমের বারান্দা...

না-না, আর তিল ধারণের ঠাঁই নেই। দুই দুইটে গাড়ি ভর্তি যারা এসেছেন, তাঁরাই সংখ্যা অনেক। সবস্থানে, তাঁরাই ঠাশাঠাশি করে বসে গেছেন। আর তিল পরিমাণ স্থান নেই।

কি দুর্ভাগ্য। তা এখানে হোটেলগুলোতে কি গাড়ি রাখার ব্যবস্থা আছে?

আমারটায় ছিল। দুটো গাড়িতেই সে জায়গা ভরে গেছে। আর কোন গাড়ি ধরবে না।

: তাহলে?

ঐ সামনে আর একটা হোটেল আছে। আমারটার চেয়ে সেটা একটু ছোট। ওখানে চেষ্টা করে দেখুন।

দ্বিতীয় হোটেলটিতে এসে ঐ একই অবস্থায় পড়লো নূরু মিয়া। ওখানে থাকার দুইটি মাত্র রুম! এক গাড়িলোক এসে সে দুইটি রুমই দখল করে নিয়েছে। গাড়ি রাখার একটা মাত্র জায়গা। সে জায়গাও তাদের গাড়িতেই ভরে গেছে। ব্যাপার ঐ একটাই। ঝড়ে গাছ পড়ে রাস্তা বন্ধ হওয়ায় তারা আটকে গেছে আর হোটেলে এসে উঠেছে। সে হোটেলের বয়কে জিজ্ঞাসা করে নূরু মিয়া জানলো, থাকার মতো হোটেল আর নেই বললেই চলে। আর

বইঘর.কম ও রোকন

একটা হোটেল ঐ ধারে আছে বটে, তবে একটাই মাত্র সিঙ্গেল সিট তাদের। একজনের বেশী দুইজনের স্থান হয় না। ইতিমধ্যে সেটাও দখল হয়ে গেছে কিনা, কে জানে?

দ্রুত গাড়ি চালিয়ে সেখানে গেল নূরু মিয়া। হোটেলের মতো ছোট একটা ঘর দেখে গাড়ি থামাতেই একজন চাকর ছুটে এলো গাড়ির কাছে। সে হোটেল মাফিক ঘরটার সামনের জায়গা ঝাড়-ঝাঁটা দিচ্ছিল। গাড়ির কাছে এসে সে জিজ্ঞাসা করলো– কি চাই?

নুরু মিয়া প্রশ্ন করলো– এটা কি হোটেল?

চাকরটা বললো– হ্যাঁ, হোটেল।

নূরু মিয়া ফের প্রশ্ন করলো– তুমি কে?

আমি এই হোটেলে কাজ করি।

এখানে থাকার সিট পাওয়া যাবে?

যাবে। তবে একজনের এক সিট।

এক সিট?

জি। ছোট একটা রুম আর ছোট্ট একটা খাট।

দুই খাট হবে না?

না।

কোনভাবেই কি দুইজনের থাকার মতো জায়গা করা যাবে না?

কোনভাবেই না। দুইজন থাকলে ঐ এক সিটেই জড়াজড়ি করে থাকতে হবে।

খাটের নীচে মেঝেতে কোন জায়গা নেই?

এক রত্তিও নেই। খাটের নীচে জুতা স্যাণ্ডেল আর ছোট ব্যাগ বাক্সো কোন রকমে রাখা যাবে। মানুষের শোয়ার কোন স্থান নেই।

সেকি! তাহলে ঐ একখাটে জড়াজড়ি করে থাকতে হবে?

চাকরটা একটু রুষ্ট কণ্ঠে বললো– সেটা জেনে লাভ কি আপনার? আপনাকে তো মালিক ঐ সিট দেবেন না।

দেবেন না?

না, আপনার সাথে দেখছি একজন যুবতী মেয়েছেলে। মেয়ে ছেলে নিয়ে কাউকে এখানে স্থান দেয়া হয় না।

কেন-কেন?

কেন আবার! একমাত্র নিজের বউ ছাড়া কোন মেয়েছেলে নিয়ে এ হোটেলে কাউকে উঠতেই দেয়া হয় না। চরম শিক্ষা হয়েছে মালিকের।

: শিক্ষা!

হ্যাঁ, শিক্ষা। মেয়ে ছেলে নিয়ে এখানে ফূর্তি লুটতে এসেছিল এক লম্পট। এ জন্যে পুলিশ এসে ঐ নারীপুরুষ দুইজনকে তো ধরে নিয়ে গেছেই, ব্যভিচারের ঘাঁটি খোলার দায়ে এই হোটেলের মালিককেও ধরে নিয়ে গিয়ে হাজতে পুরেছে আর দু-দুইটি হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে। আর নেড়ে বেলতলা যায়?

: মানে?

: আর ঐ ফাঁদে পা দেয় মালিক?

: তাহলে উপায়? আমরা এখন কি করবো?

ঐ মেয়েছেলে কি আপনার বউ?

কেন?

কেন আবার, বউ হলে হয়তো জড়াজড়ি করে এক খাটে থাকার অনুমতিটা দিতেও পারেন মালিক। নইলে নট। একদম নট।

নট?

: তাড়াবে। পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দেবে। আবার ঐ ব্যভিচারের ব্যাপার।

হায় আল্লাহ! তাহলে কি করবো? এই রাতে আমরা যাবো কোথায়?

স্বামী-স্ত্রী যদি হন, তাহলে আশ্রয় পাবেন। মালিককে গিয়ে সে কথা জানান।

তাঁকে বলবো আমরা স্বামী-স্ত্রী?

আরে ল্যাঠা, স্বামী স্ত্রী হলে তা বলবেন না কেন? স্বামী স্ত্রী দুইজন বুকে-বুকে পিঠে-পিঠে জড়াজড়ি করে থাকতেই বা আপত্তি কি? আর যদি তা না হোন, তাহলে পালান। পুলিশের হাতে পড়লে আপনাদের দুর্গতির সীমা থাকবে না।

: তা- মানে...।

সাহস থাকলে মালিকের কাছে যান। আমার সাথে বক বক করে লাভ নেই।

বইঘর.কম ও রোকন
ঝাঁটা হাতে চলে গেল চাকরটা। নূরু মিয়া এবার শবনম সাদিকাকে জিজ্ঞাসা করলো– ম্যাডাম, কি করবো এবার? আর তো আশ্রয় কোথাও নেই?

শবনম সাদিকা অসহায় কণ্ঠে বললো– নেই বলে আমরা দুইজন এক ঘরে গিয়ে থাকবো?

তার চেয়েও করুণ ম্যাডাম। শুধু এক ঘরে গিয়ে থাকাই নয়, আমরা যে স্বামী স্ত্রী– এ কথাও বলতে হবে হোটেলের মালিককে! নইলে থাকতে দেবেন না।

হায় আল্লাহ স্বামী স্ত্রী? আমরা স্বামী স্ত্রী এই কথা বলবে?

আমি তা বলতে চাইনে ম্যাডাম। আমরা এখন কি করবো, সেটা আপনি বলুন।

গাড়ি নিয়ে কি বাইরে কোথাও থাকাই যাবে না?

ঐ তো শুনলেন, সেক্ষেত্রে শেয়াল শকুনে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে। সামনা সামনি এলে তো পাত্তা কেউ পাবে না। কিন্তু রাতের অন্ধকারে অতর্কিত চড়াও হলে আমার করার কিছু থাকবে না। এর উপর ওদের হাতে যদি বাঁটকাটা বন্দুক, মানে আগ্নেয়াস্ত্র থাকে, ডাকাতদের কারো কারো কাছে ওটা থাকেও, তাহলে আরো বিপদ।

: নূরু মিয়া!

বড় সাংঘাতিক মুসিবতে পড়েছি। এখন কি যে করি! জলে কুমীর, ডাঙ্গায় বাঘ। কোন দিক যে সামলাই...

নূরু মিয়া হাহুতাশ করতে লাগলো। শবনম সাদিকা এবার শক্ত হয়ে বললো– চলো, হুতাশ করে লাভ নেই। হোটেলের মালিকের কাছে যাই চলো। মালিক যা বলে তা মেনে নিয়ে, যেভাবে থাকতে বলে সেভাবেই থাকবো, চলো।

আমরা স্বামী-স্ত্রী এ কথা মেনে নেবেন?

না নিয়ে উপায় কি! আর তা ছাড়া তোমার মতো এমন দুর্লভ আর অদ্বিতীয় লোক যার স্বামী হবে, সে কি কম ভাগ্যবতী!

ম্যাডাম!

এক খাটে পিঠে পিঠ লাগিয়েও তো থাকা যায়। কতবার তুমি আমাকে চ্যাংদোলা করে তুলে বুকে পিঠে নিয়েছো। এ আর বেশী কি? একটা রাতের ব্যাপার বৈ তো নয়।

কিন্তু...

বইঘর.কম ও রোকিন

চলো- চলো। ভাবতে ভাবতে কেউ এসে যদি ওটুকু আশ্রয়ও নিয়ে নেয়, তাহলে লোফার লম্পট আর ডাকাত-দস্যুর হাতেই প্রাণ দিতে হবে আমাদের।

www.boighar.com

মন শক্ত করে দুইজন হোটেল মালিকের কাছে গেল। তারা স্বামী স্ত্রী– এ কথা জোর দিয়ে বলে ঐ একটা খাটেই থাকতে রাজী হলো তারা। জুটিটা খুবই দর্শনীয় দেখে, এদের কথা বিশ্বাস করলো মালিক এবং এদের আশ্রয় দিতে রাজী হলো। সেই সাথে গাড়িটাও একভাবে রাখার ব্যবস্থা করলো।

শুরু হলো নূরু মিয়া ও শবনম সাদিকার নতুন অভিজ্ঞতা। নূরু মিয়া নিদারুণ সঙ্কোচ আর শবনম সাদিকা চরম দুশ্চিন্তা নিয়ে গিয়ে হোটেলের ঐ সংকীর্ণ ঘরে আর সংকীর্ণ বিছানায় উঠে বসলো। নূরু মিয়াকে ফেরেশতা তুল্য লোক বলে বার বার ভাবলেও, এ অবস্থায় শবনম সাদিকার বুক দুরু দুরু করতে লাগলো। ভাবতে লাগলো হোক সে সৎলোক, তবু সে একজন টগ্‌বগে নওজোয়ান। রিপুজয়ী কোন সাধু দরবেশ নয়। রিপুর তাড়নায় সে যদি তাকে সবলে আঁকড়ে ধরে আর তার শ্লীলতাহানি করে, তার বলার বা করার কিছু থাকবে না। স্বামী স্ত্রী পরিচয়ে তারা এসেছে সে পরিচয় মিথ্যা করে চিৎকার দিলে, ফাঁস হবে তাদের চাতুরী। ফলাফল, ব্যভিচারের অভিযোগে পুলিশের হাতে পড়তে হবে আর সে ক্ষেত্রে পরিণতি হবে আরো ভয়ংকর। সুতরাং যা ভবিতব্য তা মেনে নেয়া ছাড়া আজ আর তার কোন উপায় নেই।'

নূরু মিয়া ভাবতে লাগতে লাগলো, একি বিড়ম্বনা!। একজন রূপসী যুবতীর সাথে এক ঘরে এক বিছানায় থাকা তার ঈমান আখ্‌লাক আর নীতি আদর্শ বিরোধী কাজ। মহাগুনাহ্‌র ব্যাপার। এতে তার পরকাল একেবারেই মিস্‌মার হয়ে যাওয়ার ঘটনা। পরিস্থিতির ফেরে একি বিড়ম্বনায় পড়তে হলো তাকে।

সংকোচে ও লজ্জায় শবনম সাদিকা বিপরীত দিকে মুখ করে গুঁটি শুঁটি মেরে শুয়ে পড়লো আর শুয়ে রইলো। নূরু মিয়া শোয়া তো দূরের কথা, নীচে মেঝেতে কোনমতে বসে খাটের সাথে মাথা লাগিয়ে রাত কাটাতে লাগলো। নূরু মিয়ার ভাবনা, তাকে নিয়ে কতই না ভয় পাচ্ছে শবনম সাদিকা। শবনম সাদিকার ভাবনা, কখন বুঝি তাকে জড়িয়ে ধরে নূরু মিয়া। সেই সাথে নূরু মিয়ার প্রতি কিছুটা মায়াও হলো তার। খাটের নীচে বসে থাকার কষ্ট দেখে শবনম সাদিকা সহৃদয় কণ্ঠে নূরু মিয়াকে কয়েক বার খাটে উঠে বিপরীত দিকে মুখ করে শোয়ার আহ্বান জানালো। কিন্তু নূরু মিয়া অনড়। যেভাবে সে বসে ছিল সেভাবেই বসে রইলো। কেটে গেল রাত।

বইঘর.কম ও রোকন

নূরু মিয়ার চরিত্র মাধুর্যে মোহিত হয়ে গেল শবনম সাদিকা। তার মনে শুধুই তোলপাড় করতে লাগল– একি অবিশ্বাস্য মানুষ এটা। শুধু ফেরেশতাতুল্য নয়, ষড় রিপু বিজয়ী একেবারেই এক আসমানী পুরুষ। কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য সব কিছুকেই যেন সম্পূর্ণ রূপে জয় করেছে সে। ইহ দুনিয়ার কোন আবিলতাই তাকে স্পর্শ করেনি এক বিন্দু।

শবনম সাদিকা তন্ময় হয়ে ভাবতে লাগলো, আহারে! এমন সোনার মানুষ সম্বন্ধে কি ভ্রান্ত ধারণাটাই না সে পোষণ করেছে এতদিন আর বিশেষ করে আজ। এ গুনাহ বুঝি খণ্ডন হবার নয়। সেই সাথে সে অনুভব করলো, এমন মানুষের কিছু খেদমত করতে পারাটাও অশেষ সওয়াবের কাজ।

নামায কালাম পড়তেই বেলা উঠে গেল। বেলা উঠার পর তারা হোটেলের বাইরে এসে খোঁজ নিয়ে জানলো, লেবার এসে সবেমাত্র রাস্তায় ভেঙ্গে-উপড়ে পড়া গাছপালা কাটতে শুরু করেছে। রাস্তা সাফ হতে, অর্থাৎ গাড়ি চলাচলের উপযোগী হতে দুপুর পার হয়ে যাবে। দুপুর পার হয়ে যাওয়া মানে বিকেলের লগ্‌ভগ্‌ ব্যাপার। লম্বা সময়।

ভেজ্‌ মওলা। কাল বিকেল থেকে খাওয়া নেই, সারারাত ঘুমটাও হয়নি। শবনম সাদিকার কিছু কিছু হলেও এক ফোঁটা ঘুম হয়নি নূরু মিয়ার। তাই, হোটেলের পাক ঘরের কাছে গিয়ে পাক ঘরের বয়ের হাতে এক টাকার দুটো কয়েন গুঁজে দিলো শবনম সাদিকা। তা দেখে নূরু মিয়া বললো– সেকি ম্যাডাম, হঠাৎ ওকে বকশিশ দেয়ার কি ঘটলো?

শবনম সাদিকা বললো– ঘটবে আবার কি? খেতে হবে না। কাল থেকে খাওয়া নেই।

সেতো ঠিকই। তা খাওয়াটা এখান থেকে সেরে নিলেই হয়?

এখান থেকে! বসবে কোথায়? ভেতরের অবস্থা দেখেছো? যেমনই ঘিঞ্জি, তেমনই নোংরা।

: তাহলে?

ঐ বয়টা খাবার নিয়ে গিয়ে আমাদের ঘরে দেবে।

: ঘরে! ফের ঘরে?

ঘুমাবে কোথায়? সারারাত এক পলক ঘুম নেই। ঘরে না গেলে এই গোটা বেলাটা কাটাবে কোথায় আর ঘুমাবে কোথায়? রাস্তায়?

: ম্যাডাম!

থাক, ম্যাডাম ম্যাডাম করতে হবে না। সারারাত আমার একটা কথাও শুনোনি। কাজেই এখন যা বলছি, মুখ বুজে এবার তা শুনে যাও।

কিন্তু ঘরে তো জায়গা বেশী নেই।

যেটুকু আছে, ওতেই হবে। সারারাত চলেছে, এ বেলাটাও চলবে। কথা না বাড়িয়ে চলো, ঘরে চলো।

ফের ঘরে চলে এলো দুইজন। খাটের উপর ঠিকঠাক হয়ে বসতেই পাক ঘরের বয়টা বিশাল এক ট্রে ভর্তি ডিম, পাউরুটি, চিনি, পায়েস, তরকারী প্রভৃতি বিভিন্ন রকম খাবার নিয়ে এসে হাজির হলো। পাক ঘরের বাবুর্চিটা বুঝে নিয়েছে এরা মালদার পার্টি। তাই কিছু কামাই করার উম্মিদে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাবারে ট্রেটা ভর্তি করে দিয়েছে।

খাবার এলে শবনম সাদিকা নূরু মিয়াকে বললো– খাটের উপর আরাম করে উঠে বসো তো দেখি। বসে এবার খাও।

নূরু মিয়া বললো– আমি উঠে বসবো? আপনি কোথায় বসবেন?

আমি এই পাশে বসবো। গোটা খাটটার একপ্রান্তে আমার বসার জায়গা হবে না?

হবে। তবে দুইজনের এক সঙ্গে আরাম করে বসে খাওয়ার জায়গা হবে না।

আমি তোমার সাথে খেতে বসবো কেন? আমি তোমাকে পরিবেশন করে খাওয়াবো। তোমার খাওয়া শেষ হলে আমি খাবো।

আপনি পরিবেশন করে খাওয়াবেন ম্যাডাম?

জি। সুযোগ যখন পেয়েছি, একটু খেদমত করার সওয়াব আজ আমি নেবোই।

ম্যাডাম, আমাকে খেদমত করবেন মানে? আমাকে গুনাহগার করবেন কেন?

নইলে যে নিজেই আমি গুনাহগার হবো। আগে বুঝতে পরিনি, সে কথা আলাদা। আজ বুঝতে পেরেও একটু সওয়াব হাসিল করবো না?

আমাকে বিদ্রুপ করছেন ম্যাডাম?

বিদ্রুপ নয়, আমার অন্তরের কথা বলছি। তোমার মতো মহৎপ্রাণ মানুষের কিছুটা খেদমত করার সুযোগ কি সব দিন পাওয়া যায়? কথা না বলে মুখ বুজে আজ শুধু আমার নির্দেশ শুনে যাও। বলেছি না, অনেক অবাধ্য হয়েছো,

আর তোমাকে অবাধ্য হতে দেবো না?

অগত্যা উঠে বসলো নূরু মিয়া। শবনম সাদিকা পরম যত্নে তাকে পরিবেশন করে খাওয়ালো। আহার-অন্তে নূরু মিয়া একটু সরে বসলে, শবনম সাদিকা ভালভাবে বসে ওখানেই পানাহার শেষ করলো। অতঃপর পাকঘরের বয়টা বাটি বর্তন নিয়ে গেলে শবনম সাদিকা কিছানাটা ঝেড়ে ঝুড়ে পেতে নূরু মিয়াকে বললো– নাও, এবার টান হয়ে শুয়ে পড়ো দেখি। লম্বা সময় হাতে। আরাম করে ঘুমোও।

নুরু মিয়া বললো– ঘুমাবো?

হ্যাঁ, ঘুমাবে। সারারাত দুই চোখের পাতা একবারও এক করোনি। এবার লম্বা একটা ঘুম দিয়ে নাও।

: আর আপনি?

আমি তো যা হোক খানিক ঘুমিয়েছি। তোমার এবার পুরো ঘুম দরকার। কারণ, যাওয়ার পথে এবার তোমাকেই গাড়ি চালাতে হবে। আমার হাত এখনো বশে আসে নি।

কিন্তু...

ফের কথা বলে! বলেছি না, আজ তোমার স্পিকটি নট্? যা নির্দেশ দেবো, তাই শুধু করে যাবে।

শুয়ে পড়লো নূরু মিয়া। শুয়ে পড়ার সাথে সাথে ঘুমিয়েও পড়লো। ভ্যাপসা গরমের জের সেদিনও তেমন একটা কাটেনি। ঐ খাঁচার মতো বদ্ধ ঘরে অল্পক্ষণেই ঘেমে ভিজে উঠলো নূরু মিয়া। খাটের একপাশে বসে থেকে শবনম সাদিকাও মৃদু মৃদু ঘামছিলো। তাই সে হোটেলের অফিস থেকে একটা পাখা চেয়ে এনে নিজেকে নাম নাম বাতাস করার অজুহাতে নূরু মিয়াকে পুরাদমে বাতাস করতে লাগলো। বাতাস পেয়ে নূরু মিয়ার ঘুম আরো খানিক গভীর হলো। কিন্তু একটু পরেই সে চমকে উঠে বললে– একি! একি করছেন ম্যাডাম? বসে বসে আপনি আমাকে বাতাস করছেন!

হ্যাঁ, করছি। তুমি ঘুমোও।

ম্যাডাম!

ফের প্রশ্ন! আজ যে আমি আর তোমার কথা শুনবো না। তুমি শুনবে আমার কথা। ঘুমোও।

তা-মানে...

শুধু তোমাকেই বাতাস দিচ্ছিনে নূরু মিয়া আমিও বাতাস খাচ্ছি সেই স্নাথে। কেন খামাকা বক্ বক্ করছো?

ফের ঘুমিয়ে পড়লো নূরু মিয়া। শবনম সাদিকারও তেমন ঘুম হয়নি রাতে। তাই বাতাস দিতে দিতে আর বাতাস খেতে খেতে ঘুম এসে গেল তারও চোখে। ফলে, যে কাজটি রাতে করে নি নূরু মিয়া, এই দিনে সেই কাজটি শবনম সাদিকা করলো। নূরু মিয়ার পিঠের সাথে আলতোভাবে পিঠ লাগিয়ে ঐ একই খাটে ঘুমিয়ে পড়লো সে।

ঘুম যখন ভাঙ্গলো তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। ধড়মড় করে উঠে তারা বাইরে বেরিয়ে এলো। আবার খোঁজ নিয়ে জানলো, রাস্তার ডালপালা সরানো প্রায়ই শেষ হয়ে গেছে। আর আধাঘণ্টার মধ্যে পুরোপুরি শেষ হয়ে যাবে।

আশ্বস্ত হলো তারা। বিদায়ের জন্যে তৈরী হতে লাগলো। গোসল করার সুবিধে নেই হেতু, তারা চোখ মুখ ও হাত-পা ধুয়ে অজু করে নিলো এবং জোহরের নামায আদায় করলো। এরপর হোটেলের পাকঘরের কাছে গিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে থেকেই কোন মতে দুপুরের আহারটা সেরে নিলো। সব শেষে তারা খাবারের দাম ও হোটেলের পাওনা মিটিয়ে দিয়ে ব্যাগ-বাক্সোসহ গাড়িতে গিয়ে উঠলো। গাড়িতে উঠার পরে নূরু মিয়া শবনম সাদিকার মুখের দিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে চেয়ে রইলো। শবনম সাদিকা ঈষৎ হেসে বললো– দেখছো কি? বলেছি না এবার তোমাকেই চালাতে হবে গাড়ি? অসুবিধা হবে কিছু?

জবাবে নূরু মিয়াও হেসে বললো– না ম্যাডাম, অসুবিধে হবে কেন? আমি শুধু ম্যাডামের হুকুমের অপোয় আছি।

শবনম সাদিকা দরদী কণ্ঠে বললো– হুকুম নয় নুরু মিয়া, আমার অনুরোধ।

বহুৎ আচ্ছা।

ড্রাইভিং সিটে বসে নূরু মিয়া ছেড়ে দিলো গাড়ি।

বাড়িতে পৌছে শবনম সাদিকা দেখলো, তার আব্বা ইতিমধ্যে ফিরে এসেছেন বাড়িতে। শবনম সাদিকা বাড়িতে পৌঁছামাত্র তার আব্বা ছুটে এসে তার বোনের, অর্থাৎ শবনম সাদিকার ফুফুর খুটিয়ে খুটিয়ে খবর নিতে লাগলো। শবনম সাদিকাও খোশকণ্ঠে তামাম কুশল বর্ণনা করে গেল সবটুকুই।

কিন্তু পরীর মায়ের কাছে সে এ খবর চেপে রাখতে পারলো না। পরের দিন

বিকেলে শবনম সাদিকার কাছে এসে সে বললো– সে কি আম্মাজান! ফিরে আসার সময় আপনাদের কি যেন বিপদ ঘটেছিল, শুনলাম।

সচকিত হয়ে শবনম সাদিকা বললো– শুনলে? কার মুখে শুনলে?

ঐ নুরু মিয়া মৌলভী সাহেবের মুখে। কেতাব আলীকে উনি একথা বলছিলেন। বলছিলেন, একদিন আগেই পৌঁছে যেতাম কেতাব আলী, কিন্তু হঠাৎ এক মুসিবত পয়দা হওয়ায় একদিন দেরী হয়ে গেল।

: তারপর?

কেতাব আলী অবশ্য মুসিবতটা কি, জানতে চাইলো। কিন্তু মৌলভী সাহেব বললেন, সে অনেক কথা। সেটা পরে হবে, এখন থাক।

মৌলভী সাহেব বলতে নারাজ দেখে কেতাব আলীও থেমে গেল। এ ব্যাপারে আর প্রশ্ন করলো না।

বটে।

কি মুসিবত আম্মাজান? কি মুসিবত পয়দা হয়ে ছিলো? কেউ কি আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, না ঝগড়া ফ্যাসাদ বাধিয়েছিল?

ঝগড়া ফ্যাসাদ! কোথায়?

: আপনার ফুফুর বাড়িতে। সে কারণেই কি মুসিবত পয়দা হয়েছিল?

আরে না-না। মুসিবত পয়দা হয়েছিল রাস্তায়।

রাস্তায়! ওমা সেকি? রাস্তায় মুসিবত পয়দা হওয়ায় একদিন দেরী হলো আসতে?

: হ্যাঁ, তাই হলো।

(গালে হাত দিয়ে) ও-মাগো! তাহলে থাকলেন কোথায়?

হোটেলে।

হোটেলে! রাস্তার হোটেলে?

: হ্যাঁ, রাস্তার পাশেরই এক হোটেলে।

ও-ম্মা। রাস্তার পাশের হোটেলে দুইজন দুই ঘরে থাকলেন?

পরীর মায়ের আগ্রহ দেখে তাকে আরো চমকিয়ে দেয়ার জন্যে শবনম সাদিকা বললো– দুইঘর পাবো কোথায়? একঘরে।

: মানে?

সব ঘর আগেই যে বুক হয়ে গিয়েছিল। মানে, দখল হয়ে গিয়েছিল। দুই

বইঘর.কম ও রোকিন

ঘর থাকলে তো দুই ঘরে থাকবো। সব ঘর অন্য লোকে ভর্তি। ঐ একটা ঘরই ফাঁকা ছিল।

: হায় আল্লাহ! তা ঘরটা বড় তো? দুইজনের দুই খাট দূরে দূরে ছিল তো।

: কি যে বলো পরীর মা! একটাই হয় না, তাতে আবার দুই খাট!

সে কি! কি বলছো?

বলছি, ছোট্ট একটা ঘর আর ছোট্ট এক খাট।

ওরে আল্লাহ্। সেকি সেকি! এক খাটে ছিলেন?

ছোট্ট এক সিঙ্গেল খাটে। একজনেরই কোন মতে জায়গা হয়; দুইজনের হয় না। দুইজন থাকতে হলে জড়াজাড়ি করে থাকতে হয়।

: তওবা-তওবা। তাই থাকলেন? জড়াজড়ি করে?

: তাই তোমার বিশ্বাস হয়?

কখ্খনো না- কখ্খনো না। আপনিও সে মেয়ে নন, নূরু মৌলভী সাহেবও সে মানুষ নন।

: তবে?

সেই কথাই তো বলছি। আপনারা রাত কাটালেন কি করে?

একজন শুয়ে আর একজন কোনমতে মেঝেতে বসে। পরীর মা ফের বিস্মিতকণ্ঠে প্রশ্ন করলো– কোন মতে মেঝেতে বসে?

শবনম সাদিকা বললো– অতিকষ্টে মেঝেতে বসে। মেঝেটাই যে নেই। ছোট্ট খাটেই মেঝেটা ভরে গেছে। আরাম করে বসবে কোথায়?

তাজ্জব কথা। তা আপনাদের কে কষ্ট করে মেঝেতে বসে রইলেন? আপনি?

তাই আমাকে কষ্ট করতে দেয়? নূরু মিয়াই কষ্ট করে মেঝেতে বসে রইলো সারারাত।

একবারও খাটে উঠতে চাইলেন না?

: সাধাসাধি করেও তাকে খাটে তুলতে পারিনি?

ও-ম্মা! এই রকম মহৎ মানুষ ঐ মৌলভী সাহেব?

আসমানী মানুষ। মানুষ যেটা চিন্তা করতেও পারে না সেই রকম পুণ্যবান মানুষ সে।

: আম্মাজান!

বইঘর.কম ও রোকন

আমিও প্রথমে এতটা বিশ্বাস করতে পারিনি পরীর মা। কিন্তু আগাগোড়া দেখে আমি শুধু বিশ্বাসই নয়। একেবারে সংজ্ঞাহীন হয়ে গেছি। এমন মানুষও আল্লাহ্‌র দুনিয়ায় আছে!

হাজার বছর পরমায়ু দিন, আল্লাহ্ তায়ালা তাকে হাজার বছর পরমায়ু দিন। আসল পরিস্থিতিতে না পড়লে মুখের কথায় মানুষ চেনা যায় না।

দুইজন কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইলো। এরপর পরিস্থিতির ব্যাপারটা, অর্থাৎ ঝড়ে গাছ ভেঙ্গে রাস্তা বন্ধ হওয়ায় হোটেলে আশ্রয় নেয়ার ব্যাপারটা বর্ণনা করে শোনাতেই ভেতর থেকে ডাক এলো নয়া বেগম গুলজাহান বানু বেগমের। গাল মন্দ করবে ভয়ে, সঙ্গে সঙ্গে সেই দিকে দৌড় দিল পরীর মা।

www.boighar.com

দিন দুইয়েক পরের কথা। নূরু মিয়ার তয়তদবিরে শবনম সাদিকাকে সব সময় নূরু মিয়ার ঘরে গিয়ে থাকতে দেখে আর এক দফা বিগড়ে গেলেন নয়া বেগম। ডাকাডাকি করেও তাঁর বোনপুতের কাছে আনা যায় না শবনম সাদিকাকে। সেই শবনম সাদিকা বাড়ির একজন কাম্‌লার খেদমতে জান ছেড়ে দিচ্ছে দেখে গায়ে আগুন ধরে গেল বেগম সাহেবার। পরীর মাকে ডেকে তিনি দাঁত পিষতে পিষতে বললেন– কি হচ্ছে? এটা কি হচ্ছে পরীর মা? এমন বেলেল্লাপনা তোমরা দুই চোখে দেখছো কি করে?

বুঝতে পেরেও না বোঝার ভান করে পরীর মা বললো– বেলেল্লাপনা মানে? আপনি কার কথা বলছেন হুজুরাইন?

কার কথা বলছি বুঝতে পারছো না?

হুজুরাইন!

শবনম সাদিকার কথা। আমার খানদানী ঘরের খানদানী ছেলে তেজারত আলী বিশ্বাস বাবাজীর ছায়াটিও যে মেয়ে মাড়াতে চায় না, সেই মেয়ে বাড়ির একজন ভবঘুরে হুকুমবরদারের সাথে যে ফষ্টিনষ্টি শুরু করেছে তাতে মান সম্মান থাকলো আমাদের?

তা কথা হলো...

জমিদারবাড়ি এটা। জমিদারের মান সম্মানটা থাকলো, না থাকলো এই বাড়ির? চাকর নফর-ঝি চাকরানী-দশজনের চোখের সামনে দিয়ে রাতদিন ঐ ফষ্টিনষ্টি করতে যাওয়ায় মান সম্মান থাকলো কারো?

না হুজুরাইন, ফষ্টিনষ্টি করতে যায় না। ঐ মৌলভী সাহেবের তয়তদবির

ঠিক মতো হচ্ছে কি না, তা দেখতে যায়।

বেগম সাহেবা ফের দাঁত পিষে বললেন– দেখতে যায়? আমাকে পাগল বুঝাচ্ছো? একজন জোয়ান চাকরের ঘরে জোয়ান মেয়ে হয়ে বার বার একা একা যাওয়াটা কি তয়তদবির করতে যাওয়া, না ফূর্তি লুটতে যাওয়া? আমি কি বুঝিনে কিছু? তবু যদি আমার তেজারত আলীর মতো একজন চরিত্রবান ভদ্র সন্তান হতো! একজন চাকরের কি চরিত্র বলে থাকে কিছু?

প্রতিবাদের সুরে পরীর মা বললো– জি হুজুরাইন, থাকে। ঐ মৌলভী সাহেব খুবই চরিত্রবান লোক। তার ঘরে গেলে ভয়ের কিছু নেই।

বেগম সাহেবা সক্রোধে বললেন- আমার তেজারত আলীর চেয়েও কি সে অধিক চরিত্রবান? মানী লোক ছাড়া আমার তেজরত আলী জীবন গেলেও কোন নীচু শ্রেণীর মেয়ের ছায়াটিও মানায় না। আর শবনম, মানী ঘরের মেয়ে হয়ে পাইট কিষাণের সাথে ঢলাঢলি করছে। পাইট কিষাণ কেউ চরিত্রবান হয়, তা কি কেউ কোনদিন দেখেছে?

: হুজুরাইন!

তোমাদের ঐ পাইটকিষাণ মার্কা নূরু মিয়ার মতো সৎ কি আমার তেজারত আলী নয়?

না হুজুরাইন, নয়। ঐ মৌলভী সাহেব যে রকম সৎ তার একশো ভাগের এক ভাগ সৎও আপনার তেজারত আলী নয়।

ফেটে পড়লেন বেগম সাহেবা। বললেন– খুন করবো। এত বড় কথা বলতে সাহস হয় তোমার? কিসে আর কিসে!

: আমার কথা নয় হুজুরাইন। এটা ঐ শবনম সাদিকা হুজুরাইনের কথা।

শবনম সাদিকার?

জি হুজুরাইন। তাঁর কথা। তবে তাঁর কথা যে সত্যি, তা আমি বিশ্বাস করি।

তার অর্থ?

: উনি মিথ্যা বলেন না।

: মিথ্যা বলেন না? ওর কথা যে সত্যি তা তুমি জানো?

জানি হুজুরাইন। ঐ শবনম হুজুরাইনের মতো আমিও যে জানি ঐ মৌলভী সাহেবের চরিত্র ফেরেশতার মতো চরিত্র। শবনম আম্মাজান মিথ্যা বলবেন কেন?

বেগম সাহেবা ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে বললেন– পুঁতে ফেলবো। জ্যান্ত পুঁতে ফেলবো। বেরোও বেরোও আমার ঘর থেকে। যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা? আমার তেজারত আলীর চরিত্র কি ফেরেশতার মতো নয়?

এই সময় হন্তদন্ত হয়ে সেখানে এলেন খান বাহাদুর সাহেব। বললেন– বেগম সাহেবা, শিগগির আপনার একবার আপনার বোনের বাড়িতে যাওয়া দরকার।

বেগম সাহেবা প্রশ্ন করলেন– কেন-কেন?

খানবাহাদুর সাহেব বললেন-- আপনার বোনপুত তেজারত আলী মৃত্যু শয্যায়।

সে কি- সেকি! কি হয়েছে তার? মানে, কি হয়েছিল?

মদ খেয়ে সে নাকি জোর করে এক বাগদীর মেয়েকে বেহুরমতি করেছে। তাই বাগদীরা সবাই এক জোট হয়ে তেজারত আলীকে ধরে বেদম মার মেরেছে। হাড়গোড় ভেঙ্গে দিয়েছে।

বেগম সাহেবা ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললেন– মিথ্যা কথা মিথ্যা কথা। আমার তেজারত আলী সোনার ছেলে। সে মোটেই চরিত্রহীন নয়।

খান বাহাদুর বললেন– নয়?

না, নয়। আপনি কি করে জানলেন একথা?

কেরামত আলীর কাছে শুনলাম। আপনার বোন এ খবর দেয়ার জন্যে কেরামত আলীকে যে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সে পথ ঘাট আর আমাদের বাড়ি চেনে কিনা!

কোথায় সে? ঝাঁটা মারবো। কেরামত আলী মুখে চ্যাক্‌চ্যাক্‌ করে দশ গোণ্ডা লাথি মারবো। নিশ্চয়ই ঐ শয়তান ষড়যন্ত্র করে মিথ্যা খবর দিয়েছে। কোথায় সে?

ম্যানেজার সাহেবের দপ্তরে তাকে বসিয়ে রেখেছি। তার সাথে বেগম সাহেবা দুর্ব্যবহার করবেন ভয়ে, সে বেগম সাহেবার সামনে আসেনি। তাই...

না আসলে কি হবে? আমি কি ওকে ছেড়ে দেবো? ঐ মিথ্যা কথা বলার জন্যে ওর মুখ ভোতা করে তবে ওকে এ বাড়ি থেকে যেতে দেবো।

আহহা! ওর উপর ক্ষেপছেন কেন বেগম সাহেবা? ও কি মিথ্যা কথা বলেছে?

একশো বার মিথ্যা কথা বলেছে। আপনার ঐ গুণবতী মেয়ে শবনমের

যুক্তিতে এ মিথ্যা কথা বলেছে।

সে কি! শবনম যুক্তি দিতে যাবে কেন?

যাবেই তো। নিজে যে ঘোর ব্যাভিচারিনী। চাকর নফরের সাথে দিনরাত ফষ্টিনষ্টি আর ব্যাভিচার করে চলেছে। তার নিজের চরিত্র নেই। তাই আমার বোনপুতেরও যে চরিত্র নেই, সেটা তাকে বোঝাতে হবে না?

খান বাহাদুর সাহেব রুষ্ট কণ্ঠে বললেন– খবরদার বেগম! আর যা বলার তা বলুন, কিন্তু আমার শবনম আম্মার কোন বদনাম দেবেন না। এটা আমি সহ্য করবো না।

তা করবেন কেন? আপনার ঐ ভবঘুরে নফর নূরু মিয়ার সাথে সে কি ঘেন্নাঘাঁটি করছে, চোখ থাকলে গিয়ে দেখে নিন গে। চোখ আপনার জুড়িয়ে যাবে।

: বেগম, শিষ্টাচার একেবারেই বর্জন করবেন না।

: আমি শিষ্টাচার বর্জন করবো কেন? আপনারাই তো তাকে সোহাগ করে এই মহলে এনে তুলেছেন। আপনার ঐ সোহাগী মেয়েটা যাতে করে মান সম্মান বিলিয়ে দেয়ার সুযোগ পায়, সেই ব্যবস্থাই করেছেন।

আহ- বেগম! নূরু মিয়া অত্যন্ত গুণবান করিৎকর্মা আর সচ্চরিত্রের ছেলে। সে কারণেই তাকে তার যোগ্য মর্যাদা দিয়েছি। আমার শবনম আম্মাজানও অত্যন্ত চরিত্রবতী মেয়ে। নূরুমিয়ার সুখ স্বাচ্ছন্দের দেখভাল সে করতেই পারে। সে জন্যে তার সম্বন্ধে কোন বাজে কথা বলবেন না।

: তা তো বলবেনই। এই পাঁচ-সাতটা দিন ধরে সেই নফরটাকে নিয়ে যে সে দেশ বিদেশ চষে বেরিয়ে এলো, রাস্তাঘাটে এণ্ডার ঢলাঢলি করে এলো, তাতো দেখবেন না।

: আপনি জানেন, সে ঢলাঢলি করে এসেছে?

জানা লাগবে কেন? আমার কি আন্দাজ নেই? সবুর করেন, আরো কত কেলেংকারী ঘটে তা টের পাবেন।

: বেগম!

বয়স হয়েছে মেয়ের। হয়েছে বলছি কেন? বয়স গড়িয়ে যাচ্ছে তবু বিয়ে শাদি দিচ্ছেন না। অঘটন ঘটবে না?

: আপনি কি বলতে চান?

বলবো আর কত! দিনের পর দিন বলে আসছি- তেজারত আলীর সাথে

শবনম সাদিকার শাদিটা জলদি জলদি সেরে ফেলুন। আর দেরী করবেন না। আপনিই কেবল আজ না কাল- আজ না কাল করে শাদিটা ঝুলিয়ে রাখছেন। আপনার মতলবটা কি বলুন তো?

: মতলব! মতলব আবার কি?

বয়সটা তো আমার তেজারত আলীরও হয়েছে। এই আশায় না থাকলে তেজারত আলীর শাদিটাও এতদিন অন্যত্র হয়ে যেতো, এই মিথ্যা দুর্নাম রটতো না। কথাবার্তা পাকাপাকি হওয়ার আর সবাই জানাজানি হওয়ার পরও আপনি গড়িমসি করছেন কেন?

: বেগম!

কসম খেয়ে আমার কাছে যে ওয়াদা করেছেন, সেটা কি আজ না করতে চাচ্ছেন?

আরে না করবো কেন? মেয়ের মতটা হওয়া চাইতো। সে কি জীব জন্তু যে ধরে বেঁধে যা ইচ্ছে তাই করবো? তার মতামতটা আগে নিয়ে নিই।

: তার মতামত আপনি কোন দিনই পাবেন না।

: কেন, পাবো না কেন? www.boighar.com

কি করে পাবেন। যে মাতামাতি শুরু করেছে, তাতে আপনাদের সাধের ঐ চাকর নূরুটাকে ছাড়া সেকি অন্য কাউকে শাদি করতে রাজী হবে কখনো?

এ আবার কি বলছেন বেগম সাহেবা?

বলবো না কেন? যে দিন সবার মুখে চুনকালী দিয়ে ঐ চাকরটার সাথে বেরিয়ে যাবে, সেদিন আপনি নিজেই দেখতে পাবেন। আপনি দেখবেন, দশ গাঁয়ের দশজন দেখবে।

: বেগম!

মুখ পোড়াবে মুখ পোড়াবে। আপনার এই জমিদারীর মান সম্মান ধূলায় লুটিয়ে দেবে। যদি কথা আমার মিথ্যা হয় আমার নামে দশটা কুত্তা পালবেন।

মুখ ঝামটা মেরে সেখান থেকে সরে গেলেন খান বাহাদুর সাহেবের সাধের দ্বিতীয় স্ত্রী গুলজাহান বানু বেগম।

কয়েকদিন খুব ধকল যাওয়ায় মৌলভী নূরু মিয়ার গায়ে জ্বর উঠলো অকস্মাৎ। দুইদিন দুই রাত সে চেতন্যহীন অবস্থায় রইলো। শবনম সাদিকাও এ সময় দিন রাত নূরু মিয়ার পাশে খুঁটির মতো বসে রইলো এবং পরীর মা ও কেতাব আলীদের নিয়ে নূরু মিয়ার শুশ্রূষা করতে লাগলো। জমিদার সাহেবও মাঝে মাঝেই এসে নুরু মিয়াকে দেখে গেলেন আর তার শশ্রূষার জন্যে সবাইকে আরো অধিক তৎপর হতে বললেন। এলেন না কেবল নয়া বেগম গুলজাহান বানু বেগম। উল্টো শবনম সাদিকাকে সব সময় কাছে রাখার জন্যে নূরু মিয়া খামাখাই মক্কর ধরেছে বলে মন্তব্য করতে লাগলেন।

শুশ্রূষা আর সুচিকিৎসার ফলে দিন তিনেকের মধ্যেই নূরু মিয়ার জ্বর অনেকখানি কমে গেল এবং আটদশ দিনের মধ্যেই সে সুস্থ হয়ে উঠে বসলো ও চলে ফিরে বেড়াত লাগলো। আরো কয়েকদিন বিশ্রাম নেয়ার পর তার মধ্যে আর কোন দুর্বলতা রইলো না।

অসুখ থেকে উঠার পর নুরু মিয়া এখন প্রায়ই খামারবাড়ির বারান্দায় এসে বসে। আজও তাই বসেছিল এবং কেতাব আলীসহ কয়েজন পাইট কিষাণের সাথে গল্প আলাপ করছিল। উল্লেখ্য যে, ইমাম মৌলভী নূরু মিয়ার সবাই এরা মুরিদ। এই গল্প-আলাপ করার কালে জনা তিনেক লোক এসে সালাম দিয়ে দাঁড়ালো। আগন্তুকদের মধ্যে কম বয়সের এক পরিপাটি লোক বললো– আমাদের বাড়ি অনেক দূরে। এদিকে একটা কাজে এসেছিলাম। খুব পানির তেষ্টা পাওয়ায় আমরা আপনাদের এখানে উঠেছি।

কথা বললো কেতাব আলী। সে বললো– ও আপনারা পানি খাবেন! বসুন। এই যে এখানে একটা ফাঁকা বেঞ্চ আছে এই বেঞ্চে বসুন।

আগন্তুকেরা বসলে কেতাব আলী কিষাণদের একজনকে উদ্দেশ্য করে বললো– সমজান মিয়া ঘরের ভেতর থেকে এক জগ পানি আর একটা গ্লাস আনো তো। এঁদের পানি খাওয়াও।

সমজান মিয়া পানির গ্লাস আর জগ নিয়ে এলে কেতাব আলী আগন্তুকদের উদ্দেশ্য করে বললো– আমরা দুঃখিত। এটা খামার বাড়ি। স্রেফ পানি ছাড়া মুখে দেয়ার এখানে কিছু নেই। শুধুই পানি খেতে হবে। যদি একটু সময় দেন, তাহলে মালিকের বাড়ি থেকে বাতাসা বা গুড় যা হোক একটা কিছু আপনাদের মুখে দেয়ার জন্যে এক দৌড়ে নিয়ে আসি।

আগন্তকদের যে কথা বলছিল সেই বক্তা বললো– না-না, কিছু মুখে দিতে হবে না। যেখানে গিয়েছিলাম কিছু আগে সেখান থেকে বেশ খাওয়া দাওয়া করে এসেছি। পানির তেষ্টাটা সেই জন্যেই পেয়েছে। গরমের দিন তো। দিন-দিন, পানি দিন। সেরেফ পানি খেতেই এসেছি।

কিষাণ সমজান মিয়া গ্লাসে পানি ঢেলে ঢেলে এক এক করে তিন জনকেই খাওয়ালো। পানি খেয়ে মুখ মুছে বক্তা ব্যক্তিটি নিকটে বসা নূরু মিয়ার মুখের দিকে তাকিয়েই চমকে উঠলো। নূরু মিয়ার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে দেখতে দেখতে প্রশ্ন করলো– আপনি! আপনি কে? আপনি কি এখানে থাকেন?

আবার জবাব দিল কেতাব আলী। বললো– হ্যাঁ, এখানেই থাকেন। এখানেই মৌলভীগিরি করেন।

মৌলভীগিরি করেন? ইনার নাম?

: ইনার নাম মৌলভী নূরু মিযা! আপনার নাম?

: আমার নাম জহিরুদ্দীন খামারু।

: আপনি একে চেনেন?

জহিরুদ্দীন খামারু আমতা আমতা করে বললো– না, ঠিক চিনি-না, ঠিক চিনি না। তবে খুব চেনা চেনা মুখ।

চেনা-চেনা মুখ?

: জি-জি। এইরকম চেহারার এক ছেলের সাথে আমি পড়তাম। ইনার মুখের আকৃতিটা অনেকটা সেই রকম।

: অনেকটা সেই রকম?

হ্যাঁ অনেকটাই। প্রায় ষোল সতের বছর আগের কথা। আমার বয়স তখন

বইঘর.কম ও রোকন

বছর বারো। আমি তখন যে পাঠশালায় পড়তাম, বছর দশকের এক ছেলেও পড়তো সেই পাঠশালায়। আমি তার এক ক্লাশ উপরে পড়তাম। এখন তার চেহারা কেমন হয়েছে জানিনে। আমার মনে হয় অনেকটা এই রকমই হয়েছে।

: বলেন কি! তা কোন পাঠশালায় পড়তেন?

ওরে বাবা! সে এখান থেকে অনেক দূরে। সে জায়গার নাম ইসলামপুর। সেই ইসলামপুর পাঠশালায় পড়েছি।

: তা, আপনার সাথে যে ছেলে পড়তো তার নাম কি ছিল?

তার নাম আমিন। খুব সম্ভব আমিনউদ্দীন না নূর উদ্দীন, কি যেন নাম ছিল। আমার ঐ আমিনটুকুই মনে আছে।

এ কথায় নূরু মিয়া অকস্মাৎ চঞ্চল হয়ে উঠলো। জহিরুদ্দীন খামারুর মুখের দিকে সে এক দৃষ্টে চেয়ে রইলো। কেতাব আলী জহিরুদ্দীনকে প্রশ্ন করলো– আপনার বাড়ি কি ঐ ইসলামপুরে?

জহিরুদ্দীন বললো– হ্যাঁ তখন তাই ছিল। কিন্তু আমার আব্বা সপরিবার ওখান থেকে উঠে এসে এইদিকে বাড়ি করায় আমি এখন এই দিকে থাকি!

তাজ্জব! ঐ অতদিনের কথা, মানে অতদিন আগে পাঠশালার পড়া সেই ছেলেটাকে আজও মনে আছে আপনার? ঐ যে আমিন না কি নাম?

থাকার কথা নয়। পাঠশালায় তখন আরো অনেক ছেলে ছিল। তাদের কারো কথা আজ আর মনে নেই। কিন্তু বিশেষ কিছু কারণে ঐ ছেলেটাকে আজও মনে আছে আমার।

: বিশেষ কারণ! কি সে সব কারণ?

প্রথম কারণ, আপনাদের এই মৌলভী সাহেবের মতো সে ছিল খুবই দর্শনধারী। দ্বিতীয় কারণ, সে ছিল যেমনই মেধাবী তেমনই দুর্ধর্ষ। তবে সব চেয়ে বড় কারণ অন্য একটা।

অন্য একটা?

ভাবতে আজও অবাক লাগে, বছর আষ্টেক বয়সের মমতা নামের এক মেয়ে মুহব্বতে পড়ে আমিনের। মস্তবড় এক বিপদ থেকে আমিন মমতাকে রক্ষা করে। সেই ঘটনার পর থেকে মমতা আমিনকে নিবিড়ভাবে ভালবেসে ফেলে। আমিনকে মমতা তাদের নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রাখার চেষ্টা

বইঘর.কম ও রোকন

করে। গার্জেনেরা রাজী না হওয়ায় সে কি তার কান্নাকাটি। বিশেষ করে ভয়ের কিছু মাত্র কারণেই মমতা আমিনকে অষ্টেপৃষ্ঠে আকড়ে ধরে থাকে। আর সে কিছুতেই আমিনকে ছেড়ে দিতে চায় না বা আমিনের কাছ ছাড়া হয় না।

ইতোমধ্যে জহিরুদ্দীন খামারুর সাথের লোক দুইটি বেঞ্চ থেকে উঠে রওয়ানা দিতে উদ্যত হলো। জহিরুদ্দীনকে উদ্দেশ্য করে তাদের একজন বললো– শিগগির এসো-শিগগির এসো। কত দূরে যেতে হবে, খেয়াল আছে? আমরা চললাম– বলেই লোক দুইটি রওয়ানা হলো। তা দেখে জহিরুদ্দীন খামারু তড়িঘড়ি সবাইকে সালাম দিয়ে সঙ্গীদের সঙ্গ নিলো সেও।

নূরু মিয়ার অবস্থা তখন অবর্ণনীয়। সে একটা চেয়ার, মানে কুরসীতে বসে ছিল। কুরসীর হাতলের সাথে মাথা লাগিয়ে সে সংবিতহীন অবস্থায় নীরব নিশ্চল হয়েছিল। আগন্তুকেরা চলে গেলে অন্যান্য কিষাণেরাও একে একে যে যার কাজে চলে গেল। নূরু মিয়া ঘুমিয়ে আছে বিবেচেনায় তার দিকে নজর দিলো না তারা কেউ। কিন্তু নজর দিলো কেতাব আলী। নূরু মিয়ার অস্থিরভাব আগাগোড়াই সে লক্ষ্য করে আসছিল। এক্ষণে তাকে কুরসীর উপর এলিয়ে পড়ে থাকতে দেখে কেতাব আলী শংকিতকণ্ঠে ডাক দিয়ে বললো– কি হলো হুজুর, আপনি এভাবে পড়ে রইলেন কেন? উঠুন-উঠুন। সোজা হয়ে বসুন।

www.boighar.com

কেতাব আলী চেয়ারে নাড়া দিলে সংবিত্ ফিলে এলো নূরু মিয়ার। সে আস্তে আস্তে উঠে সোজা হয়ে বসলো। তার দুই চোখ তখন অশ্রুতে ভেসে যাচ্ছে। কেতাব আলী সবিস্ময়ে বললো– সেকি হুজুর! আপনি কাঁদছেন কেন?

তার কথায় কান না দিয়ে নূরু মিয়া আপন মনে ফুঁপিয়ে গেয়ে উঠলো–

'আমি ভুলে গেছি তব পরিচয়,
তবু তোমারে তো আজও ভুলি নাই।
আজো জেগে আছে ভালবাসা,
অতীতের পানে যবে চাই–
তবু তোমারে তো আজও ভুলি নাই...।'

গান থামিয়ে নূরু মিযা নিশ্চল হয়ে বসে রইলো। কেতাব আলী ফের প্রশ্ন করলো - আপনার কি হলো হুজুর? আপনি হঠাৎ এমন হয়ে গেলেন কেন?

চেয়ার থেকে লাফ দিয়ে উঠে নূরু মিয়া বললো– আমি কিছু দিনের জন্যে

একটু বাইরে যাচ্ছি কেতাব আলী। ম্যাডামকে বলে যেতে পারলাম না বলে আমি দুঃখিত। তিনি যেন আমাকে মাফ করেন।

বলেই কেতাব আলী কিছু বুঝে উঠার আগেই নূরু মিয়া দৌড়ের উপর তার ঘরে গেল এবং ক্ষিপ্র হস্তে প্রয়োজনীয় কাপড় চোপড় ও অর্থকড়ি ব্যাগে পুরে নিয়ে তার গিট্‌তোলা সেই লাঠি হাত সবার অলক্ষ্যে বেরিয়ে গেল জমিদার খান বাহাদুরের বাড়ি থেকে। অন্যেরা তো দেখতে পেলোই না, কেতাব আলীও সেটা বুঝতেও পারলো না, দেখতেও পেলো না।

কেতাব আলী, সেটা বুঝতে পারলো নূরু মিয়াকে খোঁজা-খুঁজি শুরু হলে। খোঁজাখুঁজি করে নূরু মিয়াকে কোথাও না পেয়ে শবনম সাদিকা কেতাব আলীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলো- নূরু মিয়া নেই, তার কাপড় চোপড় আর লাঠিটাও নেই। সে যেন কোথায় চলে গেছে। তোমাকে কি কিছু বলে গেছে?

কেতাব আলী থতমত করে বললো– জি আপামনি, বলে গেছেন। শবনম সাদিকা উদ্‌গ্রীব হয়ে বললো– বলে গেছে? কি বলেছে?

বলেছেন– 'আমি কিছুদিনের জন্যে একটু বাইরে যাচ্ছি কেতাব আলী। ম্যাডামকে বলে যেতে পারলাম না বলে দুঃখিত। তিনি যেন আমাকে মাফ করেন।'

কেন কেন? একথা বললো কেন? হঠাৎ কি ঘটলো?

সে অনেক কথা আপামণি। খামার বাড়িতে বসে মৌলভী সাহেব আমাদের সাথে গল্প করছিলেন। এ সময় জনাতিনেক লোক সেখানে পানি খেতে এসে কি যেন কথাবার্তা তাঁকে বলে গেল মানে, তাদের একজনের পাঠশালায় পড়ার আমলের কথা। সেই সব কথা শুনে হুজুর একদম বেহাল হয়ে গেলেন। হুঁশ বুদ্ধি হারিয়ে ফেললেন। কি হয়েছে, আমি তা জানতে চাইলে মৌলভী হুজুর ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে তাঁর সেই প্রিয় গান মানে ঐ যে–

'আমি ভুলে গেছি তব পরিচয়,

তবু তোমারে তো আজও ভুলি নাই...'

ঐ গানটি কিছুক্ষণ আপন খেয়ালে গাইলেন। তার পরই কুরসী থেকে লাফিয়ে উঠে উনি ঐ কথা বললেন। মানে, বললেন– 'আমি কিছুদিনের জন্যে বাইরে যাচ্ছি কেতাব আলী। ম্যাডামকে বলে যেতে পারলাম না বলে আমি দুঃখিত। তিনি যেন আমাকে মাফ করেন।'

শুনে শবনম সাদিকা 'থ' মেরে গেলো। কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকার পর টলতে টলতে গিয়ে নিজ কক্ষে ঢুকলো।

'আমি কিছুদিনের জন্য একটু বাইরে যাচ্ছি কেতাব আলী'– মৌলভী নূরু মিয়া শুধু এই কথাটাই কেতাব আলীকে বলেছিল। কোথায় সে যাচ্ছে, সে কথা বলেনি। সে জায়গা খামারবাড়িতে পানি খেতে আসা আগন্তুক জহিরুদ্দীন খামারু কর্তৃক বর্ণিত ঐ ইসলামপুর পাঠশালা। ঐ পাঠশালার কথা মাঝে মধ্যে কিছু কিছু নূরু মিয়ার স্মৃতিপটে ভেসে উঠলেও ঠিক কোথায় সে পাঠশালা অবস্থিত আর এই পাঠশালাই যে তার অতীত স্মৃতির কেন্দ্র ভূমি, সেটা তার মনে তেমন জাগেনি। একটা মেয়েকে যে সে ছোটকালে ভালবেসেছিল বা সেই মেয়েটিই তাকে ভালবেসেছিল, শবনম সাদিকার মুখের আকৃতির মতো সেই মেয়েটির স্মৃতিটাই মনে আছে নূরু মিয়ার। কিন্তু সেই মেয়েটি কে, কি তার নাম, কোথায় তার বাড়ি– এসব বিলকুলই তার স্মৃতি থেকে মুছে গিয়েছিল। এতে করে ঠিকানা পরিচয় না থাকায়, অতীতের সেই ভাললাগা বা ভালবাসার মেয়েটির খোঁজে নানা স্থানে এ যাবত ঘুরে বেরিয়েছে নূরু মিয়া। শবনম সাদিকাকে দেখার পর সেই মেয়েটির স্মৃতি আরো দুর্বার হয়ে উঠে। আর শবনম সাদিকার মধ্যে সেই মুখের আদল থাকায় নূরু মিয়া আটকে যায় জমিদার খান বাহাদুর সাহেবের বাড়িতে। তাঁর খামার বাড়িতে বসে বসে– 'আমি ভুলে গেছি তব পরিচয়, তবু তোমারে তো আজও ভুলি নাই...' বলে এখন কেবল রোমন্থন করে সেই স্মৃতি।

এবার ইসলামপুর পাঠশালার আবছা আবছা স্মৃটিটা আগন্তুক জহিরুউদ্দীন খামারুর কথায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এবং সে মেয়েটির নাম মমতা, শোনা মাত্রই অতীতের বিস্মৃত স্মৃতিটা জীবন্ত হয়ে ধরা দিয়েছে নূরু মিয়ার কাছে। নাম ভুলে যাওয়া সেই নাম মমতা– এটা স্মরণ হওয়া মাত্রই সেই নাম আর স্থান মন্ত্রমুগ্ধের মতো টানতে থাকে নূরু মিয়াকে। ইসলামপুর পাঠশালা আর মমতা একসূত্রে গাঁথা, এটা অনুভব করা মাত্রই নূরু মিয়া জমিদার খান বাহাদুর সাহেবের বাড়ি থেকে বেরিয়ে সেই দিকে ছুটে।

ইসলামপুরে ছুটে এসে নূরু মিয়া দেখে সে পাঠশালা আর নেই। সেখানে প্রথমে হাই স্কুল ও পরে কলেজ তৈরি হয়েছে। সে দিন যারা দেখেছে আর এ পাঠশালায় পড়েছে, তারা ছাড়া আর কারো বলার সাধ্য নেই যে এখানে কোন পাঠশালা ছিল। সেই পাঠশালায় পড়া মেয়ে মমতা আজ কোথায়, সেটাও বলতে কেউ পারে না। অন্য কথায়, যারা পারে, তাদের কারোই হদিস নূরু

মিয়া খোঁজ করে পেলো না। বিপুল আগ্রহ নিয়ে দীর্ঘপথ পেরিয়ে এসে নূরু মিয়া হতাশায় নেতিয়ে পড়লো। বসে বসে ভাবতে ভাবতে নেমে এলো রাত। অগত্যা ঐ কলেজ বিল্ডিং-এরই বাইরের এক বারান্দায় শাটপাট শুয়ে পড়লো শ্রান্ত ক্লান্ত নূরু মিয়া।

শুয়ে পড়লো বটে, কিন্তু ঘুম তার এলো না। অতীত দিনের স্মৃতিটা মগজে তার মূর্ত হয়ে উঠে কেড়ে নিলো তার সারা রাতের ঘুম।

নবীরউদ্দীন খান একজন মস্তবড় জোতদার। ছোটখাটো জমিদারই বলা চলে। প্রচুর তার জোত-ভূঁই। উচ্চশিক্ষিত আর পরহেজগার। লোক হিসাবে বিরাট তার নাম ডাক। মাইনে করা কিছু সৎ কর্মচারী তাঁর জোতজমা দেখাশুনা করেন। নবীরউদ্দীন খান সাহেব সব সময় এবাদত বন্দেগী নিয়ে থাকেন। জলসা যিকির করেন। একনিষ্ঠভাবে শরীয়তের বিধান মতো চলেন।

এইটেই হলো তাঁর কাল। তখন ইংরেজ আমল। হিন্দুপ্রধান জায়গা এবং এক অত্যন্ত গোঁড়া প্রকৃতির হিন্দুদের জায়গা। ইংরেজ কর্মচারীদের ছত্রছায়ায় বিরাট এঁদের প্রতিপত্তি। এঁদের ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কারো যাওয়ার সাধ্য ছিল না। মস্তবড় জোতদার হলেও পাঁচ সাত ঘর ছাড়া মুসলমান বাসিন্দা সেখানে বেশী না থাকায়, নবীরউদ্দীন খানেরও সে সাধ্য ছিল না।

নবীরউদ্দীন খান সাহেব নিজের খরচে একটা মক্তব চালাতেন। হিন্দু বাবুদের হঠাৎ ইচ্ছা হলো, সেখানে তাঁরা একটা উচ্চ প্রাইমারী স্কুল খুলবেন। যাঁহা ইচ্ছা তাঁহা কাজ। হিন্দু ছাত্র শিক্ষক সমন্বয়ে সেখানে তাঁরা সে স্কুল খুললেন। সেই সাথে তাঁরা খান সাহেবকে জানালেন, তার মক্তব উঠিয়ে দিতে হবে। এক জায়গায় দুই প্রতিষ্ঠান চলবে না। খান সাহেবের মক্তবে মুসলমান ছেলেমেয়েরা তো আসতোই, আশপাশে আর কোন স্কুল না থাকায় অনেক হিন্দু পিতামাতাও তাঁদের ছেলেমেয়েদের সে মক্তবে পাঠাতেন। বাবুরা হুকুমের সুরে বললেন– এটা চলতে পারে না। হিন্দু মুসলমান সব ছাত্রছাত্রীর এই নতুন উচ্চ প্রাইমারী স্কুলে পাঠাতে হবে।

নবীরউদ্দীন খান সাহেব প্রতিবাদ করলেন। শুরু হলো সালিশ-দরবার। কিন্তু ইংরেজ কর্মচারীদের হস্তক্ষেপে খান সাহেবের প্রতিবাদ টিকলো না। মক্তব তাঁকে তুলে দিতে হলো আর মক্তবের ছাত্রছাত্রীরা সবাই এসে বাবুদের উচ্চ

বইঘর.কম ও রোকিন

প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হলো।

এতেও হয়তো চলতে পারতো। কিন্তু অসুবিধা দেখা দিলো পাঠ্য তালিকা নিয়ে। পাঠ্য তালিকার সবই হিন্দু দেবদেবী আর হিন্দু ধর্মের বিষয় ছাড়া মুসলমানদের কোন কথাই সে তালিকায় ছিল না। আরো করুণ ব্যাপার হলো, মুসলমান ছেলেমেয়েদের হিন্দু ছেলেমেয়েদের পাশে বসতে দেয়া হতো না। পাশে এবং ফাঁকে ভিন্ন সারিতে বাঁশের মাচায় তাদের বসতে হতো। হিন্দু ছাত্রছাত্রীরা বসতো কাঠের তৈরি বেঞ্চে আর মুসলমান ছেলেমেয়েরা বসতো বেঞ্চের মতো বাঁশের মাচায়।

এবার নবীরউদ্দীন খান সাহেব প্রবল আপত্তি তুললেন। এ ধরনের বৈষম্য করা হলে মুসলমান ছেলেমেয়েরা এ পাঠশালায় পড়তে আসবে না বলে হুমকি দিলেন। কিন্তু ফলাফল ঐ এক। শক্ত খুঁটির জোরে হিন্দু বাবুরা দরাজকণ্ঠে জানালেন, যারা না আসবে চলে যাক। ধরে রাখবে কে? এখানে এই নিয়মই চলবে।

নবীরউদ্দীন খান সাহেবের ছেলে নূরুদ্দীন আমিন তখন প্রথম শ্রেণীর ছাত্র। খুবই মেধাবী আর দর্শনধারী। হিন্দু ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রথম হওয়া ছেলে। অনেক চেষ্টা করেও শিক্ষকেরা তাকে দ্বিতীয় স্থানে নামাতে পারেনি। ব্যবহারেও মনোরম।

খান সাহেব তার ছেলে নূরুদ্দীন আমিনকে সে স্কুল থেকে সরিয়ে নিলেন এবং অন্যান্য মুসলমান ছেলেমেয়েদেরও সরে যেতে বললেন। কিন্তু আশপাশে আর কোন স্কুল মক্তব না থাকায় মাত্র কয়েকজন মুসলমান ছাত্রছাত্রী তাদের অভিভাবকরা সরিয়ে নিলেন, বাদবাকিরা সকলে ঐ বাবুদের স্কুলেই রয়ে গেল।

এবার এই সরিয়ে নেয়া ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার ব্যবস্থা করা কঠিন হয়ে গেল। সে সময় অবশ্য মুসলমান মেয়েরা পাঠশালায় গিয়ে বেশি লেখাপড়া করতো না। সমস্যা দেখা দিলো ছেলেদের নিয়ে। মুসলমানদের কোন স্কুল-পাঠশালা নিকটে ছিল না। যা ছিল তা সবই অনেক দূরে দূরে। ছাত্রছাত্রীরা সবাই নাবালক। যাঁরা পাঠশালার কাছে আত্মীয়-স্বজন পেলেন, সেখানে তাঁরা তাঁদের বাচ্চাদের ভর্তি করালেন। বাকীদের স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। তাদের পিতামাতা বাড়িতেই তাঁদের বাচ্চাদের বিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগলেন।

মুসিবতে পড়লেন নবীরউদ্দীন খান সাহেবও। কোন স্কুল-পাঠশালার কাছে

বইঘর.কম ও রোকন
তাঁর কোন আত্মীয়-স্বজন ছিল না। নূরুদ্দীন আমিনের মতো মেধাবী ছেলেকে বাড়িতে রেখে বিদ্যা শিক্ষা দেয়া মোটেই সঙ্গত নয়। চিন্তা করতে লাগলেন খান সাহেব। এই সময় খোঁজ পেলেন অনেক দূরে ইসলামপুরে তাঁর এক বিশ্বস্ত কর্মচারীর ভাই সেখানে থাকেন। ইসলামপুরে উন্নত মানের একটা পাঠশালাও আছে। মুসলিম নিয়ম কানুনে চলে। পাত্তা লাগালেন খান সাহেব। তাঁর সেই শুভাকাঙ্ক্ষী, অর্থাৎ তার কর্মচারীর ভাই আবদুল মজিদ সাহেব নূরুদ্দীন আমিনকে তার বাড়িতে রাখতে সাগ্রহে রাজি হলেন। আমিনও ছেলে মানুষ। কিন্তু সে খুবই সাহসী আর স্কুলে পড়াশোনা করার প্রতি খুবই আগ্রহী। তাই আমিনও প্রফুল্লচিত্তে এই দূর অঞ্চলে পড়তে আসতে রাজি হলো। কাল বিলম্ব না করে নবীরউদ্দীন খান সাহেব নূরুদ্দীন আমিনকে এনে এই ইসলামপুর পাঠশালায় ভর্তি করে দিলেন। www.boighar.com

ক্লাস ওয়ানের পড়া শেষ করার পরও নূরুদ্দীন আমিনকে ইসলামপুর পাঠশালায় এনে ঐ ক্লাস ওয়ানেই ভর্তি করা হলো। শমশাদ মমতা নামের এক মেয়েও সবেমাত্র ক্লাস ওয়ানেই উঠেছিল। শমশাদ মমতাও বেশ মেধাবী ছিল। শিশু শ্রেণী থেকে ক্লাস ওয়ানে ফার্স্ট হয়ে ওঠা মেয়ে। তবু ক্লাস ওয়ানের মমতা ক্লাস টু'-এর যোগ দেয়া ছাত্র নূরুদ্দীন আমিনের কোনক্রমেই সমকক্ষ ছিল না। ফলে এটা ওটা জেনে নেয়ার প্রয়োজনে মমতা অল্পদিনের মধ্যেই নূরুদ্দীন আমিনের বেশ নিকটে চলে এলো। মমতাও ছিল অত্যন্ত দর্শনধারী মেয়ে। এতে করে এটা ওটা জেনে নেয়ার প্রয়োজনের আগেই মানসিকভাবে তারা পরস্পর পরস্পরের সাথে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল।

পয়লা দিনেই এদের একাত্ম করে দিল ক্লাস ওয়ানে ওঠা আর এক মেয়ে মাজেদা খাতুন। পয়লা দিন নূরুদ্দীন আমিন ক্লাসে এসে বসতেই তার চেহারার দিকে তাকিয়ে মাজেদা খাতুনের দুই চোখ ফুটে উঠলো। মাজেদা খাতুন অভিভূত হয়ে গেল। কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকার পর সে পাশে বসা মমতাকে ঠেলা দিয়ে বললো– এই এই, দ্যাখ-দ্যাখ, ঐ ছেলেটার চেহারাটা দ্যাখ। কি সুন্দর চেহারা! একদম রাজপুত্রের মতোরে! পক্ষীরাজ ঘোড়া নিয়ে উড়ে আসা রাজপুত্রের মতো।

নূরুদ্দীন আমিনের আব্বা নূরুদ্দীন আমিনকে ইসলামপুরে এনে আবদুল মজিদ সাহেবের বাড়িতে রাখলেন। ঐ দিনই অন্য স্কুল থেকে আসা শমশের আলী নামের আর এক ছেলেকে এনে তার আব্বা আবদুল মজিদ সাহেবের বাড়ির পাশের বাড়িতে রাখলেন এবং ক্লাস ওয়ানে ভর্তি করে দিয়ে গেলেন। শমশের

আলী নূরুদ্দীন আমিনের মতো মোটেই দর্শনধারী ছিল না। তবু পাশাপাশি থাকার কারণে আমিন আর আলী ক্লাসে আসার আগেই বেশ পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিল। প্রথম দিন দুইজন এক সাথে ক্লাসে এলো আর পাশাপাশি বসলো।

এদিকে নূরুদ্দীন আমিনের খুবসুরাত দেখে আওয়ারা হয়ে গেল মাজেদা খাতুন। ওদিকে শমশাদ মমতার চেহারা দেখামাত্রই উদ্বেলিত হয়ে উঠলো শমশের আলী। পাশে বসা আমিনকে মৃদু একটা ধাক্কা দিয়ে আলীও বললো– ওরে বাস্‌রে! দ্যাখ্ দ্যাখ্, মেয়েটা কি ভীষণ সুন্দরী! একদম রাজনন্দিনী!

আলী ও মাজেদা এই প্রথম দেখলো যথাক্রমে মমতা ও আমিনকে। অন্যদিকে মমতা ও আমিন এই প্রথম দেখলো তারা দুইজন দুইজনকে। আলী ও মাজেদার তাকিদে আমিন ও মমতা এই প্রথম দুইজন দুইজনের দিকে তাকালো। তাকিয়েই খুন হলো দুইজন। তারা আত্মবিস্মৃত হয়ে গেল। বিস্ফারিত নেত্রে দুইজন চেয়ে রইলো দুইজনের দিকে। কতক্ষণ চেয়েছিল তা তাদের খেয়াল নেই। খেয়াল হলো তাদের অবস্থা দেখে ক্লাসের সকল ছেলেমেয়ে সশব্দে হেসে উঠলে।

লজ্জা পেয়ে আমিন ও মমতা তৎক্ষণাৎ নামিয়ে নিলো চোখ। অন্যদের সাথে হেসে উঠেছিল মাজেদা আর আলীও। আবার আলী আমিনকে আর মাজেদা মমতাকে মৃদু ঠেলা দিয়ে বললো– কিরে, মনে ধরে?

ফের শরম পেলো আমিন ও মমতা। দুইজনই বললো– ধ্যাৎ!

থামলো না মাজেদা। সে মমতাকে বললো– তোদের দুইজনের বিয়ে হলে যা মানাবে না, সবাই হা করে দেখবে।

এবার মমতা কিছু বলার আগেই কথা বললেন পাঠশালার শিক্ষক। তিনি ক্লাস 'টু'-এর ছেলেমেয়েদের পড়াচ্ছিলেন। এবার তিনি এদিকে নজর দিয়ে বললেন– এই! তোমরা গোলমাল করছো কেন? স্লেট পেন্সিল নাও আর 'এ বি সি ডি' লেখো।

সেদিন কে কি লিখলো, মাস্টার সাহেব সেটা দেখার সময় পেলেন না। শিশু শ্রেণী থেকে প্রথম শ্রেণী, মানে ক্লাস ওয়ানে উঠেছে সবাই। ইংরেজি অক্ষর অনেকেই তেমন রপ্ত করতে পারেনি। তাই তারা 'এ' থেকে 'জেড' পর্যন্ত সব অক্ষর লিখতে পারলো না। কিন্তু আমিনের এ সব আগেই রপ্ত করা ছিল। ঘট্ ঘট্ করে সে স্লেটের দুই পিঠ ভর্তি করে সব অক্ষর লিখে ফেললো। কেউ

বইঘর.কম ◊ রোকন

খেয়াল না করলেও খেয়াল করলো মমতা। মমতার কিছুটা দখল থাকায় সেও অনেকগুলো অক্ষর লিখে ফেললো। কিন্তু সবগুলো পারলো না। ঘাড় টানা দিয়ে দিয়ে সে আমিনের লেখা দেখে লেখার চেষ্টা করলো। কিন্তু দূরে বসার জন্যে সে আমিনের লেখাগুলো স্পষ্ট দেখতে পেলো না।

বুদ্ধিমতী মেয়ে শমশাদ মমতা। পরের দিন এসেই সে সরাসরি আমিনের পাশে বসলো। সুন্দরী মমতা পাশে এসে বসায় আমিনও খুশি হলো। অন্যদিকে একটু চেপে বসে সে মমতার আরামে বসার জায়গা করে দিলো। আজ মাস্টার সাহেব এসেই প্রথমে ক্লাস ওয়ানের দিকে নজর দিলেন। এসেই তাদের বললেন– এক থেকে বিশ পর্যন্ত সংখ্যা ইংরেজিতে লেখো। একটু পরেই এসে আমি তা দেখবো।

মাস্টার সাহেব ক্লাস 'টু'-এর ছেলেমেয়েদের কাছে চলে গেলেন। লিখতে গিয়ে এবারও ঠেকে গেল অনেকে। কিন্তু আমিন সব সংখ্যা লিখে ফেললো। দুই তিনটে সংখ্যা আমিনের কাছে শিখে নিয়ে মমতাও লিখে ফেললো সবগুলো। এখানে সবাই শিক্ষককে 'স্যার' বলে। একটু পরে স্যার এসে লেখা দেখলেন। দেখলেন, একমাত্র আমিন আর মমতা ছাড়া কেউই লিখতে পারেনি সংখ্যাগুলো। আমিন আর মমতাই নির্ভুল লিখেছে দেখে তিনি খুব খুশি হয়ে বললেন, সাব্বাশ! তোমরাই দেখছি সবচেয়ে ভাল করবে এই ক্লাসে। তোমরাই খুব মেধাবী।

এরপর তিনি ক্লাসের সকল ছাত্রছাত্রীকে উদ্দেশ্য করে বললেন– এবার তোমরা বাইরে যাও। বাইরে গিয়ে নামতা পড়ো। একজন সুর করে আগে বলে যাও, অন্যেরা সবাই এক সাথে সুর করে তা ধরো।

শমশাদ মমতা বললো– নামতা স্যার! কোন নামতা?

স্যার বললেন– শতকিয়াটা তো শিশু শ্রেণীতে পড়েছো। ওটাই আগে আর একবার ঝালিয়ে নাও। এরপরে কড়াকিয়া, গোণ্ডাকিয়া, গুণের নামতা– কত নামতা আছে। সবই পড়তে হবে। আজ যাও, শতকিয়াটা শুরু করো। কে পড়াবে বলো? মানে, আগে আগে কে বলে যাবে?

ছেলেমেয়েরা সবাই মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলো। তা দেখে মাস্টার সাহেব বললেন– সে কি! কেউ কথা বলছো না যে? এরই মধ্যে সব ভুলে গেছো? মমতা, তোমার খবর কি? তুমিও পারবে না? আগে তো তুমিই পড়াতে?

বইঘর.কম ও রোকন

শমশাদ মমতা আমতা আমতা করে বললো– পারবো স্যার। তবে–

: তবে?

: মাঝে মধ্যে একটু আধটু বেধে যেতে পারে।

: না-না, বেধে গেলে তো চলবে না। ছর ছর করে বলে যেতে হবে।

এরপর তিনি মুখ তুলে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন– সেটা কে পারবে?

এবার নূরুদ্দীন আমিন হাত তুলে বললো– আমি পারবো স্যার!

স্যার বললেন– পারবে? তোমার বেধে যাবে না?

না স্যার! শতকিয়া তো বেধে যাওয়ার কথাই নয়, অন্য নামতাগুলোও ভালভাবে মুখস্থ করা আছে। ওগুলোও ইনশাআল্লাহ বাধবে না।

অত্যন্ত খুশি হয়ে মাস্টার সাহেব বললেন– মারহাবা! মারহাবা! তাহলে আজ তুমিই পড়াও। এরপরে–

শমশাদ মমতা সঙ্গে সঙ্গে বললো– এর পরে আমিই পড়াবো স্যার? আজ একটু আওড়ালেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

স্যার বললেন– হ্যাঁ, তাই আওড়াও। এরপরে এই ছেলের মানে তোমার নামটা যেন কি?

নূরুদ্দীন আমিন বললো– আমিন স্যার, আমার নাম নূরুদ্দীন আমিন।

স্যার বললেন– ও আচ্ছা।

মমতাকে উদ্দেশ্য করে বললেন– এর পরে এই আমিনের সাথে তুমিও পড়াবে।

স্যার চলে গেলেন। ছেলেমেয়েরা সবাই বাইরে গিয়ে নামতা পড়তে লাগলো। সকলের ধারণা ছিল, এ ছেলেরও বেধে যেতে পারে। কিন্তু আমিনের এমন নির্ভুল আর অনর্গল আওড়ানো দেখে, অন্যান্য সবার সাথে মমতাও মুগ্ধ হয়ে গেল। নামতা শেষ করে ক্লাসে ফিরে আসতে আসতে মাজেদা বললো– তুই মরেছিস রে মততা! এই ছেলে নির্ঘাত তোকে খাবে।

মমতা বললো– খাবে মানে?

মাজেদা বললো– তোর ফার্স্ট হওয়া শ্যাষ! এখন থেকে ও-ই ফার্স্ট হবে।

: যার সে যোগ্যতা আছে, সে ফার্স্ট হবে না?

মাজেদা গালে হাত দিয়ে বললো– ও-ম্মা! ও ফার্স্ট হলে তোর মন খারাপ

বইঘর.কম ও রোকন

হবে না?

মমতা বললো– খারাপ হবে কেন? ও ফার্স্ট হলে আমি খুব খুশিই হবো।

কেন কেন?

এমন সুন্দর দেখতে। ও ফার্স্ট না হলে যাকে তাকে ফার্স্ট হওয়া মানায়?

: তুইও তো খুব সুন্দরী। তোকে মানায় না?

না, এখন আর মানায় না। এখন আমি সেকেন্ড হলেই খুব খুশি হবো। এমন সুন্দর ছেলের পাশে সেকেন্ড হয়ে থাকতে পারাটা বড়ই ভাগ্যের কথা।

সেটাই তুই চাস?

: চাই চাই। মন দিয়ে চাই।

: বুঝেছি বুঝেছি।

: মানে?

ওর সাথে বিয়ে হলে তুই...!

যাহ্!

এরপর আমিনের পাশে বসা আর আমিনের সাথে গলা মিলিয়ে নামতা পড়ানো নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে গেছে মমতার। দিনে দিনে আমিন তার খুবই প্রিয় হয়ে গেছে। সবকিছুতেই মমতা এখন আমিনের সাথে থাকতে চায়। আমিনকে সাথে পেলে সে খুবই জীবন্ত হয়ে উঠে, না পেলে একেবারেই মন মরা।

www.boighar.com

এটার প্রমাণ পাওয়া গেল কয়েকদিন পরই। টিফিন হলে ক্লাস ওয়ানের ছেলেমেয়েরা সবাই এখন পাঠশালার পাশে খোলা জায়গায় খেলতে যায়। বউচুরি, গোল্লাছুট, বদন– এই সব খেলা। বউচুরি খেলার বড় ভক্ত মাজেদা খাতুন। তারই নেত্রীত্বে বউচুরি খেলা খেলে এরা। বউচুরি খেলা একা খেলা যায় না। সব ছেলেমেয়ে দুই দলে ভাগ হয়ে খেলে। এই দুই দলে ভাগ হতে দুইজন লিডার বা প্রধান লাগে। এই প্রধান হয় মাজেদা আর মমতা। তারা সব ছেলেমেয়েকে দুই ভাগে ভাগ করে নেয়। দুই দলে ভাগ হয়ে একদল আর এক দলের বিরুদ্ধে মার মার কাট কাট খেলে। এই দল ভাগ করার পদ্ধতিটাও মজাদার। যার যাকে ইচ্ছা তাকে সে তার দলে নিতে চাইলেই হবে না। যার ভাগ্যে যে পড়ে তাকে নিতে হবে। দুই নেত্রী পাশাপাশি বসে ভাগ্য যাচাই করে নেয়। সমান সমান উচ্চতার আর শারীরিক গঠনের

ছেলেমেয়েরা দুইজন করে মুষ্টিবদ্ধ হাতে নেত্রীদের কাছে এসে দাঁড়ায় আর বলে– কে নেবে ঘাস, কে নেবে পাতা?

দুই নেত্রীর একজনের পর একজনের ডাকার পালা আসে। যার পালা আসে সে বলে, আমি নেবো পাতা।

তখন দুইজনই বন্ধ করা মুঠ খোলে। যার হাতে পাতা থাকে, তাকে সে পায়। এইভাবে একের পর এক মেয়ের জোড়া আর ছেলের জোড়া আসতে থাকে। মমতার ডাকার সময় এলো। আমিন আর আলীরা দুইজন। আলী বললো– কে নেবে খোলা আর কে নেবে তুলা?

খোলা মানে মাটির হাঁড়ির ভাঙ্গা টুকরো। মমতার আকাঙ্ক্ষা আমিনকে পাওয়ার। মনে মনে আল্লাহকে ডাকতে ডাকতে সে বললো– আমি নেবো খোলা।

এবার হাত খুললো দুইজনই। মমতার ভাগ্যের জোরে আমিনের হাতে ছিল খোলা। প্রথম দিনেই আমিনকে সাথে পেয়ে মমতার সেকি আনন্দ! উল্লাসে নেচে উঠে মমতা সেদিন দৌড়ঝাঁপ করে খেললো।

পরের দিন আমিন মমতার ভাগে পড়লো না। পড়লো আলী। আমিনকে না পেয়ে মমতা খুবই মন মরা হয়ে গেল। আমিনের বিরুদ্ধে খেলতে তার মোটেই ভাল লাগলো না। মিনিট দুই তিন খেলার পরই পেটব্যথা করছে ভলে মমতা ক্লাসে ফিরে গিয়ে চুপচাপ বসে রইলো।

এই একই অবস্থা হলো অতঃপর। মমতা যেদিন আমিনকে তার দলে পায়, সেদিন খেলাতে তার উৎসাহের সীমা অবধি থাকে না। আমিনকে না পেলে একটা না একটা অজুহাতে সে খেলা ছেড়ে ক্লাসে গিয়ে বসে থাকে।

মমতা সাথে না থাকলে টিফিন পিরিয়ডে বাইরে এসে খেলতে ভাল লাগে না আমিনেরও। তাই, পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে সেও ক্লাসে এসে বসে থাকতে লাগলো। মমতা আস্তে আস্তে ছেড়েই দিলো বাইরে এসে বেয়ারার মতো দৌড়ঝাঁপ করে খেলা। তাছাড়া কতগুলো ছেলেমেয়ে খুবই নোংরা আর অসভ্য। মাঝে মাঝে খুবই বিশ্রী কথা বলে। ইতরের মতো তারা নিজেরা মারামারি করে।

মমতার দেখাদেখি খেলা ছেড়ে দিল আমিনও। তারা এখন এ সময় ক্লাসে বসে গল্পগুজব করে। অন্য ছেলেমেয়েরা এ সময় ক্লাসে তেমন থাকে না। তাই তাদের গল্প আলাপে কোন বিঘ্ন ঘটে না। প্রথম প্রথম দুই একদিন তারা

মাজেদা আর আলীর ঠাট্টা নিয়ে হাসাহাসি করলো। মমতা বললো– ঐ মাজেদারা কি পাজি দেখেছো? আমাদের নিয়ে কি বাজে কথা বলে। ওরা ওদের ইচ্ছার কথা আমাদের শোনায়।

কিন্তু এ আলাপ বেশি দিন চললো না। এ আলাপে শরম পেতে লাগলো আমিন মমতা দু'জনেই। তাই এসব কথা ছেড়ে দিয়ে মমতা অন্য প্রসঙ্গে গেল। বললো– আচ্ছা আমিন, এর আগে তুমি যেখানে পড়তে, সেখানে কি ষান্মাসিক-বার্ষিক সব পরীক্ষায় তুমি ফার্স্ট হতে?

আমিন বললো– হ্যাঁ, তাই হতাম।

মমতা ফের প্রশ্ন করলো– কোন্ ইস্কুলে পড়তে তুমি?

আমিন বললো– সে অনেক দূরে। এ জেলাতে নয়। অন্য জেলায়।

তোমার বাড়ি কোথায়?

বাড়িও আমার ওখানে। অনেক দূরে।

এখানে কোথায় থাকো?

আমার আব্বার এক চেনা লোকের বাসায়। সে লোক আমাদের সবাইকে খুব ভালবাসে।

ও, চেনা লোকের বাসায় থাকো? কোন আত্মীয়ের বাসায় নয়? মানে, সে তোমাদের কোন আত্মীয় হয় না।

: না।

: তোমার মন খারাপ হয় না?

একটু একটু হয়, তবে বেশি খারাপ হয় না। তা তোমার বাড়ি তো এই গাঁয়েই, তাই নয় মমতা?

মমতা শশব্যস্তে বললো– না-না, আমার বাড়িও এ গাঁয়ে নয়, অনেক দূরে।

সে কি! অনেক দূরে?

: অনেক অনেক দূরে। এত দূরে যে তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।

তাজ্জব! তোমার বাড়িও অনেক অনেক দূরে। তাহলে এখানে থাকো কোথায়?

: এখানে আমি আমার নানীর বাড়িতে থাকি।

: নিজের নানী?

: হ্যাঁ, নিজের নানী। নানা নাই। কিন্তু নানী আমাকে খুবই ভালবাসেন।

: আচ্ছা। তা কবে থেকে এখানে আছো?

অনেক দিন থেকে। যখন 'ক-খ' পড়ি, সেই তখন থেকে। যাবে তুমি আমার নানীর বাড়িতে বেড়াতে?

: তোমার নানীর বাড়িতে?

হ্যাঁ! বেশি দূরে নয়। এই নিকটেই। তুমি গেলে আমার নানী খুবই খুশি হবেন।

: তাই? তাহলে যাবো একদিন।

আমারও তোমার ওখানে বেড়াতে যেতে ইচ্ছা হয়। তুমি নিয়ে গেলে আমিও যাবো।

: ঠিক আছে যেদিন যেতে চাও, সেদিনই তোমাকে ওখানে নিয়ে যাবো।

: কিন্তু ওরা তো তোমার নিজের কেউ নয়। ওরা যদি রাগ করে?

আরে না-না, রাগ করবে না। ওরা খুব ভালো মানুষ।

: তাই নাকি? তাহলে যাবো একদিন।

একদিন কেন? আজই চলো।

; ওরে বাপরে! তাই কি আমি পারি? আমার নানীর হুকুম না নিয়ে গেলে নানী খুব গোস্বা হবেন। আমাকে খুবই বকাবকি করবেন।

: ঠিক আছে। তোমার নানীর হুকুমটা তাহলে নিয়ে নাও। হুকুম পেলে সেদিন তোমাকে নিয়ে যাবো।

: আচ্ছা।

এবার দুইজনই একটু নীরব হলো। এরপর হঠাৎই মমতা ব্যস্তকণ্ঠে বললো– ওহো, একটা কথা তোমাকে বলাই হয়নি? তোমাকে নাকি ক্লাশ 'টু'-এ তুলে দেবে। এ ক্লাসে রাখবে না।

আমিন প্রশ্ন করলো– কার কাছে শুনলে?

মমতা বললো– স্যারের কাছে শুনলাম। স্যার সেদিন কে একজনকে বললেন, আমিন খুবই মেধাবী আর অনেকখানি লেখাপড়া জানা ছেলে। এ ক্লাসে রাখলে ওর আর কোন উন্নতি হবে না। আবার ওর মতো করে পড়াতে গেলে ওয়ানের অন্যান্য ছেলেমেয়েরা কিছুই বুঝতে পারবে না।

বইঘর.কম ◊ রেকিন

স্যার এই কথা বলেছিলেন?

: হ্যাঁ, এই কথা। তোমাকে কি ঠিক ক্লাস 'টু'-এ তুলে দেবে?

: স্যার একদিন আমাকে এ কথা বলেছিলেন ঠিকই। তবে–

মমতা করুণকণ্ঠে বললো– তুমি ক্লাস 'টু'-এ উঠো না আমিন। তুমি না থাকলে আমি খুবই কষ্ট পাবো। আমার কিছুই ভাল লাগবে না। স্যার যেতে বললেও, তুমি ঐ ক্লাসে যেও না। দোহাই তোমার!

সে কি! স্যার বললে আমি তাহলে কি বলবো?

বলবে, তুমি ওয়ানেই ভাল আছো। ক্লাস 'টু'-এর পড়া তুমি পারবে না।

মমতা!

এই কথাই তুমি বলবে। বলবে বলো?

তা মানে–

মমতা হাত-পা ছুড়ে বললো– না-না, তুমি আজকেই স্যারকে এ কথা বলো। আজকেই আজকেই–

মমতার ব্যস্ততা দেখে আমিন হেসে বললো– আরে পাগলি! আজকে বলতে যাবো কেন? আজকে কি আমাকে ক্লাস 'টু'-এ তুলে দিচ্ছেন? ষান্মাসিক পরীক্ষার ফল দেখে তুলে দেয়া না দেয়া ঠিক করবেন।

: ষান্মাসিক পরীার ফল দেখে?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই ফল দেখে। সেই কথাই স্যার বলেছেন। সে পরীক্ষার তো অনেক দেরি আছে। কমছে কম পাঁচ পাঁচটা মাস। সে পরীক্ষায় আমার ফল খারাপ হলে আমাকে ক্লাস 'টু'-এ তুলে দেবেন না।

আবার মমতা ব্যস্তকণ্ঠে বললো– তাহলে তুমি কিন্তু খারাপ করে পরীক্ষা দেবে আমিন। ভাল করে দেবে না। সব উত্তর ভুল করে দেবে। ভুল করে দেবে, বলো?

www.boighar.com

আচ্ছা ঠিক আছে। সে সময় আসুক। এখনই ব্যস্ত হচ্ছো কেন?

না- না, ওসব কথা শোনবো না। হয় সব ভুল উত্তর দেবে, নয় এখন থেকেই আমাকে ক্লাসের মধ্যে ভাল করে পড়াও, আমিও যেন তোমার সাথে কাস 'টু'-এ উঠার যোগ্য হই।

আমিন এবার উৎসাহভরে বললো– ঠিক ঠিক। এইটেই ঠিক বুদ্ধি। আমিও

তোমাকে পড়াবো, তুমিও বাড়িতে দিন রাত পড়বে। তুমি যদি মনপ্রাণ দিয়ে পড়ো আর আমি তোমাকে সব সময় সবকিছু শিখিয়ে বুঝিয়ে দেই, তাহলে স্যার তোমাকেও ক্লাস 'টু'-এ তুলে নেবেন। তুমিও তো কম মেধাবী নও। ফার্স্ট হয়ে এই ক্লাসে উঠা মেয়ে।

: বলছো?

হ্যাঁ বলছি। এইটেই ঠিক বুদ্ধি আর এইটেই করতে হবে। তা করলে আমাদের আর পৃথক করে কে?

কয়েকদিন পরের কথা। স্কুলে আসতে মমতার সেদিন একটু দেরি হলো। স্কুলে এসে দেখে, সবাই এসে গেছে কিন্তু আমিন এখনো আসেনি। মমতার একটু হাসি পেলো। মনে মনে বললো, কোনদিনই লেট হয় না তোমার। সেই তোমারও আজ লেট হলো। ভেঙ্গে গেল তোমার ধরা বাধা নিয়মটা।

নিজের জায়গায় বসে সে বার বার বাইরের দিকে তাকাতে লাগলো। ভাবতে লাগলো, এখনই এসে যাবে আমিন। কিন্তু আমিন এলো না। যে দুইচার জন ছেলেমেয়ে আসতে বাকি ছিল, তারাও এসে গেল। মাস্টার সাহেবও চলে এলেন। এসেই তিনি ক্লাস ওয়ানের ছেলেমেয়েদের অংক কষতে লাগিয়ে দিয়ে ক্লাস 'টু'-এ চলে গেলেন। তবু আমিন এলো না।

সকলেই মনোযোগ দিয়ে অংক কষতে লাগলো। কিন্তু মমতা স্লেট পেন্সিল হাতে নিয়ে কেবলই নাড়াচাড়া করতে লাগলো আর বাইরের দিকে তাকাতে লাগলো। তা দেখে অদূরে বসা শমসের আলী বললো– বার বার বাইরের দিকে তাকাচ্ছো কেন? আমিনকে খুঁজছো বুঝি?

মমতা উদগ্রীবকণ্ঠে বললো– হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমিন এখনো আসছে না কেন?

আলী বললো– ও আর আসবে না।

মমতা শংকিতকণ্ঠে বললো– আসবে না মানে?

আলী বললো– আমিনের ভীষণ জ্বর। গতকাল ইস্কুল থেকে যাওয়ার পরই তার গায়ে জ্বর উঠেছে। সে জ্বর আজও ছাড়েনি।

মমতা হতাশকণ্ঠে বললো– গায়ে জ্বর উঠেছে? সে জ্বর এখনো ছাড়েনি?

আলী বললো– না, ছাড়েনি বলেই তো আজ ইস্কুলে আসতে পারলো না।

এ কথায় মমতা মনমরা হয়ে গেল। পাশে বসা মাজেদা খাতুন মমতাকে বললো– তা এ নিয়ে এত মন খারাপ করার কি আছে? আজ জ্বর ছাড়েনি,

কাল ছেড়ে যাবে। কাল আসবে।

মমতা বললো– মাজেদা!

মাজেদা বললো– আজ কিছু বুঝিয়ে নিতে না পারিস, কাল নিস্। শুনলাম বৃত্তি পরীক্ষা দিবি। তো তাতে কি হয়েছে? একদিন কিছু বুঝিয়ে নিতে না পারলে কি বৃত্তি পরীক্ষা ফসকে যাবে? তাছাড়া, সে বৃত্তি পরীক্ষা তো আজ নয়, ক্লাস টুয়ে উঠার পর। অনেক অনেক দেরি আছে এখনো।

: নারে মাজেদা, সে কথা নয়। পরের বাড়িতে থাকে। জ্বরে পড়ে ওর কি হাল হোচ্ছে সেই কথা ভাবছি।

হবে আবার কি? দুই একদিন অসুখ বিসুখ কার না হয়? তাই বলে কি অসুখটা জীবন ভর থাকবে? দেখিস, ও জ্বরটা কালই ছেড়ে যাবে। আর কালই ও ইস্কুলে চলে আসবে।

কিন্তু আমিনের জ্বর ছাড়লো না। আমিন স্কুলে এলো না। তা দেখে মমতা খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো। ছটফট করে সারা বেলা স্কুলে কাটানোর পর, ছুটির সময় সে মাজেদাকে বললো– আমাকে একটু নিয়ে যাবি মাজেদা? আমি আমিনকে দেখতে যাবো।

মাজেদা বললো– দেখতে যাবি, যা। তোকে নিয়ে যেতে হবে কেন? তুই কি হাঁটতে পারিসনে?

আরে হাঁটতে তো পারি। কিন্তু পথঘাট কিছুই চিনিনে। তার উপর ও বাড়িটাও চিনিনে।

: তাই নাকি? তা হলে যাবি কি করে?

: তুই নিয়ে চল মাজেদা। তোর সব চেনাজানা। তুই চল্ না ভাই?

মমতার অনুনয়ে মাজেদার মন নরম হলো। বললো– যাবি? তো চল্ এখনই যাই।

মমতা বললো– না না, এখনই যেতে পারবো না। নানীর অনুমতিটা নিতে হবে। অনুমতি না নিলে মুসিবত হবে। আগামী কাল নিয়ে চল্ আমাকে।

: আরে আগামীকাল তো ছুটি। আগামীকাল আমাকে পাবি কোথায়?

এখানেই তো তোর বাড়ি। তুই এই স্কুলের দিকে একটু বেরিয়ে এলেই আমি তোর কাছে চলে আসবো। তোর বাড়িতে ডাকতে গেলে তোকে যেতে না দেয় যদি?

বইঘর.কম ও রোকন

তা তো দেবেই না। তাছাড়া আগামীকাল আমার খালারা আসছে। আমার আব্বার বদলি হওয়ার কথা হোচ্ছে তো। আব্বা সেনিটারি অফিসে চাকরি করেন। সরকারি দাতব্য চিকিৎসালয়। খালারা এলে আর আমি বেরোতেই পারবো না।

তারা আসার আগেই একটু চল্ ভাই। আমিন যে বাড়িতে থাকে, আমাকে সেটা একটু চিনিয়ে দিয়ে আয়।

অনেক পীড়াপীড়ির ফলে মাজেদা খাতুন রাজি হলো শেষ পর্যন্ত।

স্কুল থেকে বাড়িতে এসেই মমতা এবার তার নানীকে নিয়ে বসলো। নানীর কাছে বসে সে বিনয়ের সুরে বললো– নানীজান, আমি একটা কথা বলবো, তুমি রাগ করবে না তো?

নানীজান বললেন– কথা! কি কথা?

মমতা বললো– তুমি যদি রাগ না করো, তাহলে বলি।

: আহা বল না! এত ভণিতা করছিস কেন?

আমি এক জায়গায় যাবো নানীজান।

এক জায়গায়! কোথায়?

এই নিকটেই এক বাড়িতে। আমার সাথে এক ছেলে পড়ে আর সেই ছেলে সে বাড়িতে থাকে।

: বটে। তা সাথে পড়লেই তার বাড়িতে যেতে হবে?

ছেলেটাকে দেখতে যাবো নানী। তার ভীষণ জ্বর।

: জ্বর! কতদিন হলো জ্বর হয়েছে?

এই দুই তিন দিন হলো জ্বর হয়েছে।

বালাই। দুই তিন দিন হলো জ্বর হয়েছে বলেই তাকে দেখতে যেতে হবে? সে কি মারা যাচ্ছে?

: নানী!

www.boighar.com

এমন জ্বর সবারই হয়। তার মা-বাপ নেই? তারা দেখলেই তো যথেষ্ট। তুই আবার ঢং করে কি দেখতে যাবি?

না নানী, ওর মা-বাপ এখানে নেই। ও, পরের বাড়িতে থাকে।

পরের বাড়িতে? মানে জায়গির থাকে?

বইঘর.কম ও রৌকন

: জি জি।

সেই পরের বাড়িতে তোর যেতে হবে? ওঁরা বিরক্ত হবেন না?

না নানী, ওরা খুব ভাল মানুষ। ওরা আমিনের বাপের খুব খাতিরের মানুষ। জ্বরের সময় দেখতে গেলে ওরাও খুব খুশি হবেন, আমিনের বাপও খুব খুশি হবেন।

: আমিন! আমিন কে?

ঐ যে ছেলের জ্বর হয়েছে, তার নাম আমিন। আমার সাথে পড়ে। খুবই মেধাবী। ফার্স্ট হওয়া ছেলে। আমার চেয়েও অনেক বেশি মেধাবী আর অনেক বেশি লেখাপড়া জানা ছাত্র। স্যার বলেছেন, আমাকে আর ঐ আমিনকে বৃত্তি পরীক্ষা দেওয়াবেন। ক্লাস টু-এর পরীক্ষার সময় ঐ পরীক্ষা হবে।

আচ্ছা।

স্যার বলেছেন, বাংলায় অংকে যেখানে যা ঘাটতি আছে, আমিনকে দিয়ে সব সময় সেসব দেখিয়ে নিতে।

তাই?

আমিন তাই দেখিয়ে দেয় নানী। স্যারের মতোই সব কিছু বুঝিয়ে দিতে পারে।

ও, তাই এত গরজ?

জি নানী, জি।

: তা যাবি কি করে? ও বাড়ি তুই চিনিস্?

না, আমি চিনিনে। চেনে মাজেদা খাতুন। সেই আমাকে পথঘাট দেখিয়ে ওবাড়িতে নিয়ে যাবে।

: মাজেদা! সে আবার কে?

মাজেদাও আমার সাথে পড়ে। এখানকার সেনেটারি অফিসে চাকরি করে ওর বাপ। আমাদের স্কুলের কাছেই থাকে।

ও, আচ্ছা।

যাবো নানী?

: যাবি যা। কিন্তু বেশিক্ষণ যেন থাকিসনে।

: না-না, বেশিক্ষণ থাকবো না। একটু দেখেই চলে আসবো।

পরদিন সকাল সকাল মমতা ও মাজেদা নির্দিষ্ট জায়গায় এসে হাজির হলো এবং মাজেদা মমতাকে পথ চিনিয়ে নিয়ে আমিন যে বাড়িতে থাকে সেই বাড়ির দিকে রওনা হলো। সেই বাড়ির নীচে রাস্তায় এসে থেমে গেল মাজেদা। মমতাকে বাড়িটা দেখিয়ে দিয়ে বললো– তুই এখন যা। আমি ফিরে যাই।

মমতা সবিস্ময়ে বললো– সে কি! ফিরে যাই মানে? আমিনকে দেখতে যাবিনে?

: না। তাতে আমার দেরি হয়ে যাবে।

দেরি হবে কেন? একটু দেখেই ফিরে আসবো আমরা।

না। ওখানে গেলে পাশের বাড়িতেই আলী থাকে। আলীর সাথে দেখা না করে এলে আলী বেজায় রাগ করবে। তাতে অনেক সময় যাবে। ইতোমধ্যেই আমার খালারা এসে আমাকে না দেখলে খুবই নাখোশ হবে। খালারাও যে সকাল সকাল আসবে।

কি মুস্কিল! আলীর ওখানে কি না গেলেই নয়?

আমিনের ওখানে গেলে, আলীর ওখানে না গিয়ে কি উপায় আছে? না গেলে আগামীকাল ক্লাসে আলী আমাকে তুলোধুনা ধুনবে।

বলিস কি! তোর উপর আলীর এতটাই দাবী?

মাজেদা ঈষৎ হেসে বললো– তা একটু আছেই তো। আমারও তো কারো সাথে কিছুটা খাতির থাকতে পারে।

তার মানে? ইতোমধ্যেই তোর তাহলে খাতির হয়েছে আলীর সাথে?

মুখ টিপে হেসে মাজেদা বললো– তোরই কেবল আমিনের সাথে খাতির থাকতে পারে আর আমার কারো সাথে খাতির থাকতে পারে না?

মাজেদা! তোরও তাহলে আলীর সাথে খাতির হয়েছে, বল?

: হয়েছেই তো। অমনি কি তার কথা বলছি?

: অর্থাৎ?

আলী আমাকে কত খাতির করে! পেয়ারা, বরই, জলপাই প্রায়ই এসব এনে দেয়।

আচ্ছা!

তুই যেমন আমিনের সাথে সব সময় গল্প-আলাপ করিস্, ঐ রকম আলীর সাথেও আমি এখন মাঝে মাঝে গল্প-আলাপ করি ।

ও-ম্মা!

তোর বন্ধু আমিন, আমার বন্ধু আলী ।

: সাব্বাশ!

আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে । আমি চললাম...

: মাজেদা!

তোর কাজ তো করেই দিলাম । আর আমাকে ডাকিস্ কেন? –বলেই হন হন করে মাজেদা খাতুন পেছনের দিকে হাঁটতে লাগলো ।

মমতাকে বাড়ির নিচে রাস্তায় রেখে চলে গেল মাজেদা । মমতা মুসিবতে পড়লো । রাস্তায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর সে অগত্যা এক পা দুই পা করে উঠে এলো আবদুল মজিদ সাহেবের বাড়ির উপর । আবদুল মজিদ সাহেবের স্ত্রী আম্বিয়া বেগম কি এক কাজে এই সময় বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এসেছিলেন । একটা সুন্দর ফুটফুটে মেয়েকে বাড়ির উপর উঠে আসতে দেখে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন । মেয়েটি আরো কাছে এগিয়ে এলে তার চেহারা দেখে আম্বিয়া বেগম অভিভূত হয়ে গেলেন । ভাবতে লাগলেন, এমন অসাধারণ সুন্দর চেহারার মেয়ে তো তিনি এ গাঁয়ে এসে অবধি আর কাউকে দেখেননি । একটু ভেবেই তিনি মেয়েটিকে প্রশ্ন করলেন– কাকে চাই?

মমতা ইতস্তত করে বললো– এখানে কি আমিন থাকে?

আম্বিয়া বেগম ফের প্রশ্ন করলেন– আমিন! কোন আমিন? তুমি কোন্ আমিনের কথা বলছো?

এই পাঠশালায় পড়ে । খুবই মেধাবী ।

: তুমি কে?

আমিও আমিনের সাথে এই পাঠশালায় পড়ি ।

তাই নাকি? তা আমিনের কাছে কি জন্যে এসেছো?

আমিনের নাকি জ্বর হয়েছে, তাই তাকে দেখতে এসেছি । সে কি এই বাড়িতেই থাকে?

বইঘর.কম

আম্বিয়া বেগম বিপুল আগ্রহে বললেন– হ্যাঁ হ্যাঁ, এই বাড়িতেই থাকে। এসো এসো, ভেতরে এসো।

মমতাকে নিয়ে ভেতরে যেতে যেতে আম্বিয়া বেগম ফের ভাবতে লাগলেন, কি আশ্চর্য! আমিনের সাথে পড়ে। এ চেহারার তুলনা চলে একমাত্র আমিনের সাথেই। কি অপূর্ব জুটি। একে জিনে ও, ওকে জিনে এ।

ভেতরে এসে মমতা বললো– আমিন আপনাদের কে হয়?

আম্বিয়া বেগম বললেন– কেউ হয় না। ও আমাদের বাড়িতে থাকে।

: আপনাদের বাড়ি এখানে? মানে এই গাঁয়ে?

না। আমাদের বাড়ি অন্যখানে। আমার স্বামী, মানে আমিনের জায়গিরদার এখানে ব্যবসা করেন। তাই আমরা আপাতত এখানে আছি।

কেউ হয় না তো আমিন কি করে আপনাদের বাড়িতে এলো? মানে, পরিচয় হলো কি করে?

আমার স্বামীর বড়ভাই আমিনের আব্বার ওখানে চাকরি করেন। মানে, ওদের জোতদারী দেখাশোনা করেন। এতে করেই পরিচয়। তা তুমি কি এই গাঁয়ের মেয়ে?

মমতা উৎসাহের সাথে বললো– জি না। আমার বাড়িও অন্যখানে। অনেক দূরে। এখানে আমি আমার নানীজানের বাড়িতে থাকি।

: আচ্ছা! তুমিও বাইরের মেয়ে!

: জি জি।

আম্বিয়া বেগম চকিতে আবার ভাবলেন– আহা! এদের দুইজনের শাদি হলে কি যে মানাতো!

আমিন যে ঘরে থাকে তারা সেই ঘরের দরজায় এসে পৌঁছেছিল। দরজা ভেজানো ছিলো। আমিনের ঘুম ভেঙ্গেছে কিনা ভাবতেই বাইরের কথা শুনে আমিন ডেকে বললো– কে চাচী? কার সাথে কথা বলছেন?

আম্বিয়া বেগম বললেন– ওমা, তোমার ঘুম ভেঙ্গেছে! www.boighar.com

আমিন বললো– অনেকক্ষণ চাচী। ঘুমও ভেঙ্গেছে, জ্বরও একদম সেরে গেছে। আর একটুও জ্বর নেই।

: আলহামদুলিল্লাহ!

বইঘর.কম

: বাইরে আসবো চাচী? সাথে আপনার কে?

না না, তুমি বিছানাতেই থাকো। আমরাই ভেতরে আসছি।

ভেতরে এসে মমতাকে সামনে এগিয়ে দিয়ে আম্বিয়া বেগম বললেন– দেখো, কাকে এনেছি।

চোখ তুলে চেয়েই আমিন খুশিতে উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। বললো– এ কি! মমতা তুমি!

মমতা বললো– তোমার জ্বর হয়েছে শুনে তোমাকে দেখতে এসেছি।

কি আনন্দ– কি আনন্দ! এসো, বসো এই বিছানায়।

: বসবো?

: বসো– বসো। এটা রোগীর বিছানা নয়। আমি ভাল বিছানায় শুয়েছিলাম।

না না, আমি সে কথা বলছিনে। রোগীর বিছানা হলেও আমার কোন আপত্তি নেই। রোগীর বিছানায় বসে রোগীকে দেখবো বলেই তো এসেছি।

: সাব্বাশ!

এবার আম্বিয়া বেগম বললেন– বসো। বসে তোমরা কথা বলো, আমি আসছি।

আম্বিয়া বেগম ঘুরে দাঁড়াতেই আমিন বললো– চাচী! এর নাম মমতা। আমাকে দেখতে এসেছে। এ এখন আমাদের মেহমান। তাই এর মুখে দেয়ার কিছু ব্যবস্থা...

মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে আম্বিয়া বেগম বললেন– পাগল ছেলে! সে কথা তোমাকে বলে দিতে হবে? আমাদের বাপজানকে দেখতে এসেছে যে, সে কিছু মুখে না দিয়েই এখান থেকে যাবে– সেটা কি কখনো হতে পারে? আমি সেই জন্যেই বেরিয়ে যাচ্ছি!

হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেলেন আম্বিয়া বেগম। আমিনের বিছানার এক পাশে বসতে বসতে মমতা বললো– তোমার এই চাচী তো তোমাকে খুবই ভালোবাসেন দেখছি!

আমিন বললো– খুব খুব। তোমাকে বলেছিলাম না, এঁরা আমাকে আর আমার বাড়ির সবাইকে খুব ভালোবাসেন?

: হ্যাঁ, তাই তো দেখছি।

: তা এবার বলো, তুমি একা একা এলে কি করে? আমাদের বাড়ি তোমাকে চিনিয়ে দিলো কে?

: মাজেদা।

: মাজেদা!

: আমাদের ক্লাসের মাজেদা খাতুন।

: সে কি! কোথায় সে?

: চলে গেছে। বাড়িতে ফিরে গেছে।

: তার মানে? সে এলো না এখানে?

: না। তার দেরি হয়ে যাবে, তাই। তার বাড়িতে নাকি মেহমান আসবে।

তাতে কি? এসে নিমেষ কয়েক থেকেই চলে যেতে পারতো। তাতে কি এমন দেরি হতো?

অনেক দেরি হতো। এখানে এলে নিমেষ কয়েক থেকেই তার চলে যাওয়া হতো না। হয়তো বেলাটা অর্ধেকটাই চলে যেতো।

: তার মানে?

মানে, এখানে এলেই তার নাকি আলীর ওখানে যেতে হতো। এখানে এসে আলীর ওখানে যায়নি– এটা শুনলে আলী রাগে মাজেদার সাথে কোন দিন আর কথাই বলতো না।

: তাতে কি হতো?

: মাজেদার বুক ফেটে যেতো।

: কেন, কেন?

আলীর সাথে মাজেদার এখন যে জব্বোর মিল। জব্বোর খাতির। দুইজন দুইজনকে না দেখলে আর কথা না বললে, এখন ওরা কেউ বাঁচে না।

সে কি! এই ব্যাপার?

একদম এই ব্যাপার। ক্লাসে গিয়ে এখন একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবে।

: ভেরি গুড। একদম তাহলে আমাদের মতো, তাই না?

আমিন হাসতে লাগলো। মমতা মুখটিপে হেসে বললো– আমি জান্‌নে।

এই সময় নাশতার প্লেট হাতে ফিরে এলেন আম্বিয়া বেগম। সাথে এলেন

তার স্বামী আবদুল মজিদ সাহেব। তিনি একটু বাইরে গিয়েছিলেন। এইমাত্র ফিরে এসেছেন। ঘরে ঢুকেই আম্বিয়া বেগম তার স্বামীকে বললেন– বললাম না দেখতে খুবই সুন্দর! এখন নিজের চোখেই দেখুন আমিনের এই মেহমানকে।

জবাবে আবদুল মজিদ সাহেব বললেন– তাজ্জব! একেবারেই আমাদের আমিনের মতো চেহারা। একই রকম সুন্দর দেখতে!

আম্বিয়া বেগম বললেন– পড়েও এরা দুইজন এক সাথে।

: বড়ই সুন্দর জুটি তো!

ভবিষ্যতে এদের দুই হাত যদি আল্লাহ তায়ালা এক করে দেন, তাহলে আল্লাহর এ মহিমার সীমা মাত্রা থাকবে না।

: আমিন! আল্লাহ যেন তাই করেন।

মমতা কিছু বুঝতে না পারলেও আমিন বুঝতে পারলো অনেকটাই। সে সলজ্জকণ্ঠে বললো– এসব কি বলছেন চাচা?

আবদুল মজিদ সাহেব বললেন– তোমরা দুইজন একসাথে পড়ো?

: জি জি।

: শুনলাম, এ মেয়েটাও নাকি খুব মেধাবী?

: খুবই চাচা, খুবই।

মারহাবা- মারহাবা! দুইজনই খুব মন দিয়ে লেখাপড়া করো, ভবিষ্যৎ তোমাদের খুবই উজ্জ্বল হবে।

আম্বিয়া বেগম বললেন– এসব কথা পরে বলবেন। এখন একটু আসুন তো। এরা কিছু মুখে দিক।

আমিনের অসুখ পুরোপুরি সেরে যাওয়ার পর আমিন আবার স্কুলে যেতে লাগলো। স্কুলে যেতে লাগলো মমতাও। কিছুদিন পরে মমতার অনুরোধে আমিনও একদিন মমতার নানীর বাড়িতে গেল। আমিনের চেহারা দেখে একই রকম মোহিত হলেন মমতার নানীজানও। আমিনের কথাবার্তায় আর বিনম্র আচরণে আরো প্রীত হলেন ভদ্রমহিলা। তিনি আমিনকে মাঝে মাঝেই

তার বাড়িতে আসার আমন্ত্রণ জানালেন। বলা বাহুল্য, এর ফলে আমিন ও মমতার দুই বাড়িতেই আসা-যাওয়া চলতে লাগলো।

যেতে লাগলো সময়। চলতে লাগলো দৌড়ঝাঁপ। এরপর একদিন আলী, মাজেদা ও মমতা সহকারে ক্লাস ওয়ানের মোটামুটি সকল ছেলেমেয়েই হুজুগ তুললো, তারা খড়ের ক্ষেতের বরই (কুল) গাছের বরই খেতে যাবে। খড়ের ক্ষেতের সাথেই বিশাল জঙ্গল। ঐ জঙ্গল থেকে মাঝে মাঝেই শেয়াল-শূকরসহ আরো কি কি যেন হিংস্র জন্তু বেরিয়ে খড়ের ক্ষেতে ঢুকে। সে কারণে ছেলেমেয়েরা এমনকি বড় মানুষও কেউ একা একা বা দুই একজন ঐ বরই গাছের বরই কুড়াতে বা বরই নামাতে যায় না। এতে করে প্রচুর বরই পেকে থাকে গাছে। বরইগুলো খুবই মিষ্টি আর সুস্বাদু।

ছেলেমেয়েরা যুক্তি খাড়া করলো, সংখ্যায় তারা অনেক। সবাই এক সাথে হইচই করে আওয়াজ দিয়ে বরই তলায় গেলে, জঙ্গলে শেয়াল-শূকর, বাঘ-ভাল্লুক– যাই থাকুক না কেন, সবই ভয়ে পালাবে। এত লোকের আওয়াজ কি কম আওয়াজ হবে! জঙ্গলের জীবজন্তু আরো জঙ্গলের ভেতরে যাবে, বরই গাছতলায় আসবে না। এই মর্মে সবাই কোমর বেঁধে ফেললো। সেদিন ছিল হাফ-ইস্কুল। ছুটির পরে সবাই বই-পুস্তক পাশের এক বাড়িতে রেখে দল বেঁধে রওনা হলো বরই গাছের উদ্দেশ্যে।

আমিন কোন কথা না বলে ছুটির পর বসে থেকে বস্তা সেলাই করা মোটা সূঁচ দিয়ে তার ছিঁড়ে যাওয়া বই-পুস্তক আনার ছালার থলেটা সেলাই করতে লাগলো। তাড়াহুড়ো করে আসার জন্যে বাড়িতে সেলাই করার সময় পায়নি সে। তা দেখে সবাই তাকে তাদের সাথে যাওয়ার জন্যে ডাকাডাকি করতে লাগলো। বললো– আরে পিঁপড়ের বলও বল। মানুষের দল যত বড় হবে, জন্তু জানোয়ারও তত বেশি ভয় পেয়ে পালাবে। সবাই যাচ্ছে, তুমিও এসো। নইলে তোমার উপর রাগ করবে সবাই।

মমতার বরই খেতে যাওয়ার আগ্রহ দুর্বার। সবার সাথে সেও রওনা হলো আর আমিনকে সাথে যাওয়ার জন্যে সাধাসাধি করতে লাগলো। মমতার অনুরোধ ফেলতে পারলো না আমিন। মমতা সেখানে কোন বিপদে পড়তে পারে বিবেচনায় বই-পুস্তকের থলেটা সকলের বই-পুস্তকের মধ্যে রেখে বস্তা সেলাই করা সেই বিশাল আকার সূঁচটা হাতে নিয়ে আমিনও সবার সাথে রওনা হলো। উদ্দেশ্য, কোন জন্তু-জানোয়ার হামলা করলে ঐ সূঁচই হবে তার আত্মরক্ষার অস্ত্র।

যাঁহা চিন্তা তাঁহা কর্ম। বিকট আওয়াজ তুলে হইচই করে সবাই বরই তলায় যাওয়া মাত্র শেয়াল, বেজি, বনবিড়াল– যা কিছু আশপাশে ছিল, ছুটে পালালো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলো এক মেছোবাঘ। বাঘটা ঐ গাছের কাছেই ছিল। ছুটে পালানোর পরিবর্তে বাঘটা এসে হাম করে ঝাঁপিয়ে পড়লো ছেলেমেয়েদের উপর। সামনেই ছিল মমতা। বাঘটা সঙ্গে সঙ্গে মমতার এক বাহু কামড়ে ধরে মমতাকে জঙ্গলের দিকে টেনে নিয়ে যেতে লাগলো।

তা দেখে সকল ছেলেমেয়ে ভয়ে 'বাঘ-বাঘ' বলে চিৎকার দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালালো। মমতাকে উদ্ধার করতে কেউ এগিয়ে এলো না। বস্তুত সে সাহস ও সামর্থ কারো ছিল না। আমিন পালালো না। সূঁচ হাতে তৎক্ষণাৎ সে লাফ দিয়ে উঠে বসলো বাঘের পিঠে। বাঘটা ক্ষিপ্ত হয়ে আমিনের দিকে ঘুরে তাকাতেই আমিন তার ঐ বিশাল সূঁচটা সবলে ঢুকিয়ে দিলো বাঘটার চোখের মধ্যে। আমূল ঢুকে গেল সূঁচ। আর্তনাদ করে লাফিয়ে উঠলো বাঘটা। মুখ থেকে খুলে গেল মমতা। পিঠ থেকে ছিটকে পড়লো আমিন। গঁ-গঁ করতে করতে বাঘটা দৌড় দিলো জঙ্গলের দিকে। তার চোখ থেকে দর দর বেগে রক্ত ঝরে পড়ে রঙিন হয়ে গেল বাঘের সমস্ত পথ। এঁকে গেল রক্তের আলপনা।

মমতাকে কামড়ে ধরলেও বাঘের দাঁত তেমন একটা বসেনি মমতার বাহুর মধ্যে। দুই একটা দাঁত অল্প একটু বসায় মমতার বাহু দিয়ে রক্ত পড়তে লাগলেও, তা মারাত্মক কিছু ছিল না। তবে ভয়ে মমতা কেবলই টলছিল। আমিন দৌড়ে এসে মমতাকে ধরলো এবং মমতাকে সবলে টেনে নিয়ে জঙ্গল থেকে ফাঁকে বেরিয়ে এলো। অতি দ্রুত আরো অধিক নিরাপদ স্থানে এসে জামার এক অংশ ছিঁড়ে সে বেঁধে দিলো মমতার বাহু। এরপর মমতাকে ধরে নিয়ে তার বাড়ির দিকে রওনা হলো।

উল্লেখ্য যে, মমতাকে বাঘে টেনে নিয়ে যাওয়ার সময় অনেকে দেখলেও তার উদ্ধারে কেউ এগিয়ে এলো না এবং এক্ষণে মমতাদের গমন পথের ত্রিসীমানার মধ্যে ঐ একপাল ছেলেমেয়ের কাউকে দেখা গেল না।

মমতাকে ধরে নিয়ে আমিন মমতার নানীজানের বাড়িতে ঢুকলে তা দেখামাত্র আর্তনাদ করে উঠলেন মমতার নানীজান। বললেন– হায় আল্লাহ! কি হয়েছে? আমার মমতার কী হয়েছে?

আমিন বললো– মমতাকে বাঘে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল নানীজান। আমি তাকে

কোনমতে উদ্ধার করে এনেছি।

ভদ্র মহিলা ফের ভীতকণ্ঠে আওয়াজ দিয়ে উঠলেন। বললেন– কি গজব! কি গজব! তুমি তাকে উদ্ধার করে এনেছো?

এবার মমতা ক্লান্তকণ্ঠে বললো– সেরেফ উদ্ধার করাই নয় নানীজান। আমিন আমাকে বাঘের মুখ থেকে কেড়ে এনেছে। আমিন না থাকলে বাঘ আমাকে খেয়েই ফেলতো।

নানীজান অত্যন্ত আগ্রহভরে প্রশ্ন করলেন– কিভাবে? কিভাবে আমিন কেড়ে আনলো তোকে?

আমিন ব্যস্তকণ্ঠে বললো– বলবো নানীজান, সব বলবো। এখন জলদি জলদি মমতার বাঘে কামড়ানো জায়গাটা ধুয়ে দিয়ে তুলা বা পরিষ্কার ন্যাকরা দিয়ে বেঁধে দিন আর ওকে শুইয়ে দিন। দেখছেন না, মমতা কেমন কাঁপছে, ও দাঁড়াতে পারছে না!

নানীজান বললেন– হ্যাঁ হ্যাঁ, ওসব করে শুইয়ে দিতে তো হবেই। শুধু শুইয়ে দেয়া? শুইয়ে দিয়ে আচ্ছামতো শেক্ দিতে হবে ওর ডানায়। গায়ে জ্বর উঠে কি না, কে জানে?

আমিন বললো– উঠতে পারেই নানীজান। রক্তপাত হয়েছে আর ও অনেক আছাড় খেয়েছে। ব্যথায় জ্বর আসতে পারেই।

মমতার নানীজান ক্ষিপ্রহস্তে ধোয়া বাঁধা সেরে মমতাকে শুইয়ে দিলেন বিছানায় আর মমতার বাহুতে শেক্ দিতে লাগলেন। এই শেক্ দেয়ার ফাঁকে তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমিনের মুখে সব ঘটনা শুনতে লাগলেন। বরই খেতে যাওয়া থেকে শুরু করে মমতাকে বাঘে ধরে নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত সব ঘটনা আমিন বিস্তারিত বর্ণনা করে গেল। সব শেষে বললো– সূঁচটা বাঘের চোখের মধ্যে সবখানি ঢুকে যাওয়ামাত্র বাঘটার সেকি চিৎকার আর বাঘের চোখ দিয়ে দর দর করে সেকি রক্তপাত। দেখলাম, বাঘটা দৌড়ে পালাচ্ছে আর বাঘের সারা রাস্তা রক্তে ভিজে যাচ্ছে।

মমতার নানীজান আমিনের তারিফে সোচ্চারকণ্ঠে বললেন– সাব্বাশ ভাই সাব্বাশ! সত্যিই তুমি একটা মস্তবড় বাহাদুর বটে। যদিও আল্লাহ তায়ালার দয়াতেই সব হয়েছে, তবু তিনি তোমার হাত দিয়েই মমতাকে নতুন জীবন দান করলেন।

আমিন মমতার বিছানার উপরই বসেছিল। কিছুক্ষণ তারিফ-স্তুতি আর

খোশ আলাপের পর আমিন উঠি উঠি করতেই মমতা খপ্ করে চেপে ধরলো আমিনের এক হাত এবং আকুলকণ্ঠে বলতে লাগল– না না, তুমি যাবে না। আমাকে ছেড়ে তুমি যাবে না। তুমি সব সময় আমার কাছে থাকো আমিন। আমার বড়ই ভয় করছে। তুমি কাছে না থাকলে, আমি ভয়েই মরে যাবো।

আমিন বললো– আরে ভয় কি? বাঘ তো এখানে নেই, তবু ভয় কিসের? তুমি তো তোমার ঘরে।

আমিনের কথায় কান না দিয়ে মমতা বার বার বলতে লাগলো– না না। আমাকে ফেলে তুমি যাবে না। কিছুতেই যাবে না।

নানীজানের ইশারায় আমিন বললো– না না, আমি যাচ্ছিনে। আমি তোমার পাশেই আছি। তুমি ঘুমাও।

: ঘুমাবো?

: হ্যাঁ, ঘুমাও। আমি এখানেই আছি।

আশ্বস্ত হয়ে ঘুমিয়ে গেল মমতা। এরপরে আস্তে আস্তে উঠে আমিন তার বাসস্থানে চলে গেল।

চারদিকে ধন্য ধন্য রব পড়ে গেল আমিনের। আমিন একজন দুরন্ত সাহসী আর দুর্ধর্ষ বাহাদুর ছেলে, বাঘের সাথে পাল্লা দিয়ে সে বাঘের মুখ থেকে কেড়ে এনেছে মমতাকে– এ কথা সর্বত্র সকলের মুখে মুখে ফিরতে লাগলো। ছোটরা আমিনের বাহাদুরিতে আনন্দে নাচতে লাগলো আর বড়রা আমিনের গা-মাথা নেড়ে তাকে আদর সোহাগ করতে লাগলো।

শুধু নখেগোনা কয়েকজন হিংসুটে আর পরশ্রীকাতর লোকের মুখে ভিন্ন সুর শোনা গেল। তারা বলতে লাগলো– কি এমন বাহাদুর! ওসব ক্ষেত্রে আমাদের ছেলেরাও অমন বাহাদুরি দেখাতো। বাঘটা একটা দুর্বল মেছো বাঘ ছিল, ভয়ঙ্কর কোনো চিতাবাঘ বা গো-বাঘা নয়, তাই মমতাকে উদ্ধার করে আনতে পেরেছে। ছোট্ট মেছো বাঘ না হয়ে সুন্দরবনের বাঘের মতো ভয়ঙ্কর কোন বাঘ হলে, আমিন নিজেই বাঘের পেটে চলে যেতো আর এতদিন হজম হয়ে যেতো বাঘের পেটে। তার নাম নিশানা খুঁজে পাওয়া যেতো না।

থাক হিংসুটেদের কথা। গায়ে অল্প জ্বর উঠায় অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে রইলো মমতা। ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ার পর চোখ মেলে চেয়ে আমিনকে না দেখে সে শশব্যস্তে 'আমিন- আমিন' বলে ডাকহাঁক শুরু করলো। মমতার নানীজান জানালেন, আমিন একটু বাড়িতে গেছে, কিছুক্ষণ পরই সে আসবে।

বইঘর.কম ও রোকন
এ কথা শোনে মমতা হাত-পা ছুড়ে বলতে লাগলো– না না, বাড়িতে গেল কেন? ডেকে আনো ওকে! ও এখানে এসে থাকুক। লোক পাঠাও ডেকে আনতে...

মমতা বেজায় কান্নাকাটি জুড়ে দিলো। সে কান্না আর থামে না। মমতাকে দেখতে আমিন সত্যি সত্যি ওবেলা এলে আর প্রতিদিন আসতে থাকলে তবেই কিছুটা শান্ত হলো মমতা। তবে কিছুটা শান্ত হলো বটে, কিন্তু বাড়ির ভেতর ছাড়া সে একা একা কখনোই বাড়ির বাইরে এলো না। পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠে স্কুলে যাওয়ার অবস্থায় এসেও সে একা একা স্কুলে যেতে রাজি হলো না আদৌ। ফলে, আমিন এসে মমতাকে প্রতিদিন স্কুলে নিয়ে যেতে লাগলো। আমিন না আসা পর্যন্ত মমতা কোনদিন স্কুলের দিকে পাও বাড়ালো না।

এছাড়াও সমস্যা দেখা দিলো আরো। স্কুলের পথে বা স্কুলে একটা ইঁদুর বা আরশোলা কাছ দিয়ে দৌড় দিলে কিংবা জোরে একটা ব্যাঙ ডেকে উঠলে মমতা ছুটে গিয়ে আমিনকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরতে লাগলো। আর তাকে ছেড়ে দেয় না কিছুতেই। ক্লাসেও মমতা আমিনের একদম গা ঘেঁষে বসতো এবং ভয়ের সামান্যতম কারণ ঘটলেই সে জড়িয়ে ধরতো আমিনকে আর ঐভাবে জড়িয়ে ধরেই থাকতো। মমতার বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়া কষ্টকর হয়ে যেতো আমিনের।

এরপর মমতা বায়না ধরলো, আমিনকে সে তার বাড়িতে অর্থাৎ তার নানীজানের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রাখবে। আমিনকে ছাড়া সে একা থাকতে পারবে না। এই বায়না না সেই বায়না! শুনে আমিনের চাচা, মানে আবদুল মজিদ সাহেব বললেন আমাদের কোন আপত্তি নেই। মেয়েটা সব কিছুতেই এতই যখন ভয় পাচ্ছে, আমিন ওদের ওখানে গিয়েই থাকুক। এত ভয়ের মধ্যে থাকলে মেয়েটার মোটেই পড়াশুনা হবে না। অন্ততঃ বছর ছয়মাস থাকুক। মমতার ভয়টা কেটে গেলে আমিন তখন আবার ফিরে আসুক আমাদের বাড়িতে।

কিন্তু মমতার এই জিদে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন মমতার নানীজান। বললেন- মরণ। জিদ দেখে আর বাঁচিনে! বেটা নেই পুত নেই, আমি একা একা এই বাড়িতে অন্যের হাওলায় থাকি। পাড়া পড়শীরা দেখাশুনা করে আর রাজার সওদা করে এনে দেয়। সেই সাথে তারা রান্না বান্নায় এটা সেটা এগিয়ে পিছিয়ে দেয় বলে দুটো বেঁধে বেড়ে খাই। ওরা সাহায্য না করলে

আমার রান্না-বান্নাও হতো না আর আমার মুখেও ভাত উঠতো না। এই অবস্থায় এই মমতাটাকে পালন করতেই আমার যথেষ্ট তকলিফ হচ্ছে। তার উপর আর একটা ছেলেকে পালন করা কি আমার পক্ষে সম্ভব? কিছুতেই সম্ভব নয়। এটা হতেই পারে না।

মমতা তবু পীড়াপীড়ি করলে মমতার নানীজান বিরক্ত হয়ে বললেন- দেখো বাপু, তুমি এমন করলে, তোমার বাপকে খবর দেবো। তোমার বাপ এসে তোমাকে নিয়ে যাক। আমি তবু ওসব সইতে পারবো না।

বাপ এসে নিয়ে যাবে একথা ভাবতেই চমকে উঠলো মমতা। এখান থেকে চলে যাওয়া মানেই আমিনকে ছেড়ে যাওয়া। আমিনকে ছেড়ে থাকা। আমিনকে ছেড়ে থাকা মমতার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। তাই মমতার নানীজান বার বার তাকে সে হুমকি দিলে অগত্যা আস্তে আস্তে সে জিদ ছেড়ে দিলো মমতা।

সময়ই মস্তবড় দাওয়াই। সময়েই সব কিছু সয়ে যায়। আমিনকে বাড়িতে এনে না রাখতে পারলেও, আমিনের কাছে কাছে থেকে আর আমিনের সাথে দুই বাড়িতেই যাতায়াত করে খোশ হালেই দিন কাটতে লাগলো মমতার।

হাফ-ইয়ার্লি, অর্থাৎ ষান্মাসিক পরীক্ষা এগিয়ে আসতে লাগলো। ডবল প্রমোশন পাওয়ার আশায় আমিনের দেখাদেখি মমতাও গভীর মনোযোগ সহকারে লেখাপড়া করতে লাগলো। পড়াশুনায় এতই মনোযোগ দিল মমতা যে, আমিনের মতোই মমতাও যথেষ্ট ভাল করলো পরীক্ষায়।

কিন্তু ফলটা তারা তখনই জানতে পারলো না। পরীক্ষার পরেই গ্রীষ্মকালীন ছুটি এসে পড়ায়, ফল প্রকাশের আগেই বন্ধ হলো স্কুল। এতে করে মমতার সম্মতিক্রমে আমিন গ্রীষ্মকালীন ছুটির কয়েকটা দিন নিজ বাড়িতে গিয়ে কাটানোর জন্যে আবদুল মজিদের বাড়ি থেকে সুদূর নিজের বাড়িতে চলে গেল।

কিন্তু কয়েকদিন পরেই ইসলামপুরে ফিরে আসার ইরাদা থাকলেও আমিন তা পারলো না। নানা কারণে ছুটির পুরো মাসটাই সে বাড়িতে রয়ে গেল। এক মাস পরে সে ফিরে এলো ইসলামপুরে। ফিরে যখন এলো তখন তার চরমতম সর্বনাশটা সংঘটিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ মমতা আর ইসলামপুরে নেই। মমতার নানীজান ইন্তেকাল করেছেন আর মমতার বাপ এসে শূন্য বাড়ি থেকে মমতাকে নিয়ে গেছেন তাঁর সেই সুদূর মুলুকের বাড়িতে।

বইঘর.কম ও রোকন
আছাড় খেয়ে পড়লো আমিন। মমতার বাপের সে সুদূর মুলুকটা কোথায় তা জানা না থাকায় আর চেষ্টা করেও সে সুদূর মুলকের কোনই হদিস না পাওয়ায়, একেবারেই শয্যা নিলো আমিন। অবশ্য সে হদিসটা পেলেও কোন কাজে আসতো না তা। কারণ, আমিনের মতো পাঠশালায় পড়া এক দশ এগারো বছরের ছেলের পক্ষে কিইবা করার ছিল সেক্ষেত্রে।

মমতার শোকে কয়েকদিনের মধ্যেই কঠিন অসুখে নিপতিত হলো আমিন। দেখতে দেখতে সে মৃত্যুপথের যাত্রীতে পরিণত হলো। তার আহার গেল, পান ক্ষমতা গেল, হুঁশ, জ্ঞান, অনুভূতি সব উধাও হয়ে গেল। বন্ধ হলে জবান। সম্পূর্ণ অজ্ঞান হয়ে সে পড়ে রইলো বিছানায়। শ্বাস প্রশ্বাসের ক্ষীণ একটা ধারা আসা যাওয়া ছাড়া, তার নড়ন চড়ন বলে কিছুই রইলো না। রইলো শুধু প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাওয়ার অপেক্ষা। www.boighar.com

নানা রকম হেকিম, বৈদ্য ও কবিরাজের প্রাণপণ চেষ্টায় কিছুই না হওয়ায় ভীষণ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন আবদুল মজিদ সাহেব। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সংবাদ পাঠালেন আমিনের বাপের কাছে। এসে তিনি তাঁর সন্তানকে জীবিত দেখতে পাবেন কিনা, তা অনিশ্চিত– এ কথাও জানিয়ে দিলেন সেই সাথে। সংবাদ পেয়ে ডুকরে উঠলেন আমিনের আব্বা নবীর উদ্দিন খান সাহেব। পড়িমরি তিনি ছুটে এলেন ইসলামপুরে আর আবদুল মজিদ সাহেবের সহায়তায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকা পুত্র নূরুদ্দীন আমিনকে নিয়ে গেলেন নিজ বাড়িতে।

এর পর শুরু হলো আজরাইল আর মানুষে টানাটানি। চলতে লাগলো দোয়া কালাম, জিকির আসকার। আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহে এ টানাটানিতে জয় হলো মানুষেরই। উপলক্ষ, অত্যন্ত অভিজ্ঞ কয়েকজন ডাক্তারের প্রাণপণ চেষ্টা আর বাড়ির সকলের নিরন্তর শুশ্রূষা। এই উপলক্ষ্যের মাধ্যমে আস্তে আস্তে জ্ঞান ফিরলো আমিনের। আরো মাস খানেক পরে সে উঠে বসলো বিছানায়।

অতঃপর আরো দুই আড়াই মাস পরে আমিন যখন পুরোপুরি সুস্থ ও সবল হয়ে উঠলো তখন তার আব্বা নবীরউদ্দীন খান সাহেব নজর দিলেন আমিনের পড়শুনার দিকে। তাকে আবার তিনি ইসলামপুর পাঠশালায় পাঠানোর চিন্তা করে আবদুল মজিদ সাহেবকে ডেকে পাঠালেন। আবদুল মজিদ সাহেবও এসে আমিনকে সাগ্রহে ইসলামপুরে নিয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু একেবারেই বেঁকে বসলো আমিন। ইসলামপুরের কথায় মমতার কথা মনে আসায় হু হু করে কেঁদে উঠলো আমিনের মন। যে ইসলামপুরে মমতা নেই, যেখানে গেলে সে মাথাকুটেও আর মমতার দেখা পাবে না, সে ইসলামপুরে যেতে

কিছুতেই রাজী হলো না আমিন। পড়াশুনা যদি ছেড়ে দিতেও হয় তাও কবুল, তবু ইসলামপুরে আর যাবে না। এই পণ করে অটল হয়ে রইলো সে।

অগত্যা আর কি করা। ফের অন্য দিকে নজর দিলেন আমিনের আব্বা। চেষ্টা করে অন্যদিকে অনেক দূরে আর এক মুসলিম প্রধান এলাকার সন্ধান পেলেন তিনি। সেখানে একটা পাঠাশালা ছিল আর পাঠশালার পাশেই নামকরা এক হাই স্কুল ছিল। অন্য এক বন্ধুর মাধ্যমে আমিনের আব্বা আবদুল মজিদ সাহেবের মতোই আর এক সহৃদয় ব্যক্তি পেয়ে গেলেন। এতে করে আমিনকে সেই সহৃদয় ব্যক্তিটির বাড়িতে রেখে সেখানকার পাঠশালায় ভর্তি করে দিলেন। ইসলামপুরে যেতে আপত্তি করলেও আমিন এই নতুন জায়গায় আসতে আর আপত্তি করলো না।

অতঃপর এই নতুন জায়গাতেই চলতে লাগলো আমিনের পড়াশুনা। পাঠশালা থেকে হাইস্কুল আর হাইস্কুল থেকে উচ্চ শিক্ষা। সময়ই সব বেদনার দাওয়াই। দিনে দিনে মমতার কথা ভুলে গেল আমিন। মমতার স্মৃতি তার মন থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। হারিয়ে গেল আমিন ও মমতার সেই কাহিনী। শুধু সে দিনের নাম পরিচয়হীন এক মেয়ের ভালবাসা আমিনকে আজীবন আচ্ছন্ন করে রাখলো।

ইসলামপুর কলেজ বিল্ডিংয়ের বাইরের এক বারান্দায় শুয়েছিল মৌলভী নূরু মিয়া। অতীত স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে কেটে গেল তার রাত। জমিদার খান বাহাদুর সাহেবের খামারবাড়িতে পানি খেতে আসা আগন্তক জহিরউদ্দিন খামারুর মাধ্যমে অতীতের কথা স্মরণে আসায় বিপুল আগ্রহ নিয়ে ইসলামপুরে ছুটে এসেছিল নূরু মিয়া কিন্তু ইসলামপুরে পৌঁছে সে হতাশ হয়ে গেল। সে দিনের সেই পাঠশালাটা আর নেই। সেখানে কলেজ উঠেছে। নেই তার অতীতের সেই চেনাজানা লোকগুলো। নেই সেই মাজেদা খাতুন, সেই শামশের আলী, তার লজিংমাষ্টার আবদুল মজিদ সাহেব, নেই তার সেদিনের চেনাজানা কোন কেউই। কে কোথায় গেছে, কে জানে। মমতার কোন হদিস তো সে পেলোই না, তার নানীজানের বাড়ির কোন নাম নিশানাও আজ খুঁজে পেলো না নূরু মিয়া।

আরো কয়েকদিন থেকে খোঁজ করলো সে। কিন্তু লাভ কিছুই হলো না। অবশেষে হতাশ হয়ে নূরু মিয়া ফের ফিরে চললো তার সেই কিছু দিনের সাময়িক আবাসে। অর্থাৎ জমিদার মোজাফফর আহমদ খান বাহাদুর সাহেবের বাড়িতে। মনে তার নানা চিন্তা। কাউকে কিছু না বলে চলে এসেছে সে। সে বাড়ির সবাই, বিশেষ করে, শবনম সাদিকা কি ভাবছেন, কে জানে।

ছুটে চলেছে ট্রেন। তার চিরসঙ্গী লাঠিটা সাথে নিয়ে একটা ইন্টার ক্লাশ কম্পার্টমেন্টে বসে আছে নূরু মিয়া। খুবই ছোট কম্পার্টমেন্ট। একটি মাত্র গদী আঁটা বেঞ্চ আর সে বেঞ্চে তিনজন মাত্র যাত্রীর বসার জায়গা। এক্ষণে নূরু মিয়া ছাড়া সেই কামরায় অন্য কোন যাত্রী নেই। দ্রুত বেগে ছুটে চলেছে ট্রেন আর একা একা বসে থেকে সেই ঝাকুনিতে মৃদু মৃদু দুলছে নূরু মিয়া। দুলছে আর ভাবছে তার সেই বাল্যকালের কথা। ইসলামপুর পাঠশালার সেই

বইঘর.কম

অতীত। ভাবতে ভাবতে নূরু মিয়ার দুই চোখের পাতা ভিজে উঠলো অশ্রুতে। সেই সাথে সে ভাবতে লাগলো, তার প্রাণপ্রিয় সহপাঠিনী মমতা আজ কোথায়, কে জানে। বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই সে আজ ঘর করছে অন্য কারো। তার প্রাণের প্রাণ আমিনের কথা কখনো কখনো হয়তো স্মরণে আসছে তারও।

এটা মনে হতেই ঝরঝর করে অশ্রু ঝরে পড়তে লাগলো আমিনের চোখ থেকে। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো সে। আপন খেয়ালে গেয়ে উঠলো–

শাওন রাতে যদি, স্মরণে আসে মোরে–
বাহিরে ঝড় বহে, নয়নে বারি ঝরে।
ভুলও স্মৃতি মম, নিশীথ স্বপন সম,
আঁচলের গাঁথা মালা, ফেলিও পথ ’পরে।
বাহিরে ঝড় বহে, নয়নে বারিঝরে।
শাওন রাতে যদি   ।

কিছুক্ষণ গাইতেই ট্রেন এসে এক স্টেশনে থামলো। দুই তিন জন লোক তার কামরায় উঠার জন্যে উঁকিঝুঁকি মারছে দেখেই নূরু মিয়া থামিয়ে দিলো গান আর মুছলো তার চোখ। কিন্তু লোকগুলো তার কামরায় উঠলো না। ট্রেন আবার চলতে শুরু করলো। একা বসে বসে ফের দুলতে লাগলো নূরু মিয়া। দুলতে দুলতে সে আপন খেয়ালে ফের গেয়ে উঠলো–

ঝুরিবে পূবালী বায় গহন দূর বনে
রহিবে চাহি তুমি একেলা বাতায়নে।
বিরহী কুহু কেকা গাহিবে নীপ শাখে,
যমুনা নদীপারে, শুনিবে কে যেন ডাকে,
বিজলী দীপ শিখা, খুঁজিবে তোমায় প্রিয়া–
দুহাতে ঢেকো আঁখি, যদি গো জলে ভরে।
বাহিরে ঝড় বহে, নয়নে বারি ঝরে।
শাওন রাতে যদি... ।

বিহ্বল অবস্থায় আস্তে আস্তে নেতিয়ে পড়লো নুরু মিয়া। কামরার দুয়ার বন্ধ করে সে ঘুমিয়ে পড়লো দীর্ঘ কান্তিতে। কেটে গেল গোটা রাত। ঘুম ভাঙলো পরের দিন সকালে। বেলা তখন উঠে গেছে। নির্দিষ্ট স্টেশানে পৌঁছতে তার সামনে আর কয়েকটা স্টেশান। বসে রইলো নূরু মিয়া। তার নির্দিষ্ট ষ্টেশান

মানে, জমিদার খান বাহাদুর সাহেবের বাড়ির নিকটবর্তী স্টেশান। সে স্টেশানও এসে গেল। লাঠি হাতে নিয়ে নেমে পড়লো সে। হাঁটতে লাগলো দোদুল্যমান চিত্তে খান সাহেব ও তাঁর বাড়ির লোকজনের কাছে তার এই নিরুদ্দেশ হয়ে থাকার কি কৈফিয়ত দেবে সে, এই চিন্তাই এখন তার বড় চিন্তা। স্টেশান থেকে খান বাহাদুর সাহেবের বাড়ির দূরত্ব আধা মাইল। এই আধা মাইল পথ আনমনে হেঁটে আসতে লাগলো, নূরু মিয়া। বাড়ির একদম কাছাকাছি আসতেই হঠাৎ আওয়াজ 'বাঁচাও বাঁচাও'। সেই সাথে বিরাট হৈ চৈ।

চমকে উঠলো নূরু মিয়া। খান বাহাদুর সাহেবের গৃহের ফটকের বাইরে অল্প একটু দূরে হালকা একটা জঙ্গল, তথা কুল পেয়ারা আমড়া, কামরাঙ্গা প্রভৃতি ফলের গাছ গাছড়া। চিৎকার আসছে ঐ ফলের গাছ গাছড়ার ভেতর থেকে।

চিৎকার কানে পড়তেই বিদ্যুৎ বেগে ছুটে এলো নূরু মিয়া। কয়েক গজ দূরে থেকে দেখলো অভাবনীয় কাণ্ড। দশ বারো জন দুর্বৃত্ত লাঠিসোটা নিয়ে ঘিরে ধরেছে শবনম সাদিকাকে। একজনের হাতে বন্দুক। শবনম সাদিকা পরীর মাকে আঁকড়ে ধরে আছে আর দুবৃত্তেরা শবনম সাদিকাকে ছিনিয়ে নিচ্ছে পরীর মায়ের বুক থেকে। বিশ্বস্ত নওকর কেতাব আলী শবনম সাদিকাদের আগলে নিয়ে থেকে দুর্বৃত্তদের ঠেকা দেয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। কিন্তু প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে খড়কুটার মতেই উড়ে যাচ্ছে কেতাব আলী। পলক না পড়তেই নূরু মিয়া দেখলো, কেতাব আলীকে সজোরে ধাক্কা মেরে ফেলে দিলো দুর্বৃত্তরা। ছিটকে গিয়ে পড়ে কেতাব আলী আর্তনাদ করে উঠলো।

লাফিয়ে উঠলো নূরু মিয়া। 'হুঁশিয়ার' বলে হুংকার দিয়ে উঠে সে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো দুশমনদের উপর। দুশমনেরা কিছু বুঝে উঠার আগেই নূরু মিয়ার লাঠির দুরন্ত সঞ্চালনে ফটাফট ফেটে গেল কয়েকজনের মাথা। ভেঙ্গে গেল কয়েকজনের হাত পা।

আঁতকে উঠলো দুশমন অর্থাৎ দুবৃত্তরা। শবনম সাদিকাদের ছেড়ে দিয়ে তারা এবার একজোগে ঘিরে ধরলো নূরু মিয়াকে। তাকে আঘাত করার চেষ্টা করলো। কিন্তু ব্যর্থ চেষ্টা। ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে লাঠিসোটা তোলার কোন ফুরসুতই পেলো না তারা। নূরু মিয়ার লাঠির ঘূর্ণিঝড়ে তারা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল জমিনে। 'ওরে বাপরে আজরাইল! পালাও পালাও', বলে হাত মাথা চেপে ধরে নিয়ে পড়িমরি সবাই তৎক্ষণাৎ পালিয়ে যেতে লাগলো। পালিয়ে চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু পালিয়ে যাওয়ার সময় বন্দুক ধারী দুবৃত্তটা

গুলি করলো নূরু মিয়াকে লক্ষ্য করে। গুলি করেই সেও অদৃশ্য হয়ে গেল।

গুলি এসে লাগলে– নূরু মিয়ার বাম বাহুতে। উড়ে গেল বাম বাহুর এক পাশের সমস্ত মাংস। বেরিয়ে গেল হাড়। জ্ঞান হারিয়ে জমিনে লুটিয়ে পড়লো নূরু মিয়া।

ইতিমধ্যেই গোলমাল শুনে হৈ হৈ করে ছুটে এলো খান বাহাদুর সাহেবের বাড়ির সমস্ত লোকজন। ছুটে এলো ফটকের প্রহরীরা। খামার বাড়ির কিষাণেরা। সকল পাইক পেয়াদা। অন্যান্য চাকর-নফর। ছুটে এলেন ম্যানেজার কোরবান আলী মিয়া। জমিদার খান বাহাদুর সাহেব বাড়িতে না থাকায়, এলেন না শুধু তিনিই।

সবাই এসে দেখলো, নূরু মিয়া পড়ে আছে জমিনে। দেখলো, দুশমনেরা সবাই চলে গেছে ইতিমধ্যেই। দেখলো খান বাহাদুর সাহেবের নয়া বিবি গুলজাহান বানু বেগমের বিশ্বস্ত ঝি কছিমন বিবি সন্ত্রস্তভাবে পালিয়ে যাচ্ছে অন্যপথে। আরো তারা দেখলো, নয়া বিবি গুলজাহানের এক তাঁবেদার পাড়ার কাবের শেখও দৌড়ে পালাচ্ছে। তাদের আচরণ শুধু সন্দেহজনকই নয়, তারা যে দুশমন দলের সাথেই ছিল, এ ব্যাপারে সবাই নিঃসন্দেহ হয়ে গেল। এতে করে আওয়াজ উঠলো– ধরো! ধরো ঐ দুইজনকে।

সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন পাইক গিয়ে বেঁধে ফেললো কাবের শেখ আর কছিমন বিবিকে। ম্যানেজার সাহেব ব্যস্তকণ্ঠে বললেন– তুলো, তুলো, মৌলভী নূরু মিয়াকে তুলে নিয়ে শিগগির মহলে চলো। এক্ষুণি তার শুশ্রূষা আর ডাক্তার ডেকে চিকিৎসা শুরু করতে হবে"।

তৎক্ষণাৎ সংজ্ঞাহীন নূরু মিয়াকে তুলে নিয়ে মহলে এলেন সবাই। মহলে এসে নূরু মিয়াকে তার নির্দিষ্ট কক্ষে নেয়ার চেষ্টা করতেই বাধা দিলো শবনম সাদিকা। তার নির্দেশে নূরু মিয়াকে শবনম সাদিকার শয়নকক্ষে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দেয়া হলো।। সাথে সাথেই লোক ছুটলো ডাক্তার ডেকে আনতে আর শুরু হলো শুশ্রূষা। নূরু মিয়ার শুশ্রূষায় শবনম সাদিকা এবার জান ছেড়ে দিলো।

উল্লেখ্য যে, ম্যানেজার সাহেবের নির্দেশে কছিমন বিবি ও কাদের শেখকে বন্দিখানায় বন্দি করে রাখা হলো। জমিদার খান বাহাদুর সাহেব কয়েকদিনের জন্যে বহুদূরে তাঁর বৃদ্ধা ভগ্নিকে দেখতে গিয়েছিলেন। তিনি ফিরে এসে এদের ব্যাপারে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন, তিনিই তা

বইঘর.কম ও রোকন

করবেন এই বিবেচনায় এদের আটক রাখা হলো। সেই সাথে কড়া পাহারা রাখা হলো এদের উপর। আর এদের সাথে নয়া বিবি গুলজাহান বানু বেগমের উপরও। কারণ, শবনম সাদিকার দৃঢ় বিশ্বাস, সুযোগ পেলেই নয়া বিবি যে কোন অঘটন ঘটিয়ে ফেলতে পারে।

শবনম সাদিকার উপর এই হামলার ঘটনাটা যেমনই ভয়ংকর, তেমনই সুদূরপ্রসারী–

দেশ বিভাগের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। প্রচণ্ড চাপের মুখে ভারতবর্ষকে হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান এই দুই দেশে বিভক্ত করে দিয়ে এদেশ থেকে চলে যাচ্ছে ইংরেজরা। এই দুই দেশের সীমানা নির্ধারণও চূড়ান্ত হয়ে গেছে। শুধু ঘোষণাটা বাকী আছে। এই যা। এই সীমানা নির্ধারণ অনুযায়ী জমিদার খান বাহাদুর সাহেবের জমিদারীটা গোটাই পাকিস্তানে, অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানে পড়েছে। ষষ্ঠীতলার জমিদার দীদার আলী শাহর জমিদারীটা পড়েছে হিন্দুস্থানে, অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে। অতি অল্প দিনের মধ্যেই ঘোষণাটা হয়ে যাবে আর দুই দেশ দুই পৃথক পৃথক গভর্ণর জেনারেলের হাতে পড়বে। তা পড়ামাত্র এক দেশে অন্য দেশের লোকের যাতায়াত বাধাগ্রস্ত হবে। বন্ধ হয়ে যাবে ষষ্ঠীতলার জমিদার আর ষষ্ঠীতলার লোকের স্বাধীনভাবে খান বাহাদুর মোজাফফর আহমদ সাহেবের জমিদারীতে যাতায়াত। সেই সাথে বন্ধ হয়ে যাবে ইংরেজদের বলে বলিয়ান হয়ে ষষ্ঠীতলার জমিদারের খান বাহাদুর সাহেবের জমিদারীর উপর প্রভুত্ব খাটানোও। খান বাহাদুর সাহেবের উপর অন্যায় চাপ সৃষ্টি করাও।

বড়ই চিন্তায় পড়ে গেছেন ষষ্ঠীতলার জমিদার দীদার আলী শাহ। পুত্র বাহাদুর আলী শাহর সাথে খান বাহাদুরের মেয়ের শাদি দিয়ে খান বাহাদুরের জমিদারীটা হাত করা তাঁর তো হলোই না, উল্টো খান বাহাদুরের মেয়েকে জোর করে ধরে আনতে গিয়ে পুত্র বাহাদুর আলী আজ অথর্ব ও পঙ্গু। প্রাণটাই চলে গিয়েছিল। কিন্তু প্রাণটা না গিয়ে চিরজীবনের মতো বাহাদুর আলী হয়ে রইলো পঙ্গু ও অচল। এমন পঙ্গু যে, জড় পদার্থের মতো পড়ে থাকা ছাড়া নড়ন চড়নের কিছু মাত্র সামর্থ তার রইলো না।

এর একটা চরম প্রতিশোধ নেয়ার প্রবল ইচ্ছা ছিল দীদার আলী শাহর। কিন্তু এই দেশ বিভাগের ফলে সে ইচ্ছাও তাঁর অপূরণ থেকে যাচ্ছে। আর কয়টা

বইঘর.কম ও রোকন
মাত্র দিনের পরই খান বাহাদুরের এলাকা হারাম হয়ে যাচ্ছে তাঁর জন্যে। ওদিকে তাদের যাতায়াত আর থাকবে না। যা কিছু করা যায়, এই কয়েকদিনের মধ্যে করা গেলে গেল, না গেলে ইচ্ছে তাঁর চিরতরে খতম।

দুঃসহ মর্মপীড়ায় ছটফট করছেন জমিদার দীদার আলী শাহ। খান বাহাদুরের মেয়েটাকে ধরে এনে বারোজনের ভোগে লাগানোর পর তাকে হত্যা করতে পারলেও তাঁর মর্মপীড়া অনেকখানি লাঘব হয়। কিন্তু ধরে আনার সুযোগটা কোথায়? ঐ মেয়ে শবনম সাদিকা বাড়ির বাইরে আসে না। কখনো এলে গাড়ি করে আসে আর গাড়িতে থাকে তার সেই দৈত্যের মতো ভয়ংকর চাকর নূরু মিয়াটা। অন্তত ঐ দানবটা না থাকলেও শেষ বারের মতো মেয়েটার উপর একটা ছোঁ মেরে দেখা যায়। দীদার আলী শাহ ভাবছেন আর ছটফট করছেন যাতনায়।

কথায় বলে, 'যত মুস্কিল তত আহসান'। দীদার আলীর এই আকাঙ্ক্ষার আগুনে সাগ্রহে এসে কাঠখড়ি যোগালেন খান বাহাদুর সাহেবের নয়া বিবি গুলজাহান বানু বেগম। উদ্দেশ্য দুইজনের ঐ একই। শবনম সাদিকার ধ্বংস। 'যে নয় আমারে, তারে নিয়ে যাক চামারে, নিজের ভোগে লাগবে না যা, শেয়াল কুকুরে খাকগে তা'- এই নয়া বিবির। খান বাহাদুরের জমিদারীটা দীদার আলীর মতো নয়। বিবিও পাচ্ছেন না। এটা এখন স্পষ্ট। কাজেই দীদার আলী শাহ আর নয়া বিবির ইচ্ছা এখন এক ও অভিন্ন। শবনম সাদিকাকে শেষ করে ফেলা।

www.boighar.com

শবনম সাদিকা নয়া বিবিকে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে জানিয়ে দিয়েছে। জান গেলেও নয়া বিবির বোনপুত তেজারত আলীর মতো একটা অপদার্থকে সে শাদি করবে না। ও দিকে আচরণে আর চাল চলনে নয়া বিবির কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, শবনম সাদিকা ঐ দাসানুদাস নূরু মিয়াকে ছাড়া অন্য আর কাউকেই শাদি করবে না।

এটা নিশ্চিত হয়ে যাওয়ার পর থেকেই নয়া বিবিও দীদার আলীর মতোই নিদারুণ মর্মপীড়ায় ভুগছেন। এর প্রতিশোধের পথ কি?

তিনি দুই হাতে হাতড়াচ্ছেন। পথ না পেয়ে অবশেষে শরণ নিলেন তাঁর একান্ত তাঁবেদার কুচক্রী কাবের শেখের। তাকে ডেকে এনে বললেন– এটা কি হলো কাবের মিয়া? কোন প্রতিকারই কি করা যাবে না শবনমের এই ঔদ্ধত্যের? আমার মাথায় পয়জার মেরে সে আমারই মুখের সামনে সুখে সংসার করবে একটা ভবঘুরেকে নিয়ে? এটা কি সহ্য করা যায়? কোন পথই

কি বের করতে পারলে না?

কাবের শেখ মাথা চুলকিয়ে বললো– কি পথ বের করবো হুজুরাইন! চিন্তা করে তো কোন দিক দিশা পাচ্ছিনে।

হুজুরাইন বললেন– ষষ্ঠীতলার ওরা করছে কি? দীদার আলী শাহ্র ছেলের ঐ দশা হলো যার জন্যে, তার উপর প্রতিশোধ নেয়ার কি কোনই আক্রোশ জাগছে দীদার আলীর মনে?

কাবের শেখ বললো– জাগছে মানে কি হুজুরাইন? আক্রোশে জ্বলেপুড়ে মরছেন তিনি। আক্রোশ মিটাতে না পেরে নিজের বাহু নিজেই তিনি কামড়াচ্ছেন।

সে কথা তো অনেক দিন থেকেই শুনছি। বর্তমানে তার মনের ভাব কি? তার মনের সে আগুন কি নিভে গেছে?

তাহলে দেখতে হয় তো হুজুরাইন। এখন একবার গিয়ে জেনে আসতে হয়।

তাহলে যাও। গিয়ে তার মনের ভাবটা জেনে আসো জলদি। ইরাদা তার ঠিক থাকলে, আমি এবার তার পাশে দাঁড়াবো।

জো হুকুম হুজুরাইন। হুকুম হলেই যেতে পারি।

সেই হুকুমটাই তো দিচ্ছি। যাও শিগিরই।

জো হুকুম জো হুকুম তবে...।

: তবে?

যেতে তো কিছু খরচাপাতি আছে হুজুরাইন। আমি গরীব মানুষ। আমি সে খরচ...।

আরে আরে! খরচের কথা ভাবছো কেন? খরচাপাতি আমি দিচ্ছি। তুমি যাও–

কাবের শেখের তাঁবেদারী করাটা দরদের টানে নয়, স্বার্থের টানে। কথায় কথায় দু'হাত ভরে পাওয়ার লোভে হুজুরাইনের এ কথায় কাবের শেখ গদ গদ কণ্ঠে বললো– হুজুরাইন দরাজদীল। তাহলে দিন হুজুরাইন, আমি যাই।

প্রয়োজনের অতিরিক্ত পয়সাকড়ি দুই হাত ভরে পেয়ে কাবের শেখ ষষ্ঠীতলায় ছুটলো। কয়েকদিন পরই ফিরে এসে সে হৃষ্টচিত্তে গুলজাহান বানু বেগমের সামনে দাঁড়ালো। গুলজাহান বানু প্রশ্ন করলেন– কি বুঝে এলে? দীদার আলী

বইঘর.কম ও রোকন

শাহর মনোভাবটা কি?

কাবের শেখ মহোল্লাসে বলে উঠলো– মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি হুজুরাইন। দীদার আলী শাহ প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে অবিরাম কামারের হাঁপড়ের মতো ফুঁসছেন। কিন্তু কোন পথ না পেয়ে ছটফটই করছেন শুধু কিছু করতে পারছেন না।

কেন? করতে পারছেন না কেন? দাঁও বুঝে ঘা মারলেই তো কর্মসিদ্ধি হয়ে যায়।

: কিন্তু সেই দাঁওটা কোথায়? শবনম সাদিকা একা পথে বেরোয় না। এখানে এই বাড়িতে এসে কিছু করাও দুঃসাধ্য। আপনার বাড়ি ভরা লোক। পাইক পেয়দা-প্রহরী। এর উপর আবার ঐ ভয়ংকর চাকরটা। মানে, ঐ নূরু মৌলভীটা। এখানে আসে কোন সাহসে?

: আমি যে তার পাশে দাঁড়াবো, সে কথা দীদার আলীকে বলোনি?

বলেছি। কিন্তু আপনি কি ভাবে তাঁর পাশে দাঁড়াবেন, সে কথা তো বুঝিয়ে কিছু বলেননি।

এবার বলছি, শুনো!

বলুন হুজুরাইন, বলুন। আমি আবার গিয়ে সে কথা দীদার শাহকে বলে আসি।

হ্যাঁ, যাও বলে এসো। বলে এসো, এক সুবর্ণ সুযোগ এসে গেছে। আগামী পরশু শুক্রবার আমাদের জমিদার সাহেব তাঁর বোনকে দেখতে প্রায় সপ্তাহ খানেকের জন্যে সুদূর এলাকায় চলে যাচ্ছেন। ঐ নচ্ছার নূরু মিয়াটাও এখন এখানে নেই। ও নিরুদ্দেশ। এই সুযোগে দীদার আলী শাহ দশ পনের জন লোক পাঠিয়ে দিক। তারা এসে শবনমকে শূন্যে শূন্যে তুলে নিয়ে যাক। বাধা দেয়ার কেউ থাকবে না।

কেন হুজুরাইন! আপনার বাড়িতে এত লোকজন, পাইক-পেয়াদা-প্রহরী...।

তারা টেরই পাবে না। আগামী রবিবার বিকেলে কায়দা করে শবনমকে আমি পাঠিয়ে দেবো মহলের বাইরে। অনেকখানি দূরে বাইরের জঙ্গলে। শবনম কুল পেয়ারা কামরাঙ্গা খেতে যাবে সেখানে। ব্যস, ঐ দিন ঐ সময়ে এসে জঙ্গল থেকেই তারা তুলে নিয়ে যাবে শবনমকে। কেউ টেরই পাবে না। টের যখন পাবে তখন দেখবে কেউ সেখানে নেই। টের পাওয়ার আগেই

শবনমকে নিয়ে তারা দ্রুত সেখান থেকে সরে পড়লেই হলো।

বহুৎ আচ্ছা- বহুৎ আচ্ছা। আমি তাহলে যাই হুজুরাইন। সেইভাবেই বলে আসি।

যাও বলে এসো।

জি যাই। তবে...।

কি, পয়সা কড়ি? মানে পথ খরচা?

: জি, বুঝতেই তো পারছেন। আমি গরীব মানুষ...।

দিচ্ছি-দিচ্ছি, তুমি যাও!

পয়সা কড়ি নিয়ে চলে গেল কাবের শেখ। এরপর হুজুরাইন গুলজাহান বানু বেগম তাঁর নিজস্ব ও অনুগত বাঁদী কছিমন বিবিকে ডেকে নিয়ে বললেন– তোমাকে একটা শক্ত কাজ করতে হবে কছিমন। শক্ত মানে বুদ্ধি শুদ্ধির কাজ।

বাঁদী কছিমন প্রশ্ন করলো– কি কাজ হুজুরাইন?

হুজুরাইন বললেন– কাজটা হলো, শবনম সাদিকাকে মহল থেকে বের করে ফটকের ওপারে দূরে ঐ জঙ্গলে নিয়ে যেতে হবে।

সে কি হুজুরাইন! তা কি সম্ভব?

: সম্ভব নয় কেন?

আমার কথায় কি বাইরে যাবে শবনম সাদিকা? সে মেয়েই নয় ও।

সেই জন্যেই তো বলছি, কাজটা বুদ্ধির কাজ। সে জন্যে তোমাকে বুদ্ধি খাটাতে হবে।

: বুদ্ধি খাটাতে হবে। কি বুদ্ধি খাটাবো হুজুরাইন?

ফটকের ওপারে ঐ জঙ্গলটাতো আসলে জঙ্গল নয়। ওটা একটা ফল বাগান। বরই (কুল), পেয়ারা, আমড়া, কামরাঙ্গা, জাম এইসব ফল গাছের বাগান। ফল গাছের জঙ্গল। ফল খাওয়ানোর লোভ দেখিয়ে ওকে ডেকে নিয়ে যাবে ওখানে।

: হুজুরাইন!

শুনলাম, বরইগুলো পেকে টস টসে হয়ে গেছে। পেয়ারা, কামরাঙ্গাগুলোও ডাঁশা হয়ে উঠেছে। ওকে ঐ বরই খাওয়ার লোভ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। বরই শবনমের খুবই পছন্দ। একে ওকে দিয়ে, মাঝে মাঝেই সে বরই নামিয়ে

বইঘর.কম ও রোকন

এনে খায়। ঐ পাকা বরই খাওয়ার কথা বলে ওকে ওখানে নিয়ে যাবে।

তারপর?

তারপর তোমার কোন কাজ নেই। ওকে তুমি ওখানে পৌঁছে দেবে, ব্যস। ওর ব্যবস্থা যার করার তারা করবে।

তারা কারা হুজুরাইন?

ষষ্ঠীতলার জমিদারের গুণ্ডারা। ষষ্ঠীতলার জমিদার দীদার আলীর ছেলে ঐ শবনমের বৈবন্দে (কারণে) পঙ্গু হয়ে গেছে জানো না? সেই শোধ ওরা নেবে না?

মানে শবনমকেও পঙ্গু করে দেবে?

: শুধুই পঙ্গু করা? সবাই ওকে নিয়ে ফূর্তি করার পর ওকে খতম করে দেবে।

কছিমন বিবি চমকে উঠে বললো– সে কি হুজুরাইন! খতম? একদম খতম?

হুজরাই ঠেশ দিয়ে বললেন– কেন, তোমার দরদ লাগছে?

: না, মানে একদম খতম করাটা কি ঠিক হবে?

কেন হবে না? জঞ্জাল সাফ হয়ে যাবে। ও তোমাকে দুইবেলা কত গঞ্জনা দেয়, গাল মন্দ করে, খেয়াল নেই? তোমাকে দূর দূর ছেই ছেই করে?

তা যা বলেছেন হুজুরাইন। আমি তার সামনে পড়লেই গায়ে তার আগুন জ্বলে উঠে। অনেক কটু কথা কয়। হুমকি ধমকি দেয়। ওর জন্যে আমি সহজভাবে চলাফেরা করতে পারিনে। সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়।

তবে? জঞ্জাল সাফ হয়ে গেলে কি ভাল হবে না তোমার? তুমি তখন স্বাধীন। আরামে সারা মহল ঘুরে বেড়াতে পারবে। ও না থাকলে, আমার ভয়ে তখন কেউ তোমাকে কিছু বলতে পারবে না।

: ঠিক হুজুরাইন, ঠিক। একথা একদম ঠিক।

সেই জন্যেই তো বলছি জঞ্জালটা সাফ করতে আমাকে সাহায্য করো। ওকে ঐ জঙ্গলে নিয়ে যাও। তবে দেখো, ওকে ঐ বরই তলায় পৌঁছে দিয়েই যেন সঙ্গে সঙ্গে চলে এসো না। যতক্ষণ দীদার আলীর লোকেরা এসে হাজির না হয়, ততক্ষণ নানা কথা বলে ওকে ওখানেই আটকিয়ে রাখবে। বুঝেছো?

: জি হুজুরাইন, বুঝেছি। কিন্তু কবে, মানে কখন শবনমকে ঐ বরই খাওয়াতে নিয়ে যাবো?

ও হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে কথা তোমাকে বলাই হয়নি। ওকে ওখানে নিয়ে যাবে

বইঘর.কম ও রোকন

আগামী রবিবার বিকেলে।

আগামী রবিবার বিকেলে?

হ্যাঁ, আগামী রবিবার ঠিক বিকেলে। খেয়াল থাকবে তো? আগামী রবিবার বিকেলে।

ঠিক খেয়াল থাকবে হুজুরাইন। এ সব কাজে আমার ভুল হয় না।

তো এখন যাও। কাজটা ঠিক মতো করা চাই কিন্তু।

: জি আচ্ছা হুজুরাইন, জি আচ্ছা।

রবিবার দুপুর বেলা হাসি হাসি মুখে শবনম সাদিকার কাছে ছুটে এলো কছিমন বিবি। ব্যস্তকণ্ঠে বললো– খুব একটা ভাল খবর আছে ছোট হুজুরাইন, জব্বোর ভাল খবর।

শবনম সাদিকা নারাজকণ্ঠে বললো– তুমি? তুমি এনেছো ভাল খবর?

জি ছোট হুজুরাইন। জব্বোর ভাল খবর। ভাল খবর না হলে মন্দ খবর নিয়ে আপনার কাছে আসার কি সাহস করি আমি? আমার ঘাড়ে কয়টা মাথা আছে?

আচ্ছা। তা নূরু মিয়া কি ফিরে এসেছে?

না হুজুরাইন, সে খবর নয়।

তবে?

বরই হুজুরাইন। টস টসে পাকা মিষ্টি বরই। যে বরই আপনি খুব পছন্দ করেন, সেই মিষ্টি বরই। পেকে টসটসে হয়ে আছে।

কোথায়?

ঐ যে ঐ ফলবাগানে। একে ওকে দিয়ে যেখান থেকে বরই এনে খান, সেখানে। এ মিষ্টি গাছের সব বরই পেকে একদম টুকটুকে হয়ে উঠেছে। একটু বাতাসেই ঝর ঝর করে ঝরে পড়ছে সব।

: তাই?

: জি হুজুরাইন, সেই জন্যেই তো ছুটে এলাম খবরটা দিতে।

বরইয়ের উপর শবনম সাদিকার বড়ই আকর্ষণ। খুবই পছন্দের ফল তার। তাই কছিমন বিবির হঠাৎ এই সুখবর বয়ে আনার উদ্দেশ্যটা তলিয়ে দেখতে ভুলে গেল শবনম। বললো– সত্যিই তো খুব ভাল খবর এনেছো তুমি ।

বইঘর.কম ও রোকন

আনতে হয়তো ঐ বরই ।

চলুন ছোট হুজুরাইন, আজ বিকেলেই যাই ঐ বরই গাছতলা। বরই নামাইগে চলুন ।

আমি আবার নামাতে যাবো কেন? যেগুলো বাতাসে পড়ছে সেগুলো কুড়িয়ে আনলেই হলো ।

কি যে বলেন ছোট হুজুরাইন। ঐ পড়ে থাক ইন্দুরে বাঁন্দুরে চাটা বরই খাবেন আপনি? গাছ থেকে টাটকা নামিয়ে টাটকা টাটকা খাবেন, চলুন । এর স্বাদই আলাদা ।

শবনম সাদিকাও এটা বুঝে। টাটকা নামিয়ে টাটকা খেতে শবনম সাদিকাও ভালবাসে। তাই সে ইতস্তত করে বললো– তা ঠিক। কিন্তু-

: কিন্তু কি হুজুরাইন?

মহল থেকে বেরিয়ে ঐ ফল বাগানে যাবো? কেউ দেখে ফেললে?

কছিমন বিবি তাচ্ছিল্যের সাথে বললো– তাতে আপনার কি? যে দেখে ফেলে ফেলুক গে। আপনি কি তাদের কাউকে ভয় করেন, না কারো সাধ্য আছে আপনাকে বাধা দেয়ার বা নিষেধ করার?

www.boighar.com

: কছিমন!

বাধা দিতে পারতেন একমাত্র আপনার আব্বা। তিনি তো বাড়িতে নেই। আর আপনার ভয় কাকে?

তা ঠিক তা ঠিক। এখন গেলে নিশ্চিন্তেই যাওয়া যায়?

সেই জন্যেই তো বলছি , চলুন বিকেলেই যাই ।

ঠিক আছে চলো, বিকেলেই যাই। আমি আমাদের কেতাব আলীকে ডেকে নিই ।

আবার কেতাব আলী কেন?

: নইলে বরই নামাবে কে? গাছে না চড়লে কি বরই নামানো যায়!

কছিমন বিবি জোর দিয়ে বললো– আরে সেজন্যে তো ঐ কাবের শেখই আছে। সে ঐ ফল বাগানের ধারে গরুর ঘাস কাটতে যাবে আজ। কাবের শেখ বলেছে, আমরা বিকেলে যদি সেখানে যাই, তাহলে সে আমাদের বরই নামিয়ে দেবে ।

শবনম সাদিকা বাধা দিয়ে বললো– না না, সেটা ঠিক নয়। ছেলে মানুষ ছাড়া

কোন বয়সী মানুষকে গাছে তুলে দেয়া ঠিক নয়। তা ছাড়া পরীর মাকেও সাথে নিতে হবে। গাছে থেকে পড়ার সাথে সাথে বেছে বেছে টাটকা বরইগুলো কুড়িয়ে নিতে হবে তো।

কছিমন বিবি মনে মনে চমকে উঠলো। সাথে মানুষ থাকলে তো কাজ উদ্ধারে ঝামেলা হবে জরুর। তাই সে ব্যস্ত কণ্ঠে বললো আবার পরীর মা কেন? আমি তো সাথে থাকছিই। আমি কুড়িয়ে দেবো।

না-না, তা দিলে হবে না। আমি কোনগুলো পছন্দ করি পরীর মাই ঠিক ঠিক চিনে তা। দুই তিন দিন পরীর মা-ই কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে আমাকে দিয়েছে। যেগুলো আমার পছন্দ, একদম সেইগুলো।

তবুও কছিমন আপত্তি করলে শবনম সাদিকা নাখোশকণ্ঠে বললো– ঠিক আছে, আমি তাহলে যাবো না। আগামীকাল কেতাব আলী আর পরীর মা গিয়ে বরই নামিয়ে আনবে। তুমি তোমার কাজে যাও!

আবার মনে মনে চমকে উঠলো কচিমন। শিকার ফসকে যায় দেখে সে উতলা হয়ে উঠলো। চিন্তা করে দেখলো, ওরা সাথে গেলে যদি শবনম সাদিকা যায়, তাহলে মন্দের ভাল। শবনম সাদিকাকে আজই যথা সময়ে সেখানে পৌঁছে দিতে হবে। নইরে সকল আয়োজন ভেস্তে যাবে। কছিমন বিবি আরো ভাবলো, দীদার আলীর লোকেরা এসে শবনমকে যদি না পায়, গুলজাহান বানু বেগম তাহলে মাথাটা তার ঘাড় থেকে নামিয়েই দেবে। এত বড় আয়োজন পণ্ড হয়ে যাওয়াটা তিনি সহ্য করতে পারবেন না। অগত্যা সে শবনম সাদিকার প্রস্তাব সহাস্যে সমর্থন করে বললো– ঠিক আছে ছোট হুজুরাইন, ঠিক আছে। ওদের ডেকে নিন। ওদের সাথে নিয়েই যাই। বিকেল প্রায় হয়ে এলো। আর দেরী করা চলে না।

বলা বাহুল্য অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে কছিমন বিবি ওদের সাথে যথা সময়ে শবনম সাদিকাকে ফল বাগানে নিয়ে এলো এবং বরই নামানোর নাটক শুরু করতে না করতেই হৈ হৈ করে চলে এলো দীদার আলীর দুর্বৃত্তেরা। অতঃপর এই পরবর্তী ঘটনাগুলো ঘটলো।

সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে আছে নূরু মিয়া। যথা সময়ে ডাক্তার এসে বেঁধে দিয়েছেন ক্ষতস্থান। চিকিৎসা চলছে যথাযথ। চলছে শুশ্রূষা ও তদবীর। ডাক্তার আশ্বাস দিয়েছেন, জ্ঞান ফিরতে দেরী হলেও আশঙ্কার কোন কারণ নেই। জ্ঞান ফিরবে অল্প দিনেই আর ঘা শুকাতে মাসখানেক দেরী হলেও

বইঘর.কম

আস্তে আস্তে রুগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে।

জমিদার মোজাফফর আহমদ খান বাহাদুর সাহেব দুই দিন পরই ফিরে এলেন। সমস্ত ঘটনা শুনে ক্রোধে ফেটে পড়লেন তিনি। মাথায় তাঁর আগুন ধরে গেল। কাবের শেখ আর কছিমন বিবিকে তিনি তখনই পুলিশে সোপর্দ করলেন। তাঁর নয়া বিবিকেও পুলিশে দেয়ার ইচ্ছে হলো তার। কিন্তু তাতে তাঁর বংশ মর্যাদা মিসমার হয়ে যাবে ভেবে তা করতে তিনি পারলেন না। কিন্তু এত বড় সাংঘাতিক ঘটনা ঘটানোর পরে তাঁকে আর বাড়িতেও রাখলেন না। সঙ্গে সঙ্গে জরুরি খবর পাঠিয়ে বিবির বোনপুত তেজারত আলীকে এনে নিলেন। এনে নিয়ে তিনি তাকে বললেন তোমার খালাকে তুমি এই মুহূর্তে তোমাদের বাড়িতে নিয়ে যাও। না নিয়ে গেলে এই রকম নচ্ছার আর বিশ্বাসঘাতক মহিলার মুখ আমি আর একদণ্ডও দেখবো না। হয় পুঁতে ফেলবো, নয় লাঠি মেরে বাড়ি থেকে তাকে নর্দমায় ফেলে দেবো।

জমিদার সাহেব রাগে বাঘের মতো গর গর করতে লাগলেন। জমিদার সাহেব বাড়িতে আসা অবধি গুলজাহান বানু বেগম সমানে থর থর করে কাঁপছিলেন। কখন কোন বদহুকুম হয়ে যায় এই ভয়ে চরম আতংকের উপর ছিলেন তিনি। খান বাহাদুর সাহেবের কথায় তেজারত আলী ইতস্তত করতে লাগলে, তিনি তেজারত আলীর দুই হাত চেপে ধরে বললেন– আমাকে শিগগির তুমি তোমাদের বাড়িতে নিয়ে যাও বাবা। বদ হুকুমের পরিবর্তে আমাকে যে উনি তোমাদের ওখানে পাঠাতে চাচ্ছেন এ আমার চরম সৌভাগ্য। আমি তোমাদের সংসারে খেটে খাবো বাপজান, তবু এই মুহূর্তেই আমাকে তোমাদের ওখানে নিয়ে চলো। এ মানুষকে আমি চিনি। যেমনই শান্ত, রেগে গেলে তেমনই সাংঘাতিক। হুকুমের তার এক তিল নড়চড় হয় না।

তেজারত আলী ইতস্তত করে বললো– কিন্তু খালা, একবার চলে গেলে খান বাহাদুর সহেব যদি আর আপনাকে কখনোই গ্রহণ না করেন?

গুলজাহান বিবি বললেন– রাগ পড়ে গেলে লোক মারফত চেষ্টা করে দেখবো। তাতে কাজ না হলে, তোমাদের সংসারে আমি আজীবন খেটে খাবো। তবু আমাকে নিয়ে চলো শিগগির। আগে জানে তো বাঁচি।

খালার পীড়াপীড়িতে তেজারত আলী অগত্যা ঐ দিনই আর অতি সত্ত্বর তার খালাকে নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হলো।

কয়েকদিন পরে ম্যানেজার কোরবান আলী মিয়া জমিদার মোজাফফর আহমদ খান বাহাদুর সাহেবের কাছে এসে বললেন– হুজুর! একজন ভদ্রলোক আপনার সাথে দেখা করতে এসেছেন। খুব খানদানী আর পরহেজগার লোক বলে মনে হলো।

খান বাহাদুর সাহেব প্রশ্ন করলেন– কোথায় তিনি?

ম্যানেজার সাহেব বললেন– আমার সেরেস্তায় বসিয়ে রেখে এসেছি হুজুর।

: নাম কি তা বলেন নি?

বলেছেন হুজুর। নবীরউদ্দীন খান না কি যেন নাম।

সচকিত হয়ে খান বাহাদুর সাহেব বললেন– কি বললে?

নবীরউদ্দীন খান?

জি হুজুর। এ নামই তো বললেন। আপনার সাথে নাকি তাঁর খুব পরিচয় আছে। বললেন, আমার দোস্ত মানুষ।

লাফ দিয়ে উঠে খান বাহাদুর সাহেব বললেন– সে কি। চলোতো চলোতো, শিগগির চলো...।

ম্যানেজার সাহেবকে তাড়া দিয়ে নিয়ে খান বাহাদুর সাহেব ম্যানেজার সাহেবের দপ্তরে এলেন। দপ্তরে ঢুকেই খান বাহাদুর সাহেব উল্লাসে চিৎকার দিয়ে উঠলেন। বললেন– মাশাআল্লাহ! যা ভেবেছি তাই। নবীর উদ্দিন, দোস্ত তুমি!

ঠেকায় পড়ে মোজাফফর। বড় দায়ে পড়ে তোমার কাছে এসেছি।

সালাম বিনিময় অন্তর দুই দোস্ত কোলাকুলি করলেন। এরপর জমিদার খান বাহাদুর সাহেব বললেন বসো দোস্ত, বসো-বসো। আসন গ্রহণ করার পর

খান বাহাদুর সাহেব বললেন– তা নবীরউদ্দীন খান সাহেব, কি সে তোমার দায়, বলো তো দোস্ত, শুনি?

নবীরউদ্দীন খান সাহেব বললেন– দোস্ত, তুমি তো জানো মস্তবড় এক হিন্দুপ্রধান এলাকায় আমার বাড়ি। এই দেশ বিভাগের ফলে আমার সে বাড়িঘর জোত ভুঁই সব হিন্দুস্থানে পড়েছে।

খান বাহাদুর সাহেব বললেন– ও হ্যাঁ- হ্যাঁ, তাই তো। ও এলাকাটা তো পুরোটাই হিন্দুস্থানে পড়েছে।

কাজেই বুঝতে পারছো, ওখানে আর আমার থাকা সম্ভব নয়। আগেই ওদের দাপটে আমি অস্তির ছিলাম, এখন তো আর কথাই নেই। দিনে দুপুরে আমার সর্বস্ব ওরা কেড়ে নিতে আসবে।

নবীরউদ্দীন!

নামায-রোযা করা একনিষ্ঠ মুসলমান না হলে কতকটা সই তো। ওদের সাথে হাত মিলিয়ে পূজো পার্বনে নাচানাচি করলে বিশেষ অসুবিধে হতো না। বেকায়দায় পড়ে সংগতিহীন অনেককেই করতে হচ্ছে তা। বাস্তুত্যাগ করার মতো অর্থকড়ি আর জায়গা ঠাঁই না থাকলে কি আর করবে তারা।

তা তো বটেই, তা তো বটেই। তা তুমি?

আমাকে আল্লাহ তায়ালা কিছুটা সংগতি দিয়েছেন যখন, তখন আর আমি ওখানে পড়ে থাকি কেন? আমি বাস্তু ত্যাগ করবো।

আচ্ছা- আচ্ছা। তা কোথায়? কিভাবে?

: বিনিময় করে। আমার বাড়িঘর ভূ সম্পত্তি বিনিময় করে।

গুড। তা কোথায় বিনিময় করবে, স্থির করেছো?

তোমাদের খুব নিকটবর্তী এক এলাকায়। এখান থেকে মাইল বিশেক দূরে চন্দ্রপুর নামে এক বর্ধিষ্ণু গ্রাম আছে। গ্রাম মানে অনেকটা শহরের মতো জায়গা। ছোট খাটো অনেক সরকারী অফিসও আছে। ওদিকে আবার গ্রামের একধারে রেলপথ অন্য ধারে পাকা রাস্তা, মানে মটর পথ। যাতায়াতের খুবই–

খান বাহাদুর সাহেব কথার মধ্যেই বললেন– বলো বলো, আমি চিনি।

চিনো? বেশ বেশ। ঐ গ্রামে শ্রী ক্ষিতীশ চন্দ্র সাহা নামে এক বিত্তশালী লোক আছেন। পাকা বাড়িঘর আর প্রচুর জোত ভূঁই। ছোট খাটো জমিদারই নাকি

বইঘর.কম ও রোহন

বলা চলে। তাঁর সাথেই বিনিময় করতে এসেছি।

বেশতো বেশতো। ওকেও আমি চিনি। ভালভাবে চিনি।

সাব্বাশ। তাহলে তো সোনায় সোহাগা। সেই জন্যেই তোমার কাছে এসেছি দোস্ত। বাড়িঘর তার নিজের চোখেই দেখে এলাম। কিন্তু জমিজমার খবরটা সঠিক কিনা, এর মধ্যে কোন ভোগী জোগী আছে কিনা, তাতো জানিনে। আমার চেনা লোক কেউ সেখানে নেই। তাই তোমার কাছে এসেছি।

বেশ করেছো। আমি সব জানি। কোন ভোগী জোগী নেই। আসলেই উনি একজন মস্তবড় জোতদার। তোমার মতোইএকজন ছোটখাটো জমিদার। তোমার জোতভূইয়ের প্রায় সমপরিমাণ জোতভুঁই তার। বাড়িঘরও তাই। তা উনি কি বিনিময় করতে রাজী আছেন?

এক পায়ে খাড়া। আমার বাড়িঘর জোতভূঁই উনি নিজে গিয়ে দেখে শুনে এসেছেন। এখন আমি রাজী হলেই–

খান বাহাদুর সাহেব উৎসাহ দিয়ে বললেন– রাজী হয়ে যাও। কাল বিলম্ব না করে রাজী হয়ে যাও। আমার সাথে যথেষ্ট পরিচয় আছে ক্ষিতীশ বাবুর। কোন প্রবঞ্চনায় পড়বে না তুমি।

বহুত আচ্ছা- বহুত আচ্ছা। তুমি তাহলে আমার সাথে একটু চলো দোস্ত। ওখান থেকে একট গাড়ি ভাড়া করে এখানে এসেছি। তুমি তোমার গাড়িটা নিয়ে একটু চলো। আধা ঘণ্টার পথ। দলীলপত্র সব তৈয়ার করাই আছে। তোমার উপস্থিতিতেই চলো আমরা, মানে আমি আর ক্ষিতীশ বাবু স্বাক্ষর দেই দলীলে।

আমাকে যেতে বলছো তাহলে?

হ্যাঁ। তোমার পরিচিত লোক, পরিচিত জায়গা। তুমি যাবে না। তা কি হয়?

ঠিক আছে ঠিক আছে। তোমার কাজ হেতু আমাকে অবশ্যই যেতে হবে। তা কথা হলো, তোমার ভাড়ার গাড়ি ছেড়ে দাও। গাড়ি ছেড়ে দিয়ে আজ এখানে থাকো। খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম করো। আগামীকাল সকালে দুই জন এক সাথে যাবো।

ওরে বাপরে! তা কিছুতেই সম্ভব নয়।

কেন নয়?

ক্ষিতীশ বাবু আর একদণ্ডও দেরী করতে রাজী নয়। উনি আরো দুই তিন জনের সাথে কথা বলে রেখেছেন। আমি গড়িমসি করলে উনি এখনই গিয়ে অন্যজনের সাথে বিনিময় সম্পন্ন করে আসবেন। যত শিগ্গির সম্ভব এদেশ ত্যাগ করবেন উনি।

বলো কি?

বলার কি আছে। গরজটা তো আমারও। ইতিমধ্যেই এখানে ওখানে কিছ কিছু খুনা খুনি শুরু হয়ে গেছে। আল্লাহ না করুন, পুরো রায়োট যদি লেগে যায়, তাহলে কার কপালে কি আছে কে জানে। তাই, যত সত্বর সম্ভব নিরাপদ স্থানে সরে পড়া সবার জন্যেই বেহতর। সময় থাকতে সাবধান হওয়া ভাল।

ঠিক আছে। তাহলে এখানে বসেই একটু চা পানি খাও। আমি জলদি তৈয়ার হয়ে আসি।

ম্যানেজার সাহেবকে চা নাশ্‌তা খাওয়ানোর কথা বলে খান বাহাদুর সাহেব দ্রুতপদে অন্দর মহলে প্রবেশ করলেন।

তৈরী করা দলিল-পত্র। কথাবার্তাও আগে থেকেই পাকাপাকি। তাই বিলম্ব কিছু হলো না। খান বাহাদুর সহেবকে দেখে ক্ষিতীশ বাবুও নবীরউদ্দীন খান সাহেবের উপর আরো বেশী আস্থাশীল হলেন। সাব রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে আধা ঘণ্টার মধ্যেই বিনিময় কার্য সম্পন্ন হয়ে গেল।

ক্ষিতীশ বাবুর বিশেষ অনুরোধে ক্ষিতীশ বাবুর বৈঠক খানাতে বসেই খান বাহাদুর সাহেব ও নবীরউদ্দীন খান খাওয়া দাওয়া করলেন। খাওয়া দাওয়া মানে- লুচি তরকারী ও মিষ্টি মিঠাই খেলেন। খাওয়া দাওয়ার পর পান চিবুতে চিবুতে দুই দোস্ত তাঁদের ঘরোয়া আলোচনা শুরু করলেন। দুই চার কথার পরে খান বাহাদুর সাহেব বললেন তা দোস্ত, তোমার ছেলের খবর কি?

এ প্রশ্নে নবীরউদ্দীন খান সাহেব কিছুটা বিমর্ষ হয়ে গেলেন। উদাসকণ্ঠে বললেন– ছেলের খবর?

খান বাহাদুর সাহেব বললেন– হ্যাঁ, তোমার ছেলের খবর। তার লেখাপড়া তো নিশ্চয়ই অনেক আগে হয়ে গেছে। এখন ও করছে কি? ওর বিয়ে শাদি ইতিমধ্যেই দিয়ে ফেলেছো নাকি?

কেন দোস্ত, এ কথা বলছো কেন?

বলছি মানে, তোমার ছেলের পাঠ্যাবস্থায় তুমি বলেছিলে, বলেছিলে মানে

বইঘর.কম ও রোকন

জোর দিয়েই বলেছিলে, ছেলের লেখাপড়া শেষ হলে আর আমি রাজী থাকলে আমার মেয়ের সাথে তুমি তোমার ছেলের শাদি দেবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত যে নীরব আছো। একদম চুপচাপ। ঘটনা কি?

কি বলবো দোস্ত!

কি বলবে মানে? মেয়ের আমার বয়স হয়ে গেছে। উপযুক্ত ঘর বর না পেয়ে আজও বিয়ে শাদি দেইনি তার। তা ছাড়া তোমার কথার উপরও অনেকটা ভরসা ছিল আমার। কিন্তু তোমার ব্যাপার কি? ছেলের শাদি তাহলে দিয়ে ফেলেছো ইতিমধ্যেই? www.boighar.com

নবীরউদ্দীন খান সাহেব দুঃখিতকণ্ঠে বললেন– কার শাদি দেবো দোস্ত? জীবনেও শাদি করবো না বলে যে পণ করে বসে আছে তার শাদি দেবো কোথায় আর কার সাথে?

খান বাহাদুর সাহেব বললেন– কি রকম! জীবনেও শাদি করবে না মানে?

করবে না মানে করবে না। কোন ছোটকালে কাকে যেন ভালবেসে ছিল, সেই ভালবাসার মধ্যে আজও সে বিভোর হয়ে আছে। তার ঐ ভালবাসার মেয়ে ছাড়া আর কাউকে সে শাদি করবে না। তার একদম সাফ কথা।

: তাজ্জব!

: আরো তাজ্জব ব্যাপার দোস্ত, সেই মেয়েটাকে সে সেই ছোট কালেই হারিয়ে ফেলেছে। নামটা আবছা আবছা খেয়াল থাকলেও মেয়েটার পরিচয় সে কিছুই জানে না। কে তার পিতামাতা, কোথায় তার বাড়িঘর, কিছু তার জানা নেই। তবু সেই মেয়েকেই ছেলে আমার খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

: হ্যাঁ দোস্ত। ঐ পয়-পরিচয়হীন মেয়েটাকে সে আজও খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

দোস্ত।

সেই মেয়ের খোঁজে ছেলেও আমার নিরুদ্দেশ। দীর্ঘদিন থেকে ছেলের কোন খোঁজ-খবরই আর নেই। দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে আজ কয়েক বছর ধরে সে মেয়েটাকে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

সে কি। তার খোঁজ করছো না তুমি?

কোথায় খোঁজ করবো। কোন দিকে কোথায় গেছে, কোথায় আছে আন্দাজে কোথায় খুঁজবো, বলো। খুঁজে পাওয়ার অনেক চেষ্টা করেছি দোস্ত। হয়রান

বইঘর.কম ও রৌকন

হয়ে অবশেষে ছেড়ে দিয়েছি ওর আশা। ওকে সঁপে দিয়েছি আল্লাহর হাতে।

কি তাজ্জব- কি তাজ্জব!

এ নিয়ে আর কোন কথা হয়নি দু'জনের মধ্যে।

এক মাসের মধ্যে নূরু মিয়ার ক্ষতস্থান পূরণ হয়ে যাবে, ঘা শুকিয়ে যাবে আর সে সম্পূর্ণ সুস্থ সবল হয়ে উঠবে, এই ছিল ডাক্তারের আশ্বাস। কিন্তু এক মাস নয়, ক্ষতস্থান পূরণ হতে ঘা শুকাতে এবংনূরু মিয়া সম্পূর্ণ সুস্থ সবল হয়ে উঠতে দেড় মাসেরও অধিক সময় লাগলো। এর মধ্যে দেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয়ে গেল পুরোপুরিই। দেশ বিভাগের ঘোষণা হয়ে গেল। ইংরেজরা চলে গেল। পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল হয়ে বসলেন কায়েদে আজম মোহম্মদ আলী জিন্নাহ। হিন্দুস্থানের গভর্নর জেনারেল হয়ে বসলেন মাউন্ট ব্যাটেন। সুবিধা লাভের জন্যে হিন্দুরাই কায়দা করে সমগ্র ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল মাউন্ট ব্যাটেনকে বিভক্ত ভারতের, তথা হিন্দুস্থানের গভর্নর জেনারেল বানালো। দেশ বিভাগ হওয়ার পর থেকেই হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের মধ্যে চলতে লাগলো চরম রেষারেষি। ইতিমধ্যেই অনেক খুন খারাবী হয়ে গেল। কেউ বা বিনিময়ের মাধ্যমে আর কেউ বা চোরাপথে এক দেশ থেকে আর এক দেশে পাড়ি জমাতে লাগলো।

খান বাহাদুর সাহেবের দোস্ত নবীরউদ্দীন খান বাস্তু ত্যাগ করে এসে চন্দ্রপুরে স্থায়ীভাবে বসেছেন। তাঁর পূর্বের বাসস্থান হিন্দুস্থানে পড়ায়, সে বাসস্থান তাঁর জন্যে হারাম হয়ে গেল। নূরু মিয়ার মমতার নানী বাড়ি ইসলামপুর হিন্দুস্থানে পড়ায় সেই ইসলামপুরে যাতায়াতও হারাম হয়ে গেল নূরু মিয়া ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের জন্যে। হারিয়ে গেল মমতার নানীর বাড়ির চিহ্ন ও পরিচিতি।

সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠে বসেছে নূরু মিয়া। তার পাশে বসে রয়েছে শবনম সাদিকা। দুই চারটে অন্য কথা বলার পর নূরু মিয়া শবনম সাদিকাকে প্রশ্ন করলো– এমন তাজ্জব ব্যাপার কি ভাবে ঘটলো ম্যাডাম? আমার এই বাহুটা তো একদম শেষ হয়েই গিয়েছিল। বেঁচে উঠলেও এ বাহু আমার পঙ্গু হয়ে যাবে এই ছিল আমার ধারণা। কিন্তু এখন দেখছি আমার যে বাহু সেই বাহুই আছে, কোথাও কোন ক্ষতি হয়নি, কাটা ছেঁড়া দাগেরও তেমন কোন চিহ্ন নেই কোথাও। এটা কিভাবে সম্ভব হলো ম্যাডাম?

শবনম সাদিকা হাসিমুখে বললো– কি ভাবে সম্ভব হলো?

নূরু মিয়া বললো– জি ম্যাডাম, কিভাবে সম্ভব হলো? তার চেয়েও বড় কথা, আমার তো বাঁচার কোন কথাই ছিল না। আমি বেঁচে উঠলাম কিভাবে?

কিভাবে আবার? ডাক্তারের চিকিৎসায়। ডাক্তার তোমাকে ভাল করে তুলেছেন।

কি তাজ্জব! ডাক্তার আমাকে ভাল করে তুলেছেন? যদিও ভাল করে তোলার মালিক আল্লাহ তায়ালা, তবু ডাক্তারের চিকিৎসাতেই ভাল হয়ে উঠলাম আমি?

: তা নয়তো কি। ডাক্তারের চিকিৎসা ছাড়া ভাল হওয়ার আর কি আছে?

পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল পরীর মা। সে বললো– কি আছে মানে? এ কি বলছেন আম্মাজান? জান ছেড়ে দিয়ে যে দিন রাত এই হুজুরের সেবা শুশ্রূষা করলেন, তা কি কোন কাজে লাগেনি? দেড় মাস কাল ধরে যে আপনার নাওয়া খাওয়া, নিদ ঘুম চাঙ্গে উঠে গিয়েছিল, সে কথা কি ভুলে গেলেন?

শবনম সাদিকা চোখের ইশারায় পরীর মাকে থামিয়ে দিতে বললো পরীর মা!

না থেমে পরীর মা জোর দিয়ে বললো– যা সত্যি তা বলবো না কেন আম্মাজান? ডাক্তার এসে দুই দাগ ওষুধ ফেলে দিয়ে গেলেই কি রোগী ভাল হয়ে যায়? ডাক্তারের নির্দেশ মতো নিয়মিত ঔষুধ পথ্য খাওয়ানো, শেক দেয়া, ধোয়ামোছা, বাতাস দেয়া, মাথায় পট্রি দেয়া- এসব না করলে ডাক্তারের কি সাধ্য আছে রুগীকে বাঁচায় আর সুস্থ করে তোলে।

চমকিত হয়ে নূরু মিয়া বললো– সে কি পরীর মা। এই ম্যাডাম এই সব করেছেন?

পরীর মা বললো– এই ম্যাডাম নয়তো আর কে করবে এসব? আপনার শুশ্রূষার এই ম্যাডামের মতো এমন জান ছেড়ে দেবে কে?

পরীর মা!

: আত্মার টানে না হলে সেরেফ ঝি চাকরানীর দ্বারা কি এসব হয় হুজুর? তারা তো শুধু হুকুম পালন করবে। কোন মতে দায় উদ্ধার করে যাবে। অন্তরের টান ছাড়া কেউ কি কারো সেবায় দিন রাত এই অমানুষিক পরিশ্রম করতে পারে?

নূরু মিয়া শবনম সাদিকাকে বিস্মিতকণ্ঠে বললো– সে কি ম্যাডাম! এ কি বলছে পরীর মা। আপনি আমার খেদমত করেছেন দিন রাত?

মুখটিপে হেসে শবনম সাদিকা বললো– পরীর মায়ের কথা ছেড়ে দাও। ওর কথা ঠিক নয়। ও মিথ্যা করে বলছে।

: না ম্যাডাম, এ কথা আমি মেনে নিতে পারিনে। পরীর মা মিথ্যা বলার মেয়ে নয়। ও যা বলছে তা সম্পূর্ণ ঠিক।

: কি সম্পূর্ণ ঠিক?

আপনি নাওয়া খাওয়া নিদ ঘুম ছেড়ে, দিনরাত আমার সেবা শুশ্রূষা করেছেন।

শবনম সাদিকা এবার কপট রোষে বললো– করেছি তো কি হয়েছে।

কেন এতটা করতে গেলেন ম্যাডাম? আপনার এতটা দায় পড়লো কেন?

কেন?

জি। এত কষ্ট না করলেও তো পারতেন।

শবনম সাদিকা এবার শক্তকণ্ঠে বললো– বটে! ঐ গুণ্ডারা আমাকে ধরে নিয়ে গেলে যে দুর্গতি হতো আমার, তার চেয়ে কি তোমার শুশ্রূষা করাটা আমার পক্ষে বেশি কষ্টের?

: ম্যাডাম!

: আমাকে বাঁচাতে গিয়ে জান দিতে বসলে তুমি, মরণশয্যায় পড়ে রইলে আর তোমার এই শুশ্রূষাটুকু করবো না আমি? কৃতজ্ঞতা বোধ বলে কি আমার কিছুই নেই?

তা অবশ্য আছে। কিন্তু আমি বুঝতে পারছিনে, ঐ গুণ্ডাদের হাতে আপনি পড়লেন কি করে?

শবনম সাদিকা দুঃখিতকণ্ঠে বললো– সবই আমার নসীবের দোষ নূরু মিয়া। আমার নসীব লিখন।

নূরু মিয়া বললো– নসীব লিখন। সে আবার কি? বিনা দোষে আল্লাহ তায়ালা নসীবে আপনার এমন লেখা লিখলেন?

তা জানিনে। তবে জানি, আমি একটা ষড়যন্ত্রের শিকার।

ষড়যন্ত্র।

মস্তবড় ষড়যন্ত্র। জঘন্য ষড়যন্ত্র।

: তাজ্জব! কে করলো এই ষড়যন্ত্র?

আমার বিমাতা গুলজাহান বানু বেগম সাহেবা।

: বলেন কি? তিনি এটা করতে গেলেন কেন?

: তার আঁতে ঘা লেগেছে যে। স্বার্থে ঘা লেগেছে।

: স্বার্থ।

বিরাট স্বার্থ। তুমি তো কিছুটা বুঝেছিলে, তাঁর বোনপুত তেজারত আলীর সাথে আমার শাদি দিয়ে আব্বার এই জমিদারীটা হাত করার জব্বোর আকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁর?

: হ্যাঁ, তা কিছু কিছু বুঝেছিলাম।

সেই আশা আকাঙ্ক্ষা তার নস্যাৎ হয়ে যাওয়ার পর থেকেই ক্রোধে সাপিনীর মতো ফুঁস ছিলেন তিনি।

সে কি! তা, তার সেই আশা-আকাঙ্ক্ষা নস্যাৎ হয়ে গেল কি করে?

আমার জন্যে। আমি যে তাঁকে সাফ সাফ জানিয়ে দিয়েছিলাম, আমার জান গেলেও তার বোনপুত ঐ অপদার্থ তেজারত আলীকে শাদি করবো না আমি। এরপরও আমার বিমাতা আর বিমাতার প্ররোচনায় আমার আব্বাও অনেক চেষ্টা করেছিলেন, আমার এ মত পরিহার করানোর জন্যে। তবু যখন কিছুতেই আমি তা করলাম না, অর্থাৎ আমার বিমাতার সে আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবার কোনই আশা রইলো না, তখন আমাকে খতম করে দেয়ার দৃঢ় সংকল্প নিলেন তিনি। তাঁর ধারণা হয়েছিল তোমাকেই শাদি করবো আমি, আর সে জন্যে তাঁর আগুন আরো দশগুণ বেড়ে গিয়েছিল।

: বলেন কি। এমন ধারণাও হয়েছিল তাঁর?

হয়েছিল মানে কি? উচ্চ ধারণা হয়েছিল তাঁর। কাজেই আমাকে শেষ করে ফেলা ছাড়া তাঁর গায়ের আগুন নেভানোর আর কোন পথ খুঁজে পাননি তিনি।

আশ্চর্য! তাহলে কিভাবে তিনি তা করতে চেয়েছিলেন?

তাঁর ব্যথার সমব্যথী ষষ্ঠিতলার জমিদার দীদার আলী শাহর সাথে হাত মিলিয়ে। আমার বিমাতার মতো ষষ্ঠিতলার জমিদারও চেয়েছিলো তার ছেলে বাহাদুর, তথা বাদুর আলীর সাথে আমার শাদি দিয়ে আব্বার এই জমিদারীটা হাত করতে।

: হ্যাঁ, সে খবরও কিছু কিছু জানতাম।

সোজা পথে কাজ না হওয়ায় দীদার আলী শাহ বাঁকা পথ ধরলো। অর্থাৎ

বাদুর আলীর সাথে গুণ্ডা বাহিনী পাঠিয়ে আমাকে তুলে নিয়ে যেতে চাইলো। কিন্তু তোমার লাঠির ঘায়ে তার সে আশা মিথ্যা হয়ে গেল আর তার ছেলে বাদুর আলী চির জীবনের মতো পঙ্গু হয়ে গেল। এতে করে দীদার আলী শাহও সেই থেকে এর প্রতিশোধ নেয়ার পথ খুঁজে বেড়াচ্ছিল; আর পথ না পেয়ে গুমরে গুমরে মরছিল।

: তারপর?

এই অবস্থায় আমার বিমাতা তার সাথে হাত মিলালে তার সেই পুরানো আগুন নতুন করে জ্বলে উঠলো আর প্রতিশোধ নিতে সে এক পায়ে উঠে দাঁড়ালো।

: আপনার বিমাতা হাত মিলালেন? তা কিভাবে হাত মিলালেন?

তাঁর তাঁবেদার কাবের শেখের মাধ্যমে যোগাযোগ করে আমাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্যে লোক আনিয়ে নিলেন।

কি তাজ্জব- কি তাজ্জব! দীদার আলী শাহ আবার লোক পাঠানোর সাহস করলো?

করলো। পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে সাহস হলো তার। আমার আব্বা কয়েকদিনের জন্যে আমার ফুফুর বাড়িতে গেলেন। তুমিও নিরুদ্দেশ হয়ে রইলে। এই ফাঁকা ফিল্ডের খবর আমার বিমাতা তাদের জানালো। ফাঁকা ফিল্ড দেখে দীদার আলীও সাহস পেয়ে গেল।

কিন্তু আমরা বাড়িতে না থাকি, ম্যানেজার সাহেব বাড়িতে ছিলেন। পাইক পেয়াদা, দ্বার প্রহরী, চাকর নফর হাজারটা লোক থাকতে বাড়ি থেকে আপনাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার সাহস করলো তারা?

বাড়ি থেকে তো নয়। আমার বিমাতা কায়দা করে আমাকে বাড়ির বাইরে ফল বাগানের জঙ্গলে পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করবেন বলে দিনক্ষণ ঠিক করে দুশমনদের ঐ জঙ্গলে আসার কথা বলেছিলেন।

: আর আপনিও ঐ জঙ্গলে গেলেন আপনার বিমাতার কথায়।

বিমাতার কথায় তো নয়, আমি গেলাম বিমাতার বাঁদী কছিমন বিবির প্ররোচনায়।

: কি রকম- কি রকম?

কছিমন বিবি এসে আমাকে উৎসাহ দিয়ে জানালো, ঐ ফল বাগানে বরই

বইঘর.কম ও রোকন
গাছের মিষ্টি বরই পেকে টসটসে হয়ে আছে। গাছ থেকে নামিয়ে টাটকা টাটকা খাওয়ার স্বাদই আলাদা। আমি আপত্তি করলে কছিমন বললো, আপনার আব্বা বাড়িতে নেই। কাজেই বাধা দেয়ার কেউ নেই। এই সুযোগে যদি বাড়ির এই খাঁচা থেকে বেরিয়ে বাইরের একটু খোলা বাতাসে না যান, তাহলে আর যাবেন কবে? আর তা ছাড়া একে ওকে দিয়ে মাটিতে পড়ে থাকা বরই কুড়িয়ে এনে খান। গাছ থেকে টাটকা টাটকা নামিয়ে টাটকা টাটকা খেলে দেখবেন সে স্বাদের তুলনা নেই।

আচ্ছা!

বরই আমার সত্যি খুবই প্রিয় ফল। তাই লোভ সামলাতে না পেরে কেতাব আলী আর পরীর মাকে সাথে নিয়ে ঐ বরই তলায় গেলাম আর সাথে সাথে দুশমনের হাতে পড়লাম। পরীর মা আর কেতাব আলী কি আমাকে এতগুলো হিংস্র দুশমনের হাত থেকে বাঁচাতে পারে?

নূরু মিয়া এবার উদাস হয়ে উঠলো। উদাসকণ্ঠে বললো– বরই খেতে গেলেন আর দুশমনের কবলে পড়লেন?

শবনম সাদিকা বললো– ঠিক তাই।

নূরু মিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেললো আলক্ষ্যে। অনুচ্চকণ্ঠে আপন মনে বললো– কি আশ্চর্য মিল। ঐ বরই খেতে গিয়েই আমার মমতাও বাঘের কবলে পড়েছিল।

একথা কানে পড়তেই চমকে উঠলো শবনম সাদিকা। ব্যস্তকণ্ঠে বললো– মমতা মানে? কে মমতা?

হুঁশে এসে নূরু মিয়া বললো– এ্যাঁ! ও মমতা আমার এক সহপাঠিনী। বাল্যকালের পাঠশালার সহপাঠিনী।

পাঠশালার সহপাঠিনী। কোন পাঠশালার?

ইসলামপুর পাঠশালার। অনেক দূরে সে জায়গা। ইসলামপুর এখন হিন্দুস্থানে পড়েছে।

অত্যন্ত অস্থিরকণ্ঠে শবনম সাদিকা বললো– সে কি! সে কি! ইসলামপুরে সে মমতা কোথায় থাকতো?

নুরু মিয়া বললো– তার নানীর বাড়িতে।

আবেগে কাঁপতে লাগলো শবনম সাদিকা। কাঁপতে কাঁপতে বললো– তাকে

বাঘে ধরেছিল?

হ্যাঁ, বাঘে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল।

বরই গাছতলা থেকে?

: হ্যাঁ, বরই গাছতলা থেকে।

বিপুল বিস্ময়ের সাথে শবনম সাদিকা বললো– তার মানে, তার মানে! আমার নামই তো মমতা। বাল্যকালে আমিই তো সেই ইসলামপুর পাঠশালায় পড়তাম আর নানীর বাড়িতে থাকতাম। তখন আমার নাম ছিল শমশাদ মমতা।

www.boighar.com

এবার ভীষণ চমকে উঠলো নূরু মিয়াও। বললো– এ্যাঁ! সে কি, সে কি!

বলেই চললো শবনম সাদিকা– আমি আমার নানীজানের বাড়িতে থাকতাম। সেখান থেকে পাঠশালায় যেতাম। আমার সহপাঠী আর সহপাঠিনীদের সাথে আমিই বরই খেতে জঙ্গলে গিয়েছিলাম। বরই খেতে গিয়েই ওখানে আমাকে বাঘে ধরেছিল। বাঘে আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। সাথীরা সবাই পালিয়ে গেল। গেল না শুধু আমার প্রিয় সহপাঠী আমিন। আমিন আমাকে বাঘের মুখ থেকে উদ্ধার করে এনেছিল।

বিপুল উল্লাসে লাফিয়ে উঠলো নূরু মিয়া। চিৎকার করে বললো– আমিই সেই আমিন। আমারই নাম নূরুদ্দীন আমিন।

একই রকম বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে শবনম সাদিকা বললো– এ্যাঁ! তুমিই সেই আমিন? নূরুদ্দীন আমিন?

: হ্যাঁ, আমিই সে আমিন।

তুমি এখানে জায়গীর বাড়িতে থাকতে?

হ্যাঁ, আমার পাতানো চাচা আবদুল মজিদ সাহেবের বাড়িতে থাকতাম।

এ্যাঁ, ওখানেই তোমার একবার জ্বর হয়েছিল?

হ্যাঁ, তুমি মানে মমতা আমাকে ওখানে দেখতে গিয়েছিল।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমিই তোমাকে দেখতে গিয়েছিলাম। মাজেদা খাতুন আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

পাশের বাড়িতে মাজেদা খাতুনের বন্ধু শমশের আলী থাকতো। মাজেদা আর শমশের আলী পাশাপাশি বসতো।

আমিও আমিনের কোল ঘেঁষে বসতাম। আমিন মাঝে মাঝে আমার নানীর বাড়িতে যেতো, আমিও মাঝে মাঝেই আমিনের জায়গীর বাড়িতে যেতাম।

বাঘে ধরার পর থেকেই মমতাকে আমি তার নানীর বাড়ি থেকে সাথে করে পাঠশালায় নিয়ে যেতাম।

আমি আমিনকে ছাড়া একা একা এক পাও এগুতাম না বা আমিনের কাছে ছাড়া বসতাম না। একটু ভয় পেলেই আমিনকে আঁকড়ে ধরে থাকতাম। আমিনকে আমার নানীজানের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রাখার জন্যে কত কাঁদাকাটি করলাম, তবু নানীজান তাতে রাজী হলেন না।

সজোরে নিঃশ্বাস টেনে নূরুদ্দীন আমিন বললো– সর্বনাশা তবু আপনি, মানে তুমি, তোমার সেই আমিনকে ভুলে গেলে কি করে?

শমশাদ মমতা বললো– অনেক কষ্টে। গ্রীষ্মের ছুটিতে আমিন তার নিজের বাড়িতে চলে গেল। তখনই আমার নানীজান ইন্তেকাল করায় আমার আব্বা গিয়ে আমাকে নানীজানের বাড়ি থেকে এখানে নিয়ে এলেন। কত কান্নাই যে কাঁদলাম কিছুদিন। তার পর হাল ছেড়ে দিলাম আর দিনে দিনে ভুলে গেলাম আমার প্রিয় আমিনকে। সেই থেকে আর কোনদিনই যে তার দেখা পাইনি।

আচ্ছা!

কিন্তু তুমি? তুমি আমাকে ভুলে গেলে কি করে? এত গভীর ভালবাসা!

আমিন তথা নূরু মিয়া বললো– ভুলে তো যাইনি। দিনে দিনে তোমার নাম পরিচয় ভুলে গেলাম ঠিকই, কিন্তু তোমাকে আর তোমার ভালবাসা তো ভুলে যাইনি।

যাওনি?

না। আজীবন তোমার স্মৃতি আর তোমার ভালবাসা আমি বুকের মধ্যে আগলে রেখেছি। নাম ঠিকানা ভুলে যাওয়ার জন্যে তোমাকে আমি নানা স্থানে খুঁজে বেরিয়েছি সেই থেকে। আন্দাজের উপর খুঁজেছি। খুঁজতে খুঁজতে শেষে এই তোমাদের এখানে এসছি।

: আমিন!

একা একা থাকলেই তোমার কথা মনে পড়েছে আমার আর তোমার উদ্দেশে বার বার গান গেয়েছি করুণকণ্ঠে।

গান গেয়েছো?

বইঘর.কম ও রোকন

হ্যাঁ গেয়েছি। বার বার গেয়েছি সেই গান–

'(আমি) ভুলে গেছি তব পরিচয়,

তবু তোমারে তো আজও ভুলি নাই।

আজও জেগে আছে ভালবাসা–

অতীতের পানে যবে চাই–

তবু তোমারে তো আজও ভুলি নাই...'

লাফিয়ে ওঠে শবনম সাদিকা বললো– সে কি! আমারই উদ্দেশে তুমি ঐ গান গাইতে আমিন?

নূরুদ্দীন বললো– না না, আর আমিন নয়, নূরুদ্দীন খান।

: নূরুদ্দীন খান?

হ্যাঁ, আমার নাম নূরুদ্দীন খান। আর নূরু মিয়াও নয়, আমিনও নয়; নূরুদ্দীন খান।

এখন থেকে তাহলে নূরুদ্দীন খান?

হ্যাঁ মমতা, মানে শমশাদ মমতা।

না না, আমিও আর শমশাদ মমতা নই। আমি এখন শবনম সাদিকা।

শবনম!

নূরুদ্দীন!

শবনম সাদিকা আনন্দে নূরুদ্দীনকে জড়িয়ে ধরতে গেল। নূরুদ্দীন চমকে উঠে বললো– আরে আরে, করো কি– করো কি! আমরা এখনো বেগানা। আমাদের তো শাদি হয়নি। শাদির আগে কেউ কাউকে স্পর্শ করা ঠিক নয়।

কিন্তু তুমি তো আমাকে বহুবার স্পর্শ করেছো নূরুদ্দীন! বাল্যকালের কথা বলছিনে, দুই হাতে ধরে চ্যাংদোলা করে তুলেছো!

সেটা বিপদ-মুসিবতের ব্যাপার। বিপদ মুসিবতে প্রয়োজনের তাকিদে একজন আর একজনকে ধরলে দোষ নেই। কিন্তু ভালবাসার আবেগে কেউ কাউকে জড়িয়ে ধরা গুনাহ।

পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল পরীর মা। মুখ চেপে ধরে এতক্ষণ সে হাসির বেগ থামাচ্ছিল। আর থামাতে না পেরে সে সশব্দে হেসে উঠলো। চমকে উঠলো শবনম ও নূরুদ্দীন। শবনম সাদিকা বললো– সে কি পরীর মা! তুমি এখনো

বইঘর.কম ও রোকন

দাঁড়িয়ে আছো? মানে, দাঁড়িয়ে থেকে হাসছো?

পরীর মা বললো– কি করবো আম্মাজান! এমন আনন্দের কথা শুনে আর এমন মধুর দৃশ্য দেখে হাসি আমি থামাই কি করে!

শবনম সাদিকা হাসি মুখে বললো– বটে! হোয়েছে হোয়েছে। আর হেসে কাজ নেই। এবার যাও, আমাদের দু'জনের জন্যে দুই গ্লাস শরবত করে আনো দেখি!

পরীর মা বললো– আনছি আম্মাজান, এখনই আনছি।

হাসি চাপতে চাপতে বেরিয়ে গেল পরীর মা। শবনম সাদিকা ও নূরুদ্দীন খান ক্ষণকাল নীরব হয়ে রইলো। এরপর শবনম সাদিকা বললো– আচ্ছা! এবার বলো তো দেখি, কিশোর বয়সে তুমি আমাকে না কাকে দেখতে গিয়ে দুই দুইবার শক্ত মার খেয়েছিলে, সে ঘটনাটা বলো তো শুনি?

নূরুদ্দীন বললো– হ্যাঁ, ঐ কিশোর বয়সে তখন আমি হাই স্কুলে পড়ি। সবেমাত্র ক্লাস নাইন থেকে ক্লাস টেনে উঠেছি। ঐ সময়ে ঐ ঘটনা।

শবনম সাদিকা বললো– ঐ ঘটনা মানে?

ঐ মার খাওয়ার ঘটনা।

ও হ্যাঁ, হ্যাঁ। তা কিভাবে সে ঘটনা ঘটেছিল? বিস্তারিত বলো তো!

নূরুদ্দীন বললো– ঘটেছিল ফুটবল খেলতে গিয়ে। ঐ বয়সেই ফুটবল খেলায় আমি পারদর্শী হয়ে উঠি সেন্টার-ফরোয়ার্ড খেলোয়াড় হিসেবে। আমার সে পারদর্শিতার তারিফ শুধু আমার স্কুলেই নয়, স্কুলের চারপাশে ছড়িয়ে গিয়েছিল। এ কারণে আমার এক স্কুল ফ্রেন্ড আমাকে চেপে ধরলো তার এলাকায় ফুটবল খেলতে যাওয়ার জন্যে। সেখানে ফুটবল কমপিটিশান হচ্ছিল। দামী পুরস্কারের খেলা। অর্থাৎ এই কমপিটিশানে যে দল জিতবে সে দল কয়েক ভরি ওজনের সোনার মেডেল পাবে। তাই এই কমপিটিশানে খেলার জন্যে আমার সেই স্কুল ফ্রেন্ড নাছোড়পিণ্ডে হয়ে আমাকে নিয়ে গেল তার ফুটবল টিমের হয়ে খেলার জন্যে। www.boighar.com

কোথায় নিয়ে গেল। সেই ফ্রেন্ডের গাঁয়ে?

না, আমার সেই ফ্রেন্ডের গাঁয়েও নয়, তার বাড়িতেও নয়। নিয়ে গেল তোমাদের এই বাড়ির একদম পাশেই এক গাঁয়ে। খেলাটা সেখানেই হচ্ছিল আর আমার সেই ফ্রেন্ডের টিম সেখানে খেলতে এসে এক বাড়িতে আস্তানা

বইঘর.কম ও রোকন

গেড়েছিল।

সে কি! আমাদের এই বাড়ির পাশের এক গাঁয়ে?

হ্যাঁ, একদম পাশেই।

কোন গাঁয়ে?

এখন সে গাঁয়ের নাম আর ঠিক মনে নেই। চিনতেও আর পারবো না। শুনেছিলাম, পাশেই এক জমিদার বাড়ি আছে। এখন এখানে এসে বুঝতে পেরেছি, তোমাদের এই বাড়িই সেই জমিদার বাড়ি।

আচ্ছা! তারপর?

সাত সাতটা ফুটবল টিমের মধ্যে প্রতিযোগিতা। আমার সেই ফ্রেন্ডের টিম পর পর পাঁচটা খেলাতেই জিতেছিল। আর দুটো খেলা বাকি। এই দুটো টিমকে হারাতে পারলেই ঐ সোনার মেডেল তাদের।

আর দুটো মাত্র খেলা বাকি ছিল?

হ্যাঁ, বলতে পারো সেমিফাইনাল আর ফাইনাল খেলা। সেই সেমিফাইনাল খেলতেই নিয়ে গেল আমাকে। এই দুটো খেলা জেতা তাদের চাই-ই।

তারপর?

জমজমাট খেলা। সেই সেমিফাইনাল খেলা দেখতেই ছোট বড় প্রচুর দর্শক এলো। শুরু হলো খেলা আর সে খেলাতেও আমরা জিতে গেলাম। খেলা শেষে আমরা আয়োজকদের কাছে চলে এলাম আর দর্শকেরা উঠে তাদের নিজ নিজ পথ ধরলো। দর্শকদের দিকে তাকাতেই আমি যা দেখলাম, তাতে ঘুরে গেল আমার মাথা।

: কি দেখলে?

মমতার নামটা আমার তখনও আবছা আবছা মনে ছিল। দেখলাম, দর্শকদের মধ্যে সেই মমতাও উঠে বাড়ির পথ ধরলো। দেখেই আমি 'মমতা-মমতা' বলে ছুটে গেলাম মমতার কাছে। মমতা অন্যদিকে মুখ করে হাঁটছিল। আমার ডাকটা সে শুনতে পায়নি দেখে আমি তাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরতে গেলাম। দুই হাত তার দিকে বাড়াতেই শুরু হলো কিল ঘুষি। কয়েকজন লোক সমানে কিল-ঘুষি মেরে আমাকে সরিয়ে দিল মমতার পেছন থেকে। মমতা কিছু বুঝতেই পারলো না।

সে কি! মমতা কোত্থেকে এলো?

কোত্থেকে মানে? ওখানেই দেখলাম।

: বটে! তারপর?

পরের দিন আবার শুরু হলো খেলা। ফাইনাল, মানে শেষ খেলা। মার মার কাট কাট খেলা। সেই ফাইনাল খেলায় আবার মাঠে নামলাম আমি। আমার পারদর্শিতার জন্যেই হোক, আর যে জন্যেই হোক, এই শেষ খেলাতেও জিতে গেল আমার স্কুল ফ্রেন্ডের টিম। আনন্দে আত্মহারা হয়ে টিমের খেলোয়াড়েরা এদিক ওদিক ছুটোছুটি করতে লাগলো।

: আচ্ছা! তারপর?

আমি মাঠ থেকে উঠে আসতেই দেখি আবার সেই মমতা। অদূরে বসে আছে সে। হয়তো পুরস্কার দেয়া দেখার জন্যেই সে বসে আছে। দিকবিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম আমি। আবার হারিয়ে যেতে পারে ভেবে ছুটে গিয়ে একেবারে পড়মড় করে জড়িয়ে ধরলাম মমতাকে। সঙ্গে সঙ্গে মমতা চিৎকার দিয়ে উঠলো। চমকে উঠে গিয়ে চেয়ে দেখি, সে মমতা নয়, মমতার মতো দেখতে অন্য মেয়ে। কিন্তু আমি সরে যাওয়ার অবকাশ পেলাম না। আট দশজন লোক এসে ধরে ফেললো আমাকে।

: তারপর?

তারপর মোটা কাপড় দিয়ে আমার দুই চোখ বেঁধে কোথায় আর কার কাছে যেন আমাকে নিয়ে গেল। শুরু হলো মার। কে যেন বেতের পর বেত মেরে আমার সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত করে ফেললো।

এবার শবনম সাদিকা বেদনাসিক্তকণ্ঠে বললো– আহ! সে কি! তোমার সেই ফুটবল টিমের লোকেরা কেউ তোমার সাহায্যে এলো না?

নূরুদ্দীন বললো– কে আসবে? পুরস্কার পাওয়ার আনন্দেই তারা নেচে বেড়াচ্ছে তখন।

সে কি!

আমি আর তাদের অপেক্ষায় না থেকে ঐ রক্তাক্ত শরীর নিয়ে ওখান থেকেই সোজা চলে এলাম আমার স্কুলে।

: আর ওদিকে যাওনি?

: না।

: তাহলে যে আমার এখানে একটা চোখ বাঁধা ছেলেকে মারা হলো, সে কে?

সে তাহলে অন্য কোন ছেলে আর অন্য অপরাধে মার খেয়েছিল। সে ছেলে আমি নই।

ও, আচ্ছা! তারপর?

ঐ মার খাওয়ার পরই আমার মধ্যে শুরু হলো– প্রতিক্রিয়া। কেন আমি নীরবে মার খেলাম, কেন তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালাম না– এই মর্মপীড়ায় আমি দগ্ধ হতে লাগলাম।

নূরুদ্দীন!

অতঃপর হাতে তুলে নিলাম লাঠি। আমার উপর বা কোন অসহায়ের উপর হামলা হলে আমি আর ছেড়ে দেবো না হামলাকারীদের– এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে ফিরে এলাম শিক্ষাঙ্গণে। প্রথম দিকে লাঠিটা তেমন কাজে না লাগলেও, কাজে লাগলো বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে এসে। বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে দেখি, দলাদলি আর মারামারি সেখানে লেগেই আছে চব্বিশ ঘণ্টা। এবার গর্জে উঠলাম লাঠি হাতে। যে দল ন্যায় পথে আছে সেই দলের পক্ষ নিয়ে অন্যায়কারীদের লাঠি পেটা করতে লাগলাম। দুই দশজনকে লাঠি পেটা করতে করতে লাঠিপেটা করায় আমি পারদর্শী হয়ে গেলাম এবং অবশেষে গোটা দলটাকেই লাঠিপেটা করতে সক্ষম হলাম। আমাকে রুখার আর কারো সাধ্য রইলো না।

সাব্বাশ! তা বিশ্ববিদ্যালয় জীবনটা তাহলে লাঠি চালিয়েই, মানে পড়াশোনা করার পাশাপাশি লাঠি হাঁকিয়েই কাটালে?

শুধু বিশ্ববিদ্যালয় জীবন কেন? এমএ পাশ করে বাড়িতে আসার পরও চলতেই লাগলো লাঠি আমার।

কেমন– কেমন?

আমার আব্বা একজন মস্তবড় জোতদার। অনেক তাঁর জোতজমি। সেই জোতজমি রক্ষার্থে একদল বাধা লাঠিয়াল রাখতেই হতো তাকে। নইলে দূর দুরান্তের প্রান্তিক জমি সুযোগ পেলেই দুর্বৃত্তরা দখল করে নেয়। নজরের বাইরে জমির পাকা ফসল সন্ত্রাসীরা দিনে দুপুরেই কেটে নেয়। কাজেই ঐসব জমির জবর-দখল মোকাবেলা করা আর পাকা ফসল কেটে নেয়া ঠেকাতে সব সময়ই একদল মাইনে করা লাঠিয়াল থাকতো আব্বার। বাড়িতে গিয়ে দেখলাম, আব্বার সেই মাইনে করা লাঠিয়ালরা দুশমন সংখ্যা আট দশজনের অধিক হলেই আর তাদের রুখতে পারছে না। ভর্তি হলাম আব্বার সেই

বইঘর.কম ও রোকন
লাঠিয়াল দলে। চলতে লাগলো লাঠি আমার। তাদের সাথে দশ-পনের জনকে লাঠি পেটা করে তাড়াতে তাড়াতে শেষ অবধি আল্লাহর রহমে একাই আমি শতাধিক লোককেও লাঠিপেটা করে তাড়াতে সক্ষম আর অভ্যস্ত হয়ে গেলাম। ফলাফল মনোরম। এটা দেখে দুই তিনশ' লোকও আর আমার বিরুদ্ধে আসার সাহস করতো না। লাঠি হাতে আমাকে দেখলেই তারা সরে পড়তো সুড় সুড় করে।

www.boighar.com

তন্ময় হয়ে শুনে শবনম সাদিকা বললো– এবার বুঝলাম কেন তোমার লাঠির এত জোর। এবার তাহলে এটাও বলো তো শুনি, গাড়ি চালানোর এমন দক্ষ ড্রাইভার আর গাড়ি মেরামতের এত বড় মেকানিক্স হলে কি করে?

উচ্চ শিক্ষার জন্যে বিদেশে গিয়ে। সেখানে গিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করার পাশাপাশি গাড়ি চালানো আর গাড়ির যন্ত্রপাতি চিনে মেকানিক্সের বিদ্যাটাও রপ্ত করে ফেলেছি।

ওরে বাপরে! কি সাংঘাতিক লোক তুমি! ক্ষণজন্মা পুরুষ। শুধু করিৎকর্মাই নও, একজন অসাধারণ করিৎকর্মা মানুষ তুমি।

: তাই?

তাই মানে? তোমার তুলনা শুধু তুমিই আর দ্বিতীয় কেউ নেই। জন্মেছে বলে মনে হয় না।

নূরুদ্দীন মৃদু হাত তালি দিয়ে বললো– মারহাবা- মারহাবা!

শবনম সাদিকা বললো– থাক, আর ঠাট্টা করতে হবে না। এবার আর একটা কথা বলোতো? তোমার তো কিছুই মনে ছিল না। বাল্যকালের ইসলামপুর পাঠশালা আর সেই মমতাদের কথা আজ তোমার এত বিস্তারিত মনে এলো কি করে?

কেতাব আলীর মুখে হয়তো শুনেছো ঘটনাটা। জনা তিনেক লোক খামার বাড়িতে পানি খেতে এসে আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল সেই ভুলে যাওয়া অতীত। আমি এই যে কয়েকদিন নিরুদ্দেশ ছিলাম, তা ঐ অতীত স্মরণ হওয়ার জন্যে। ঐ অতীত স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে আমি ছুটে গিয়েছিলাম সেই ইসলামপুরে। সেখানে যাওয়ার পরই একে একে সব কথা স্মরণ হয়ে গেল আমার। সে অতীত এখন দিন বরাবর স্পষ্ট হয়ে গেছে।

আর একটা কথা। যখন বুঝলে, আমি ঠিক তোমার সেই মমতা নই, তবু তুমি আমাদের এখানে ঐ একটা নগণ্য জীবন নিয়ে পড়ে রইলে কি কারণে?

আশায় রইলাম। কোথাও সে রকম মুখ আর দেখলাম হেতু, তোমার মুখ দেখে আশা নিয়ে পড়ে রইলাম। আমার কেন যেন মনে হলো, তুমিই সেই মমতা। কোনদিন হয়তো তুমি সেটা প্রকাশ করতেও পাবো। সেই আশায় পড়ে থাকা ছাড়া আমার কোন বিকল্প ছিল না রাজনন্দিনী।

এই সময় শরবত নিয়ে পরীর মা চলে এলো সেখানে। সঙ্গে করে নিয়ে এলো কেতাব আলীসহ নুরুদ্দীন আর শবনম সাদিকার একদল ভক্ত। খবর শুনে মোহিত এরা সবাই।

তারপরের দিন ঘরে বসে আকাশ পাতাল ভাবছেন জমিদার মোজাফফর আহমদ খান বাহাদুর সাহেব। ভাবছেন, তাঁর মেয়েটার কথা। নূরু মিয়া এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে। সে অসুস্থ থাকাকালে তার সেবা শুশ্রূষা করা নিয়ে শবনম সাদিকা বিভোর হয়ে ছিল। তাই সময় কাটানো নিয়ে সমস্যা হয়নি শবনম সাদিকার। একান্ত হিতৈষী নূরু মিয়ার এ খেদমতটা করা ঈমানী দায়িত্ব ছিল তার। এখন শেষ হয়েছে নূরু মিয়ার খেদমত করা। সেটা আর দরকার নেই। এখন মেয়েটা করে কি? তার সময় কাটে কিভাবে? মাদরাসাতে যাতায়াতও আর নিরাপদ নয়। একা একা যাওয়ার তো প্রশ্নই উঠে না, নূরু মিয়াকে সাথে দেয়াও আর সমীচীন নয়। অনেক ঝড় গেছে নূরু মিয়ার উপর দিয়ে। মরতে মরতে এবার বেঁচে উঠেছে সে। আর ঝুঁকি নেয়া ঠিক নয়। কিন্তু তাহলে? তাহলে মেয়েটার গতি কি? কি করবে সে একা একা ঘরে বসে?

খান বাহাদুর সাহেব ভাবছেন, মেয়েটার শাদিটা কোথাও দিয়ে ফেলতে পারলে সব সমস্যা চুকে যেতো। কিন্তু তেমন ছেলে, মানে ঘরবর তো পাওয়া গেল না আজও। যেগুলো পাওয়া গেল সেগুলো সবই বেহুদা ঘরবর। নবীরউদ্দীনের ছেলেটা শেষ ভরসা ছিল। সে ছেলেও এখন নিরুদ্দেশ। তার আশা নবীরউদ্দীনই ছেড়ে দিয়েছে, তিনি আর আশা করেন কি করে। কোথায় আর নতুন করে ছেলে খুঁজবেন তিনি– বসে বসে এই চিন্তাই করছেন খান বাহাদুর সাহেব। এই সময় ম্যানেজার কোরবান আলী মিয়া এসে সালাম দিয়ে দাঁড়ালেন এবং বললেন– একটা কথা ছিল হুজুর।

সালামের জবাব দিয়ে খান বাহাদুর সাহেব বললেন– বসো। বসে বলো, কি বলবে।

পাশের এক আসনে বসে ম্যানেজার সাহেব বললেন কথাটা বড়ই নাজুক

বইঘর.কম ও রোকন

হুজুর। কি করে যে বলি, তাই ভাবছি।

: অর্থাৎ?

আপনি নাখোশ হন কিনা, সেইটেই ভয়।

আহহা, বলোই না কি বলবে!

শবননম সাদিকা আম্মাজানের শাদির ব্যাপারে কিছু বলার ছিল হুজুর।

: শাদির ব্যাপারে? বলো-বলো। কোন ছেলের সন্ধান কি পেয়েছো?

ম্যানেজার সাহেব হাত কচলিয়ে বললেন– না হুজুর। অন্য কোন ছেলের সন্ধান পাইনি। আমি বলছিলাম–

: তুমি বলছিলে। কি বলছিলে?

আমি বলছিলাম নুরুদ্দীন, মানে নূরু মিয়ার কথা হুজুর।

জমিদার সাহেব বিস্মিতকণ্ঠে বললেন– নূরু মিয়ার কথা। নূরু মিয়ার কথা কি?

মানে নূরু মিয়ার সাথে শবনম আম্মাজানের শাদির কথা।

সে কি। এটা কি কোন বর হলো? নূরু মিয়ার সাথে শাদির কথা কি তোলা যাবে শবনম সাদিকার কাছে?

ম্যানেজার সাহেব খোশকণ্ঠে বললেন– যাবে হুজুর, যাবে। শবনম আম্মাজান নূরু মিয়াকে খুবই ভালবাসে।

: ভালবাসে। কাকে, নূরু মিয়াকে?

জি হুজুর, জি। আর বাসবেই না বা কেন? এত সুন্দর চেহারার ছেলে কি চোখে পড়ে কোথাও?

তা পড়ে না ঠিকই। কিন্তু চেহারা দিয়েই কি সব হয়? ভালও যদি বাসে বা বেসে থাকে, থাকুক তবু দর্শনধারী হওয়াটাই একমাত্র কথা নয়।

শুধু দর্শনধারীই তো নয় হুজুর! তার গুণেরও তো তুলনা হয় না। এত গুণবান আর এমন করিৎকর্মা ছেলেও কি দেখেছে কেউ কোথাও?

: তা ঠিক– তা ঠিক।

: যেমন আক্কেল স্বভাব তেমনই চেহারা আর গুণ। গুণের সাগর হুজুর।

: ম্যানেজার!

এর উপর বার বার যেভাবে সে শবনম আম্মাজানের প্রাণটা বাঁচালো, তাতে

তো শবনম আম্মাজানের প্রাণ বাঁধা পড়ে গেছে তার কাছে?

শবনম আম্মাজান কি সে কথা বলছে?

বলছে হুজুর, আকুলি বিকলি করে বলছে। সে বলছে আর চাকর-চাকরানীরাও সবাই বলছে, নূরু মিয়া ছাড়া আর কাউকেই জান থাকতে শাদি করবে না আম্মাজান।

তা রূপ গুণ না হয় সবই থাকলো, তবু বংশ পরিচয়টাও তো প্রয়োজন। কার ছেলে, কি বংশ, চোর ডাকাত বা লম্পট নাফরমানের বংশ কিনা, সেটা না জেনে–

কথা শেষ করতে না দিয়ে ম্যানেজার সাহেব বললেন– সেটা জেনে কি হবে হুজুর? যত ধুলোর মধ্যেই পড়ে থাকুক, মানিক মানিকই। বর যেখানে খাঁটি সোনা, একদম নিখাঁদ, সেখানে তার বংশের কে কি ছিল, তা দিয়ে কি হবে?

তুমি বলছো?

বলছি হুজুর, এক বাক্যে বলছি। শবনম আম্মার যোগ্য বর একমাত্র এই নূরু মিয়াই। দ্বিতীয়টি আর কোথাও চোখে পড়েনি আমার।

শবনম আম্মাজান কি তা বলছে?

বলছে মানে কি হুজুর! ঐ যে বললাম, শবনম আম্মাজান আকুলি বিকলি করে বলছে। তার সাথে চাকর চাকরানীরা পর্যন্ত আমার হাতে পায়ে ধরছে এদের দু'জনের শাদিটা ঘটিয়ে দেয়ার জন্যে।

তারাই কি তোমাকে পাঠিয়েছে?

: তারাই– তারাই। শবনম আম্মাজানসহ তারা সবাই। আপনার পছন্দ হয় না হুজুর?

আমার তো খুবই পছন্দ। পছন্দ মানে, আগাগোড়াই আমি এমন ছেলে মনে প্রাণে কামনা করে এসেছি।

হুজুর!

ঠিক আছে। নূরু মিয়ার সাথেই শবনম আম্মার শাদির ব্যবস্থা করো ম্যানেজার। যত শিগগির সম্ভব এদের দুইজনের শাদি সুসম্পন্ন করবো আমি। আল্লাহ চাহে তো করবোই।

কথা দিলেন হুজুর!

আমার কথার কোনো এদিক ওদিক হবে না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

খুশি মনে চলে গেলেন ম্যানেজার। জমিদার সাহেব উঠি উঠি করতেই এক প্রহরী এসে বললো– হুজুর, একজন ভদ্রলোক আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন।

জমিদার সাহেব বললেন– ভদ্রলোক? কোথা থেকে এসেছেন? কি নাম?

প্রহরী বললো– চন্দ্রপুর থেকে এসেছেন হুজুর। নাম নবীরউদ্দীন খান। উনি দহলিজে বসে আছেন।

জমিদার সাহেব উৎফুল্লকণ্ঠে বললেন– এ্যাঁ! নবীরউদ্দীন? যাচ্ছি- যাচ্ছি, এখনই যাচ্ছি।

দহলিজে এসে খান বাহাদুর সাহেব সালাম দিয়ে হরষিত কণ্ঠে বললেন– আরে নবীরউদ্দীন যে! কেমন আছো দোস্ত?

সালামের জবাব দিয়ে নবীরউদ্দীন খান সাহেব কিঞ্চিৎ বিষণ্নকণ্ঠে বললেন– আছি দোস্ত এক রকম। ছেলেহারা বাপ আর কেমন থাকবে, বলো?

তা বটে- তা বটে। তুমি চন্দ্রপুরে পুরোপুরি পার হয়ে এসেছো, শুনেছি। একবার দেখা করতে যাওয়ার ইচ্ছে করেও নানা ঝামেলায় যাওয়া হয়ে উঠেনি

তুমি গেলে আমি খুব খুশি হবো দোস্ত। মনমরা হয়ে বাড়িতে একা বসে থাকি। তোমাকে পেলে কিছুটা আনন্দ উৎসাহ পেতাম।

যাবো- যাবো, অল্পদিনেই যাবো। তা তুমি হঠাৎ কি মনে করে? সেরেফ বেড়াতে, না কোন দরকার উদ্দেশ্য আছে?

হ্যাঁ দোস্ত, উদ্দেশ্য একটা আছেই। শুধুই বেড়াতে আসার মতো মনের অবস্থা কি আছে এখন?

ও আচ্ছা। তা কি সে উদ্দেশ্য?

আমার ছেলেটা নাকি তোমার এই দিকেই এসেছে। এসেছে মানে, চন্দ্রপুরের এক লোক তাকে এইদিকে দেখেছে। ঐ লোকই এই খবরটা দিলো।

সে কি! দেখেছে? কোথায় দেখেছে?

তোমার এই বাড়ির দিকেই নাকি আসতে তাকে দেখেছে। সে লোক যে বিবরণ দিলো, মানে যে আকৃতি-চেহারার কথা বললো, তাতে সে ছেলে আমার ছেলেই হতে পারে।

বইঘর.কম ✪ রোকন

বলো কি! কবে দেখেছে?

দেখেছে মাস দেড়-দুইয়েক আগে। আমাকে খবরটা দিলো আজ। তোমার বাড়িতে কি নতুন কোন ছেলে টেলে এসেছে?

না না, দেড়-দুই মাস কেন, তিন চার মাসের মধ্যেও কোন ছেলে বা কম বয়সী ভদ্র সন্তান কেউ আমার বাড়িতে আসেনি।

নবীরউদ্দীন সাহেব হতাশকণ্ঠে বললেন– আসেনি! আমার ধারণা ছিল, এলেও আসতে পারে। কখন কোথায় যায় আর কোথায় থাকে, তার তো ঠিক ঠিকানা নেই। তোমার এখানে অনেক বড় লোকের ছেলে আসা-যাওয়া করে। তাই ভাবলাম তাদের কারো সাথে...

: না- না, কারো সাথেই নয়। তোমার ছেলে এলে আমি নিশ্চয়ই তার পরিচয় পেতাম। তার পরিচয় পেলে কি তাকে ছেড়ে দিতাম? ভাল বর অভাবে মেয়েটা আমার এতদিন ঐভাবেই ছিল। তোমার ছেলেকে পেলে কি আর কথা ছিল?

তা ঠিক। তেমন সৌভাগ্য আর আমার হলো কৈ? তা এখনও কি কোনো ভালো ছেলে পেলে না?

খান বাহাদুর সাহেব উৎফুল্লকণ্ঠে বললেন– পেয়েছি ভাই, আল্লাহর রহমে এতদিনে পেয়েছি। রূপেগুণে একেবারে চাঁদখানা ছেলে। এই দিন দুইয়েকের মধ্যে শাদি দিচ্ছি মেয়ের।

এ্যাঁ! তাই নাকি?

জি দোস্ত! অনানুষ্ঠানিকভাবেই শাদিটা সম্পন্ন করছি। পরে জাঁকজমক করে অনুষ্ঠান করবো আর তোমাদের সবাইকে দাওয়াত করবো।

খুব ভাল- খুব ভালো। রহমানুর রহিম তোমার মেয়ে জামাইকে সুখী করুন– এই দোয়াই করি।

: করো করো। সেরেফ এখানে বসেই নয়, এসেছো যখন, মেয়েজামাই দেখে আজই প্রাথমিকভাবে দোয়াটা একবার করে যাও।

: সে কি! আজই?

হ্যাঁ, আজই আর এখনই। সেবার এসে শুধুই একটু নাশতা পানি খেয়ে গেছো। আজ আর তোমাকে ছাড়ছে কে? আজ আমার এখানে থাকবে, খাওয়া-দাওয়া করবে, আমার মেয়েজামাই দেখে তাদের দোয়া আশীর্বাদ

বইঘর.কম ও রোঙ্কন

করবে– তবে তোমার ছুটি।

কিন্তু আমি তো সেভাবে আসিনি দোস্ত! একেবারে খালি হাতে কি করে আমি...

আরে আরে! সে কথা ভাবছো কেন? যদি কিছু দিতেই চাও, অনুষ্ঠানের দিনে দিও। এক নজর দেখে এখন তাদের জন্যে একটু দোয়া কামনা করবে। চলো...

তা মানে...

আরে! তুমি সেরেফ এই বৈঠকখানায় বসে থাকবে নাকি? তুমি কি আমার বৈঠকখানায় বসে থাকা মেহমান? চলো চলো, ভেতরে চলো...

নবীরউদ্দীন খানকে এক রকম ঠেলেই অন্দর মহলে নিয়ে গেলেন খান বাহাদুর সাহেব।

শাদিতে খান বাহাদুর সাহেব সাগ্রহে রাজি আছেন শুনে তখনই বর-কনেকে ঘিরে আনন্দ উল্লাস শুরু করে দিয়েছে উপস্থিত শুভাকাঙ্ক্ষীরা। ম্যানেজার সাহেবও সেখানে ছিলেন। নবীরউদ্দীন খানকে নিয়ে এসে মোজাফফর আহমদ খান বাহাদুর নিজের খাস কামরায় বসালেন। এরপর ম্যানেজার সাহেবকে তলব দিয়ে বর-কনেকে সেখানে নিয়ে আসতে বললেন। ম্যানেজার সাহেবের সাথে নূরুদ্দীন আর শবনম সাদিকা সেখানে এসে হাজির হলে, খান বাহাদুর সাহেব খুশিতে দুলতে দুলতে নবীরউদ্দীন খান সাহেবকে বললেন– এই হলো বর-কনে দোস্ত! এইটে আমার মেয়ে আর এইটে আমার হবু জামাই।

নবীরউদ্দীন খান সাহেব তখন পুরোপুরি উন্মাদ। আনন্দে আত্মহারা। বরের মুখের দিকে তাকিয়েই তিনি বিকারগ্রস্ত হয়ে গেলেন। উল্লাসে লাফিয়ে উঠে বললেন– সুবহান আল্লাহ, সুবহান আল্লাহ! এই তো আমার ছেলে! আমার হারিয়ে যাওয়া ছেলে!

আনন্দে হাত-পা ছুড়তে লাগলেন নবীরউদ্দীন খান। খান বাহাদুর সাহেব বিস্মিত কণ্ঠে বললেন– তোমার হারিয়ে যাওয়া ছেলে মানে? কে তোমার ছেলে?

www.boighar.com

ঐ তো তোমার ঐ হবু জামাই। তোমার মেয়ের ঐ বর।

: পাগল! তুমি ভুল করছো দোস্ত। ও তোমার ছেলে নয়। অন্য লোক।

বইঘর.কম ও রোকন

অন্য লোক। অন্য লোক মানে?

তোমার কাছে বলতে আমার লজ্জা নেই, আমি আমার বাড়ির একজন কাজের লোকের সাথে শাদি দিচ্ছি মেয়ের।

: কাজের লোক! কে কাজের লোক? www.boighar.com

তুমি যাকে তোমার ছেলে মনে করছো, সে আমার বাড়ির কাজের লোক। বলতে পারো হুকুম বরদার। সেই সাথে আমার চাকর-বাকর পাইট কিষাণদের ইমামতি করা মৌলভী সে।

: তা হবে কেন– তা হবে কেন? ওটা আমার ছেলে নূরুদ্দীন।

আরে দূর দূর। ও আমার মেয়ের গাড়ির ড্রাইভার, গাড়ির মেকানিক্স। মানে আমার মেয়ের পাহারাদার। তোমার ছেলে হলে সে লেখাপড়া জানতো। পাইট-কিষাণের মতো অশিক্ষিত হতো না। www.boighar.com

ক্ষেপে গেলেন নবীরউদ্দীন খান। চিৎকার করে বললেন– ইউ শাট্ আপ! কাকে তুমি অশিক্ষিত বলছো? ও এমএ, পিএইচডি। এমএ-তে ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট আর অক্সফোর্ড থেকে পিএইচডি করা ছেলে।

এহ্হে-হে! নবীরউদ্দীন বলে কি! ছেলের শোকে সত্যিই তো মাথাটা এর পুরোপুরি বিগড়ে গেছে। যাকে দেখছে তাকেই তার ছেলে ভাবছে!

এবার কথা বললো নূরুদ্দীন। মুখ তাকে খুলতেই হলো। বললো– জি না, উনি যা বলছেন তা সম্পূর্ণ ঠিক। উনিই আমার আব্বা!

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন খান বাহাদুর সাহেব। এবার মাথাটা ঘুরে গেল তাঁরও। তিনি বললেন– তোমার আব্বা? সে কি! তোমার আব্বা মানে?

মানে, আপনার এই দোস্ত জনাব নবীরউদ্দীন খান সাহেবই আমার আব্বা। আমিই তাঁর সেই হারিয়ে যাওয়া ছেলে।

সে কি- সে কি!

: আপনার মেয়ে মমতা, মানে এই শবনম সাদিকাকে খুঁজতেই আমি আপনার এখানে এসেছি আর ছদ্মবেশে রয়েছি।

: তার অর্থ– তার অর্থ?

অর্থটা এই মুহূর্তে বিস্তারিত বুঝিয়ে বলা কঠিন। শবনম সাদিকা সবই জেনে গেছে। পরে আপনি তার কাছ থেকেই শুনবেন। আমার আব্বাকে, মানে আপনার দোস্তকে, খামাখা অবিশ্বাস করবেন না।

হতবুদ্ধিকণ্ঠে খান বাহাদুর সাহেব বললেন– সুবহান আল্লাহ- সুবহান আল্লাহ!

এবার ম্যানেজার সাহেব বললেন– জি হুজুর! আমি ইতোমধ্যেই সব শুনেছি। এই ছেলেই আপনার এই দোস্তের ছেলে। অনর্থক বিভ্রান্তির মধ্যে না থেকে, শাদির যে আনজাম করার কথা বলেছিলেন, এখন সেইদিকে মন দিন।

বিভ্রান্তি কেটে গেল খান বাহাদুর সাহেবের। তিনি বিপুল উল্লাসে বলে উঠলেন– আলহামদুলিল্লাহ- আলহামদুলিল্লাহ! এ কি খোশ-খবর– একি খোশ-খবর! ওরে তোমরা কে কোথায় আছো, কাজে লেগে যাও! মাওলানা ডেকে আনো– মাওলানা ডেকে আনো! আমার এই আব্বা-আম্মাদের শুভশাদি আমার এই দোস্তের সামনে আজকেই সুসম্পন্ন করবো ইনশাআল্লাহ। তোমরা কাজে লেগে যাও...

ঘর থেকে ছুটে বেরুতে লাগলেন খান বাহাদুর সাহেব। বেরুতে বেরুতে বললেন– আসুন ম্যানেজার সাহেব! আমাদের সামনে এখন অনেক কাজ। দোস্ত তুমিও এসো। দেখিয়ে শুনিয়ে দেবে এসো..., কাজে লেগে যাই সবাই।

নবীরউদ্দীন খান সাহেব ও ম্যানেজার সাহেবকে ডেকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন খান বাহাদুর সাহেব। শূন্য হলো ঘর। শূন্য ঘরে রইলো শুধু শবনম সাদিকা আর নূরুদ্দীন। শবনম সাদিকা খুশিতে টলতে টলতে বললো– এটা কি হলো?

নূরুদ্দীন খান সুর করে বললো–

তবু তোমারে তো আজো ভুলি নাই।

স মা প্ত

www.boighar.com